উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে "এ" গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই 12B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- "কোর কোর্স", "ইলেকটিভ কোর্স", 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' "স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স", "এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স" এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF), National Credit Framework (NCrF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি

উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্থবার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

(Under National Higher Education Qualification Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম **(NBG)**

কোর্স : ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক কোর্স **(DSC)**

কোর্সের শিরোনাম : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (উনবিংশ শতাব্দী)

কোর্স কোড : **6CC-BG-03**

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, 2025

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the University Grants Commission–Distance Bureau.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্থবার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

(Under National Higher Education Qualification Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স : ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক কোর্স (DSC)

কোর্সের শিরোনাম : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (উনবিংশ শতাব্দী)

কোর্স কোড : 6CC-BG-03

ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক কোর্স: ৩ Discipline Specific Course : 3	**লেখক** **Course Writer**	**সম্পাদনা** **Course Editor**
মডিউল : ১ Module : 1	ড আশিস খাস্তগীর, অবসপ্রাপ্ত অধ্যাপক, সুধীররঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয় ড নীহারকান্তি মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলকাতা	অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
মডিউল : ২ Module : 2	অভিষেক ঘোষাল, সহকারী অধ্যাপক সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা	
মডিউল : ৩ Module : 3	ড শম্পা ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ, কলকাতা	
মডিউল : ৪ Module : 4	ড শান্তনু মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন	

ফর্ম্যাট এডিটিং- সায়নদীপ ব্যানার্জি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক-বাংলা বিষয় সমিতি

ড. শক্তিনাথ ঝা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ

ড নীহারকান্তি মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক, মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলকাতা

ড. চিত্রিতা ব্যানার্জি, সহযোগী অধ্যাপক, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, কলিকাতা

আব্দুল কাফি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. অনামিকা দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আমন্ত্রিত সদস্য

ড প্রাপ্তি চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সায়নদীপ ব্যানার্জি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গীতশ্রী সরকার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ উপকরণের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনোরকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

অনন্যা মিত্র

নিবন্ধক (অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত)

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স : ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক কোর্স (DSC)

কোর্সের শিরোনাম : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (উনবিংশ শতাব্দী)

কোর্স কোড : 6CC-BG-03

মডিউল : ১ বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ

একক ১	❑ বাংলা গদ্যরীতির প্রস্তুতি পর্ব	9-15
একক ২	❑ বাংলা গদ্যের বিকাশে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ	16-39
একক ৩	❑ বাংলা গদ্য ও প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশ	40-63
একক ৪	❑ বাংলা গদ্যের বিকাশে সাময়িকপত্রের অবদান	64-70

মডিউল : ২ বাংলা কাব্যে আধুনিকতা

একক ৫	❑ বাংলা কাব্যে আধুনিকতা	73-77
একক ৬	❑ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	78-88
একক ৭	❑ মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন	89-103
একক ৮	❑ বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও কামিনী রায়	104-121

মডিউল : ৩ বাংলা নাটক

একক ৯	❑ আধুনিক বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ	125-132
একক ১০	❑ মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, অমৃতলাল বসু	133-146
একক ১১	❑ গিরিশচন্দ্র ঘোষ	147-151
একক ১২	❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	152-160

মডিউল : ৪ বাংলা উপন্যাস ও ছোটোগল্প

একক ১৩ ❑ বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ 163-174

একক ১৪ ❑ প্রাক্-উপন্যাস পর্বের নক্শাধর্মী রচনা : ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ 175-184

একক ১৫ ❑ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সমকালীন ঔপন্যাসিকবৃন্দ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী 185-200

একক ১৬ ❑ বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব ও রবীন্দ্রনাথ 201-211

মডিউল : ১

বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ

একক ১ ❑ বাংলা গদ্যরীতির প্রস্তুতি পর্ব

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ সাধারণ আলোচনা

১.৪ সারাংশ

১.৫ অনুশীলনী

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ উদ্দেশ্য

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগে লিখিতরূপে আমরা কাব্য-মাধ্যমের পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু মুখের ভাষায় কী রূপ ছিল, তার পরিচয় লিখিতভাবে না পেলেও অনুমানের ওপর ভিত্তি করে আমরা গদ্যের প্রচলনের কথা ধারণা করে নিয়েছি। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নানা তথ্যপ্রমাণ এই অনুমানের সপক্ষে আবিষ্কৃত হতে থাকে। পুঁথি আকারে দলিল দস্তাবেজ, চিঠি ইত্যাদির আবিষ্কারের ফলে বাংলা সাহিত্যে গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। আমরা বাংলা গদ্যের স্তর-পরম্পরা অগ্রগতির হদিশ পাই। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে ইংরেজশাসনের সূচনালগ্ন থেকে চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজে গদ্যের প্রচলন বৃদ্ধি পায়। মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে বাংলা হরফ ইতিউতি দেখা দিতে থাকে। কিন্তু বাংলা গদ্যে পূর্ণাঙ্গ বই পাওয়ার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে উনিশ শতকের উষালগ্ন পর্যন্ত। ছাপার হরফে বাংলা গদ্যগ্রন্থ এল। এই প্রস্তুতিপর্বের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে।

পাঠ্যপুস্তক, ধর্মগ্রন্থ, জীবনী ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা গদ্যের লিখিতরূপের পথচলা শুরু। বাংলা গদ্যগ্রন্থের সূচনা হয়েছিল এদেশীয় মানুষদের জন্য নয়, ইংরেজ সিবিলিয়ানদের জন্য। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বিদেশীয়দের জন্য হলেও বাংলা গদ্যের প্রাথমিক ভিতটিকে শক্ত করেছিল। সেই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের রূপরেখা আমাদের কাছে বাংলা গদ্যের শৈশবব্যবস্থা জানার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

উনিশ শতকের প্রথম দুটি শতক পূর্ণ হওয়ার আগেই বাংলা গদ্যে প্রকাশিত হল বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র। আর সেই সংবাদ-সাময়িকপত্রের হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন শক্তিশালী গদ্যলেখক, প্রাবন্ধিক। তাঁদের বিষয়ব্যাপ্তি ঘটল, রচনাবৈচিত্র্য দেখা দিল। বাংলা গদ্যে প্রবন্ধসাহিত্যের উদ্ভব হল। বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটল।

বাংলা সাময়িকপত্রে বিষয়বৈচিত্র্যের কারণ এবং লেখকরুচি অনুসারে গদ্য যেমন এক শক্ত বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত হল, তেমনই গদ্য সহজ থেকে সহজতর হল, মানুষের মুখের ভাষাকে তুলে আনল ছাপার অক্ষরে। শতক পূর্ণ হওয়ার আগেই আমরা চলিত গদ্যের দ্রুতগতির সন্ধান পেয়েছি।

বর্তমান পর্যায়ে এই চারটি পর্বের পরিচয় দেওয়া হয়েছে চারটি এককে। শিক্ষার্থী এই চারটি একক থেকেই বাংলা গদ্যের সূচনা পর্বের গদ্যগ্রন্থ, লেখক, তাঁদের রচনারীতি গদ্যসাহিত্যের উন্মেষ ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবে।

১.২ প্রস্তাবনা

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার ছিল না। পদ্যাশ্রয়ী ধর্মাশ্রিত পুরোনো বাংলা সাহিত্যের আবেদন ছিল আবেগ ও অনুভূতির কাছে। অন্যদিকে গদ্যের আবেদন যুক্তির কাছে। একই সঙ্গে বলা দরকার পদ্যেও বাংলা সাহিত্যে তত্ত্বকথা ও যুক্তিমূলক ভাবপ্রকাশ আমরা দেখেছি। যেমন, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্' কাব্যে দুরূহ বৈষ্ণব দর্শনতত্ত্বকে সুনিপুণভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, পদ্য কোনও স্থানেই কবির তত্ত্বালোচনাকে ব্যাহত করেনি। তাই অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে গদ্য অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারেনি। সে-তাগিদ এল পলাশির যুদ্ধের পর, ইংরেজরা এদেশের মসনদে আসীন হওয়ার সময় থেকে।

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে বাংলা গদ্যে লেখা প্রচুর চিঠি ও দলিল দস্তাবেজ পাওয়া গেছে। প্রাচীনতম নিদর্শন হল ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে অহোম রাজকে লেখা কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের পত্র। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে গদ্যে অথবা গদ্যে-পদ্যে রচিত সাধনঘটিত প্রশ্নোত্তরময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবন্ধ বা 'কড়চা' অনেকগুলি পাওয়া গেছে। এগুলির লেখক বৈষ্ণব তান্ত্রিক সাধকরা। ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে নকল করা একটি বৈষ্ণব কড়চা বা নিবন্ধে গদ্যের প্রাথমিক রূপ লক্ষ করা যায়। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বাংলা গদ্যের সাধুরূপের নিদর্শন পাওয়া যায় নেপালে লিখিত গোপীচাঁদের সন্ন্যাস বিষয়ক একটি নাটকের গদ্যাংশে। অষ্টাদশ শতকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বাংলা গদ্যের চর্চা নিয়মিত ছিল। ন্যায়, স্মৃতি জ্যোতিষ ও চিকিৎসা-নিবন্ধের পুঁথিগুলিতে সেই গদ্যচর্চার নিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে।

বাংলা গদ্যের ভিত্তি রচিত হয়েছে চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেজ কড়চায়। লিখেছেন এদেশের লোক। এই সব গদ্যনমুনায় প্রাক্-উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের রূপটি ফুটে উঠেছে ধর্মচর্চা, রাজ্যশাসন ও বিষয়চর্চার মাধ্যমে। বৈষ্ণব কড়চা শাস্ত্র-নিবন্ধ, রাজাদেশ ও ধর্মালোচনায় আছে তৎসম তদ্ভব দেশি শব্দের প্রাধান্য। আর আরবি ফারসি শব্দের প্রাধান্য দেখা যায় দলিল দস্তাবেজ, আদালতনির্দেশ ও ওকালতনামায়।

এই পর্বের বাংলা গদ্যের আর এক রূপ পাই পর্তুগিজ-প্রভাবিত গদ্যরচনায়। তার আদর্শ ছিল বৈষ্ণবদের প্রশ্নোত্তরময় কড়চা-নিবন্ধ। সংস্কৃত সূত্রধর্মী গদ্যের আদর্শে লিখিত হয়েছিল মধ্যযুগীয় বাংলা গদ্য। নিদর্শন রূপ গোস্বামীর কারিকা। পর্তুগিজ-প্রবর্তিত গদ্যরীতিতে এই সূত্রধর্মী গদ্যরীতির ছাপ আছে।

১.৩ সাধারণ আলোচনা

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ছিল কাব্যনির্ভর, সঙ্গীতময়। পয়ার ছন্দে গাঁথা মধ্যযুগের সাহিত্যে গদ্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। তবে সেখানে গদ্যের ব্যবহার যে একেবারেই ছিল না, এমন নয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ কয়েকটি অনুশাসনে মারাঠী গদ্যের কিছুটা নমুনা মিলেছে। যদিও ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা গদ্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। কিন্তু বাংলায় চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবেজে গদ্যের ব্যবহার ছিলই। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত গদ্যের ব্যবহারও থাকত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা চিঠি ও দলিল অনেকগুলিই পাওয়া গেছে। তবে এই সময়ের গদ্যে আরবি-ফারসি শব্দের আতিশয্য চোখকে পীড়া দেয়। মুসলমান শাসনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে দলিলপত্রের ভাষা আরবি-ফারসি কণ্টকিত হয়ে ছিল। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল।

১. হকীকত মজুকুর শ্রীজুত জসোমাধব ঠাকুর কুমড়াল গ্রামে দেবালয়ত আছিল রাম সর্ম্ম ও ভগীরথ সর্ম্ম ওগয়রহ সেবকেরা আপনার আপনার ওয়াদা মাফিক সেবা করিতেছিল রাত্রি দিন চৌকী দিতেছিল শ্রী রামজীবন মৌলিক সেবার সরবরাহ পুরসানুক্রমে করিতেছেন। ইহার মৌধ্যে পরগনা পরগনাতে দেওড়া ও মুরুত তোড়িবার আহাদে হজুর থাকীয়া পরোয়ানা লইয়া আর আর পরগনাতে দেওড়া ও মুরুত তোড়িতে লাগীল। (সুকুমার সেন) **লিপিকাল ১১১৩ বঙ্গাব্দ (১৭০৭)।**

২. ইজত আসার বৈকুণ্ঠবাম দত্ত সিকদার ও মধুসুদন শর্ম্মা কারকুন যুচরিতেষু আগে তরফ খএরাত সেখ আবদুল্লার ও সেখ আবদুল মোমেন সাং দুর্গাপুর আরজ হইলা জাহির করিলেন যে পরগনা খটঙ্গা দুর্গাপুরে খএরাত জমী সালি ১০ দঘ বিঘা পাই ভোগ করিতেছি সনন্দ রাখি এখন সীকদার সনন্দ তলব করে জে হকুমু হয় তাহার আরজ খুনিঞা হুকুম করিল সনন্দ তহকীব করহ জদি মো সনন্দ ভোগ প্রমাণ খএরাত মনসুর রাখিল সনন্দ করিয়া দেহ অতএব সনন্দ তহকীব করা গেল—(*Types of Early Bengali Prose : Shiv Ratan Mitra*) **লিপিকাল ১১৩৬ বঙ্গাব্দ (১৭২৯)।**

৩. ইজতাসার রাজা নরেন্দ্রসিংহ ও কোউর বীরসিংহ বাফিয়ৎ বাশন্দ বাং সন ১১৩৬ সাল অবধি তালুক পাড়রা ও উভচিরা প্রভৃতি তোমাকে হুকুম হইল ও তুমি এই একবার সন মজকুর হইতে মোকররি জমা ৩০০ টাকা সন ২ আদায় করিব বলিয়া কবুলতি লিখিয়া দিয়াছ তাহা দপ্তরে দাখিল হইল মৌজা মজকুর তপসীল অনুসারে আমল দখল করিয়া সন ২ মালগুজারি করিবে—(*Types of Early Prose : Shiv Ratan Mitra*) **লিপিকাল ১১৭২ বঙ্গাব্দ (১৭৬৬)।**

৪. আগে মৌজে ডিহি বক্রেশ্বরের গোপিনাথ শর্ম্মা ও রামজীউ শর্ম্মা ও লক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মা ও জয়চন্দ্র শর্ম্মা ও রাজ্জিধর শর্ম্মা জাহির করিলা জে—উক্ত ডিহি বক্রেশ্বর—দেবত্তর মৌজা দরবস্ত ও চক গঙ্গারামের ডিহি ও চক শিবপুর—সাবীক বীররাজার দত্ত "বক্রেশ্বরনাথ শিবঠাকুরের নিষ্কর দেবত্তর মুদ্দ্যৎ পুরুষ ২ হসতে ৩ জীয়ের সেবা পূজা করিয়া দখলিকার আছে বীররাজার দত্ত সনন্দ রাখে এক্ষণ বক্রেশ্বর মেলাতে হুজুরের লোক লস্কর হাতী ঘোড়াতে বাজারে জুলুম হাঙ্গামা করে এজন্য দরখাস্ত করি বক্রেশ্বরের মেলাতে জুলুম

না করে তেঁহায় যেমত হুকুম অতএব উক্ত ডিহি বক্রেশ্বর দরবস্ত দেবদত্তর মৌজা ল চক গঙ্গারামে ডিহি ও শিবপুর সাবিক বীররাজার দেওয়া যথার্থ্য তাহার সনন্দ রাখে উক্ত শর্ম্মা পাণ্ডা মজকুরেরা পুরুষ ২ মুদ্দ্যত হইতে ঁজীউর সেবা পূজা করিয়া দখলিকার আছে ও বক্রেশ্বরে যে বাজার হয় তাহাতে খাজনা আদায় করিয়া দখলিকার আছে উক্ত দেবত্তর বৃত্তি বেশাদে কেহ জুলুম হাঙ্গামা করিবে না ও কখনও শর্ম্মা মজকুরদিগকে তলপ করিবে না যেন পাণ্ডা মজকুর সাবেক সুরত ঁজিয়ের সেবা পূজা করিয়া পুত্রপৌত্রাদি ভোগদখল করে।...ইতিসন ১১৭২ তাঃ ৯ই ফাল্গুন—(*Types of Early Bengali Prose : Shiv Ratan Mitra*) **লিপিকাল ১১৯৯ বঙ্গাব্দ (১৭৯৩)।**

৫. পরগনে দরি মোড়েশ্বরের ও পরগনে সাবিক মোড়েশ্বরের ইজার্দ্দার ও সিরিস্তাদার ও বাজে জমির তজবিজের আমিন পৃতি বেদানন্দ আগে "সেবাত মোজে কোটাযুরের গোনা (গোস্তা) রাম সর্ম্মা ও কাসীনাথ সর্ম্মা ও বৈদ্যনাথ সর্ম্মা ও ভবানি সর্ম্মা ও সিব সর্ম্মা জাহির করিলা পরগনা মজকুরের মোজে কোটাযুর ও বামুনিগ্রাম দিগরে ঁসেবার জমী দেবত্তর ৮২ বিরাসি বিঘা আছে তাহার সনন্দ নাই খোস্তা জাইয়াছে দপ্তরে গোনা (গোস্তা) খারিজ মুহুব্বাই বহাল আছে সবে চাকলা ফসল কোরক আছে অতএব দপ্তর তকরার করা গেল গোস্তা (গোড়া?) খারিজ মুহুব্বাই বহাল আছে আমল জামুল ভোগ প্রমাণ ইহাদ্দের দেবত্তর জমির ফসল জায়মত ছাড়িয়া দিকে কোন বাবত ওজর না করিবে ইতি সন ১১৯৯ সাল তারিখ ১৯ ওনিস ফাল্গুন—(*Types of Early Bengali Prose : Shiv Ratan Mitra*)

অহোম-রাজ কর্তৃক লিখিত কয়েকটি চিঠিতে সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের কিছুটা বিকশিত রূপ দেখা যায়। প্রাচীনতম নিদর্শন হল ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে অহোম রাজকে লেখা কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের পত্র। পত্রটি এইরূপ—

> "লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে"।

এই শতাব্দীর শেষে লিখিত একটি চুক্তিপত্রে আঞ্চলিক কথ্যভাষার নিদর্শন আছে। আঠারো শতকে লিখিত বেশ কয়েকটি দলিল পাওয়া গেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বাংলা গদ্যের লিখিত কাঠামোর একটা রূপ ফুটে উঠছিল। এই শতাব্দীতে কয়েকটি গদ্য-নিবন্ধেরও দেখা মিলেছে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ন্যায়শাস্ত্রের একটি গ্রন্থের অনুবাদ—

> গৌতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাদিগের মুকিত কি প্রকারে হয় তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গৌতম উত্তর করিতেছেন। তাবৎ পদার্ত জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন। পদার্থ কতো। তাহাতে গৌতম কহিতেছেন। পদার্থ সপ্ত প্রকার। (সুকুমার সেন)

অষ্টাদশ শতকে ১৭৪৩-এ পর্তুগাল-এর লিসবনে ছাপা হল বাংলা ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ'। বইটি রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। বইয়ের বা দিকের পৃষ্ঠায় রোমান অক্ষরে বাংলা এবং ডানদিকের পৃষ্ঠায় পর্তুগিজ ভাষায় অনুবাদ। লেখক মানোয়েল-দা-আস্‌সুম্পসাম। ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, এটি লিখিত হয়েছিল ভাওয়াল পরগনার নাগরিতে। মূল পর্তুগিজ অংশটুকু মানোয়েল-এর

লেখা। তিনি সম্ভবত কোনও দেশীয় খ্রিস্টানকে দিয়ে বাংলায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। সেখানে আরবি-ফারসি শব্দ যথেষ্টই আছে। বেশ কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও স্বীকার্য যে, ভাষায় স্বচ্ছতা ও গতি আছে। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৩৬-এ এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৮৬৯-এ।

এই শতকের আর একটি বই 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। রচয়িতা দোম-আন্তনিও নামে এক পর্তুগিজ পাদরি। বইটিতে একজন ব্রাহ্মণ ও একজন ক্যাথলিকের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে খ্রিস্টমহিমা বর্ণিত হয়েছে। গদ্যভাষায় 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর সঙ্গে খুব বেশি ফারাক নেই।

এরপর আরও দুটি বইয়ের কথা বলেছেন নগেন্দ্রনাথ বসু, সুশীলকুমার দে প্রমুখ। বইদুটির নাম 'প্রশ্নোত্তরমালা' ও 'প্রার্থনামালা'। কিন্তু বই দুটিরই মুদ্রিত রূপের কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই।

পলাশি যুদ্ধের পর বাংলার শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে আসে ১৭৬৫-তে। তখন তাঁরা দেখেছিলেন বাংলা ভাষা ভালো করে শিক্ষা ব্যতিরেকে কোম্পানির কর্মচারিদের পক্ষে শাসনকার্য নির্বাহ অসম্ভব। এ কারণে কর্মচারিদের ভালোভাবে বাংলা শেখানো বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ল। উনিশ শতকের সূচনা পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমরা ছ'জন কর্মচারির সন্ধান পাই, যাঁরা বাংলা ব্যাকরণ, অভিধান, আইনের বইয়ের অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন। এঁরা হলেন ন্যাথিয়েল ব্রাসি হালেড্, জোনাথান ডানকান, এডমনস্টোন, ফৌজদারি আদালতের কার্যবিধির অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৯৩এ ফরস্টার 'কর্নওয়ালিশ কোড' নামে পরিচিত সেকালের প্রচলিত আইনসংগ্রহ গ্রন্থগুলির অনুবাদ করেন। এই অনুবাদগুলির ভাষা সহজবোধ্য নয়।

এ আপনজন ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে একটি অভিধান প্রণয়ন করেন। নাম 'ইঙ্গরাজী ও বাঙ্গালি বোকেবলারি'। জন মিলার ছিলেন কোম্পানির কর্মচারি। তিনি 'দ্য টিউটর' বা 'শিক্ষাগুরু' নামে একটি বই লিখেছিলেন ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে। বাংলা গদ্যের সঙ্গে এই বইয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকলেও প্রথম ইংরেজি ব্যাকরণ হিসেবে এর মূল্য আছে। তাঁর বঙ্গানুবাদ অতিশয় দুরূহ।

গদ্যনিদর্শন

১. জোনাথন ডানকানের আইনের বইয়ের অনুবাদ (১৭৮৫) :

> জমিদারি ও তালুকদারি ও চৌধুরাই ও বাটী ও ভূমির মিরাসের বিষয় যেখানে একজন না হইয়া অধিক অংশী হয় তাহারা আপন ২ জাতির শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থামতে অংশ পাইবেক এমত প্রকাশের বিষয়ে অংশির দিগের অনুমতিক্রমে ব্যবস্থামতে যাহার যে অংশ পাওনা হয় প্রত্যেকে সকলের নামে দিক্রি করিতে হবেক ইহার অন্যতম করিতে না পারিবেন—

২. এডমন্‌স্টোনের অনুবাদ (১৭৯১) :

> সকল ফেরবার লোককে রক্ষা করা হাকিমের কর্ত্তব্য কর্ম বিশেষত তাহাদিগে যাহারা সহজেই দুস্থ পেয়ার তালুকদারান ও রায়ত লোক ও আর খেত আবাদ করণওয়ালাদিগের ভালের নিমিত্তে ও রক্ষা করিবার

নিমিত্তে নবাব গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর জখন মনাছেন বুঝেন আইন করিবেন।

৩. ফরস্টারের অনুবাদ (১৭৯৩) :

হাকীমের উচিত যে ছোট বড় সকল লোকের বিশেষতঃ দুস্থ ও গরিবদিগের রক্ষা নিয়ত করেন অতএব ঐ শ্রীযুত সকল মফস্বলী তালুকদার ও প্রজা প্রভৃতি চাষী লোকদিগের কল্যাণ ও কুশলের নিমিত্ত যে কালে যে আইনকরণ উচিত জানেন সেকালে তাই নির্দিষ্ট করেন কিন্তু এমন তো সকল আইন নির্দিষ্ট হইতে কোন প্রকারে জমিদার ও হুজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূমাধিকারীদিগের শিরে যে মোকররি জমার ধার্য্য রহে তাহা দিবার বিষয়ে তাহাদিগের কিছু আপত্য ও ওজনর হইবেক না।

এই তিনটি গদ্য-নিদর্শনে ডানকান ও ফরস্টারের গদ্য অপেক্ষাকৃত সরল। কিন্তু এডমনস্টোনের অনুবাদ ফারসিবহুল ও আড়ষ্ট। বাক্যের সংগঠনে, পদান্বয় কৌশলে এবং বাক্যাংশগুলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় ডানকান ও ফরস্টার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হননি। তবে তাঁদের গদ্যে বিরামচিহ্নের প্রয়োগবিরলতা সহজেই চোখে পড়ে।

১.৪ সারাংশ

ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই গদ্যে লেখালেখির শুরু হয়। বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজে যে গদ্য ছিল তা গ্রহণযোগ্য নয়—বাংলা, আরবি, উর্দু মিলিয়ে এক অদ্ভুত গদ্যের নমুনা। এছাড়াও ইংরেজ মিশনারি বা গদ্য বাইবেল অনুবাদ করেন। তার পূর্বে বিভিন্নভাবে দু-চারটি গদ্যের নমুনা পাওয়া যায়। আমাদের আলোচনায় উদাহরণসহ তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

১.৫ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১. অষ্টাদশ শতকের পূর্বে বাংলা গদ্যের উদাহরণ কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? দু'একটি উদাহরণসহ প্রাপ্ত গদ্যের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. বাংলা চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবেজে প্রাপ্ত গদ্যের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১. ন্যাথিয়েল ব্রাসি হালেড কী কারণে বিখ্যাত হয়ে আছেন?

২. 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' বইটি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা করুন।

৩. 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? খুব সংক্ষেপে তাঁর পরিচয় দিন।

৪. আইনের বইয়ের প্রথম অনুবাদক কে?

৫. 'কর্নওয়ালিশ কোড' বইটি কার লেখা? বইটির মুদ্রণকাল কবে?

৬. চিঠিপত্রে বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন কোন্‌টি?

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—শিবরতন মিত্র, ১৯২৬

প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন—সুরেন্দ্রনাথ সেন, ১৯৪২

বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য—সুকুমার সেন ১৯৯৮।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস ১৯৮৮

বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ২০০০

বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা—গোপাল হালদার (দ্বিতীয় খণ্ড)

কালান্তরে বাংলা গদ্য—গোলাম মুর্শিদ

একক ২ ❑ বাংলা গদ্যের বিকাশে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ বাংলা গদ্যের বিকাশে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশন

২.৪ সারাংশ

২.৫ অনুশীলনী

২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

২.১ উদ্দেশ্য

বাংলা গদ্যের বিকাশের প্রস্তুতিপর্বের পরিচয় আমরা পূর্বোক্ত এককে দেখেছি। কিন্তু শুধু ব্যক্তিগত সাধারণ উদ্যোগে বাংলা গদ্যের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে না। আরো নানা উদ্যোগ থাকে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগও থাকে। প্রতিষ্ঠানগুলি কখনো নিজেদের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে গদ্য রচনায় হাত দেয়, কখনো বা কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে গদ্যরচনায় হাত দেয়। এই তথ্যগুলির পরিচয় শিক্ষার্থীর জানা প্রয়োজন। এই এককে আমরা সেইসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব, যাতে শিক্ষার্থীর বাংলা গদ্যের বিকাশের ধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন ঘটে।

২.২ প্রস্তাবনা

১৭৫৭-তে পলাশির যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার নবাবের পরাজয়ে এ দেশে ইংরেজ আধিপত্যের পথ প্রশস্ত হয়। তার তিন বছর পর (১৭৬০) কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যু বাংলা সাহিত্যেও মধ্যযুগের সমাপ্তি। এতদিন দেশের শাসকরা হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম নির্বিশেষে ছিল ভারতবাসী। কিন্তু এবার যাঁরা শাসকের আসনে এলেন, তাঁদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ দেশ পরিচালনার দিশারী হয়ে গেল। ইংরেজ অধিকার বাঙালির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক বিনষ্টির ইতিহাস। এরই মধ্যে বাঙালির দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার জারকরসে বাঙালির চিত্তলোকের উদ্বোধনে, মননে-চিন্তননে ফল্গুধারার মত নূতন যুগের নূতন ভাবনা অঙ্কুরিত হচ্ছিল। ফলে, উনিশ শতকের সূচনাকাল থেকে বাঙালির মানসলোকে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যার প্রতিফলন তার ধ্যান-ধারণা, জীবন-দর্শনে, সাহিত্যে ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ

হয়ে উঠেছে। ফলত, ইংরেজ বিজয়ে বাংলাদেশ ও তার সাহিত্য মধ্যযুগের অবসানে নব্যযুগের অবসানে নব্যযুগে পৌঁছল।

নবাবের পতনে ইংরেজাধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে মধ্যযুগের অবসান ঘটে। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভাঙন ধরল। দেশজ সনাতনী শিল্প ধ্বংসোন্মুখ হলেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোনও নতুন শিল্প গড়ে তোলা হ'ল না। এদেশ বিলিতি পণ্যের বাজারে পরিণত হ'ল। ফলত রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতায় বাঙালির মনে ও মননে কৌমচেতনা সঞ্চারিত হয়। যদিও প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐতিহ্যবাহী প্রথাসিদ্ধ গীতিধর্মিতার অন্তঃসলিল ধারাটিও সমানভাবে এ সময় বিদ্যমান ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে নতুনতর ভূমিব্যবস্থার অভিঘাতে এতদিনকার গ্রামীণ সংস্কৃতির পোষক-বাহক স্থানীয় ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষণার অভাবে লোকায়ত কবি-শিল্পীরা বৃত্তি হারিয়ে শ্রমজীবীতে রূপান্তরিত হলেন। অপরদিকে, রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম সংস্কৃতি সর্বত্র নতুন চেতনার প্রবল আঘাত, সংঘাত জাতির জীবনে যে অনুভবের সঞ্চার করে ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন তাতে সমিধ জোগায় আর তারই পরিণতিতে আধুনিক জীবনবোধের উদ্বোধন ঘটে। বাঙালির জীবন-ভাবনার আধুনিক শিক্ষাজাত যুক্তিবাদ, মানবহিতবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোদ, নারীচেতনা এবং স্বাদেশিকতার পাশাপাশি রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে বাস্তববোধজাত কতকগুলি ধারণা জন্মে। পরিণতিতে সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের চিন্তাগুলি বাঙালির একাংশকে সক্রিয় করে তোলে। মিশনারি সিভিলিয়ানদের ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদ অতিক্রম করে বাঙালি তার মানসমুক্তির কারণেই নিজের উপলব্ধিকে সকলের বোধগম্য করে ব্যক্ত করবার জন্য দৈনন্দিন জীবনের ভাষা—বাংলা গদ্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। দোম আন্তোনিও মনোএল, উইলিয়ম কেরি, মার্শম্যানের গদ্যচর্চা থেকে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের গদ্যচর্চা তাই স্বরূপে স্বতন্ত্র। শেযোক্ত গদ্য লেখকরা লোকসংস্কার থেকে চেতনার মুক্তি ও যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠার পর সাহিত্য ও শিল্পভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

২.৩ সাধারণ আলোচনা

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে এদেশের শাসনভার ন্যস্ত হবার পর শাসনকার্য পরিচালনার জন্য যেসব ইংরেজ এদেশে আসতেন, তাঁদের এদেশের ভাষা শেখানোর প্রয়োজন বড়ো হয়ে দেখা দিল। এই উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়েলসলি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের স্থাপনা করেন। পরের বছর খোলা হয় বাংলা বিভাগ। বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন উইলিয়ম কেরি। তাঁর অধীনে যাঁরা এই কলেজের পণ্ডিত হিসেবে নিযুক্ত হন, তাঁরা হলেন—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র..., রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, পদ্মলোচন চূড়ামণি ও রামরাম বসু।

বাংলা বিভাগ শুরু হবার পর অধ্যক্ষ হিসেবে কেরি বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অভাবটাই বেশি করে বোধ

করলেন। এ কারণে তাঁরই আগ্রহে কলেজ-কর্তৃপক্ষ দেশীয় পণ্ডিতদের নগদ অর্থ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পুস্তক রচনায় উৎসাহিত করতে চাইলেন। শুধু তা-ই নয়, মুদ্রিত বইয়ের বেশ কিছু কপি কিনেও সেই উৎসাহদানের ধারাটি বজায় রেখেছিলেন। কলেজ-কাউন্সিলের এই নীতিতে কয়েকটি গদ্যগ্রন্থ আমরা পেয়েছি, বাংলা গদ্যের ইতিহাসে যাদের মূল্য অপরিসীম।

রামরাম বসু—	*রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র* (১৮০১), *লিপিমালা* (১৮০২)
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—	*বত্রিশ সিংহাসন* (১৮০২), *হিতোপদেশ* (১৮০৮), রাজাবলি (১৮০৮), *বেদান্তচন্দ্রিকা* (১৮১৭), *প্রবোধচন্দ্রিকা* (রচনা ১৮১৩, প্রকাশ ১৮৩৩)।
গোলোকনাথ শর্মা—	*হিতোপদেশ* (১৮০২)
তারিণীচরণ মিত্র—	*ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট* (১৮০৩)
চণ্ডীচরণ মুন্সী—	*তোতা ইতিহাস* (১৮০৫)
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—	*মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং* (১৮০৮)
রামকিশোর তর্কচূড়ামণি—	*হিতোপদেশ* (১৮০৮)
মোহনপ্রসাদ ঠাকুর—	*ইংরেজি-বাংলা শব্দকোষ* (১৮১০),
	ইংরেজি-ওড়িয়া অভিযান (১৮১১)
হরপ্রসাদ রায়—	*পুরুষপরীক্ষা* (১৮১৫)
কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—	*পদার্থকৌমুদী* (১৮২১)

শ্রীরামপুর মিশন

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ যেমন সিভিলিয়ানদের এদেশীয় ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল, অন্যদিকে এদেশীয়দের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ওই একই বছর ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হল শ্রীরামপুর মিশন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলা মুদ্রণ, বাংলা গদ্যসাহিত্যের যে বিকাশপর্ব শুরু হল তার নিয়ামক রূপে দেখা দিল এই দুটি প্রতিষ্ঠান। এক সূত্রে মিলে গেল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজন এবং ধর্মীয় লক্ষ্য চরিতার্থ করার কারণ। জন্মলগ্ন থেকেই এই দুটি প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

শ্রীরামপুর মিশন থেকে উইলিয়ম কেরিকে ফোর্ট উইলিয়ম শিক্ষকতার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর অর্থ হল সরকার কর্তৃক মিশনকে পরোক্ষ স্বীকৃতি দান। মিশনারি উদ্দেশ্য কোনোক্রমেই ব্যাহত হবে না, এই

আশ্বাস পাওয়ার পরই কেরি কলেজে যোগ দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একথা অবশ্যস্বীকার্য, কলেজের বাংলা বিভাগে যোগদানের ফলে যেসব দেশীয় পণ্ডিতদের সাহচর্যে তিনি এসেছিলেন, তাঁদের দ্বারা তিনি নিজে যেমন উপকৃত হয়েছেন, তেমনই বাংলা সাহিত্যও ঋদ্ধ হয়েছে। শুধু বাংলা ভাষা কেন, অপরাপর দেশীয় ভাষার পণ্ডিতদের সঙ্গ ও সাহায্যও তাঁকে নানা ভাষাবিদ্ হতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

কলেজে দায়িত্ব নিয়ে কেরি দেখেছিলেন পাঠ্যপুস্তকের অভাব। আর সেই অভাব পূরণ করতে সহযোগী দেশীয় পণ্ডিতদের দিয়ে কয়েকটি বই বাংলায় অনুবাদ করালেন। তাঁরই পরামর্শে কলেজ কর্তৃপক্ষ বইগুলির মুদ্রণে আর্থিক সহায়তাদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। বইগুলি কেরির মধ্যস্থতায় মুদ্রিত হত শ্রীরামপুর মিশনে। আর্থিক সহায়তা পাওয়ার ফলে মিশনের পক্ষে মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করা সহজতর হত। কলেজের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে কেবলমাত্র তারিণীচরণ মিত্রের 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' এবং মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের 'বাংলা ইংরেজি অভিধান' অন্য প্রেসে ছাপা হয়েছিল। সুতরাং বলা যায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এই মেলবন্ধনের ফলে বাংলা গদ্যের চলার পথটি সুগম হয়েছিল।

শ্রীরামপুর মিশন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বই ছাড়াও অসংখ্য খ্রিস্টীয় প্রচারপুস্তক ছাপিয়েছে। এছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য কেরির সম্পাদনায় কাশীদাসী মহাভারত (১৮০১-১৮০৩), কৃত্তিবাসী রামায়ণ (১৮০২-১৮০৩) প্রকাশ। বই দুটি সম্বন্ধে কেরি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলা মুদ্রণ, প্রকাশন এবং গদ্যসাহিত্যের আলোচনায় এ কারণে এই দুই প্রতিষ্ঠানের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। আমরা এবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠী সম্বন্ধে আলোচনা করব।

রামরাম বসু

রামরাম বসু বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্যলেখক। জন্মগ্রহণ করেন আনুমানিক ১৭৫৭-তে। তিনি প্রথমে উইলিয়ম চেম্বার্সের মুনশি ছিলেন। চেম্বার্সের সাহায্যেই রামরাম সামান্য ইংরেজি বলতে কইতে শেখেন। এরপর জন টমাস তাঁর কাছে বাংলা শিখতে শুরু করেন। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের যোগাযোগ ঘটে। কলকাতায় তিন মাস টমাস রামরাম বসুর কাছে বাংলা ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে শিখেছিলেন। এরপর তাঁরা দুজনেই ১৭৮৭-তে মালদহ পৌঁছলেন। ঘটনাপ্রবাহের জেরে ১৭৯৩ সালে রামরাম বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল উইলিয়ম কেরির। পরিচয়ের প্রথম দিনই রামরাম বসু মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে কেরির মুনশি নিযুক্ত হন। ১৭৯৪-এর জুন মাসে কেরি সপরিবার এবং রামরাম সহ এলেন মদনবাটিতে। কিন্তু ইতিমধ্যে রামরামের দুশ্চরিত্রতার কারণে কেরি ১৭৯৬-এ তাঁকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হন।

রামরাম যে অনেক গুণে গুণান্বিত ছিলেন, মিশনারিদের লেখনিতেই সে স্বীকৃতি আছে। মার্শম্যান লিখেছেন, রামরাম ক্ষুরধার ব্যঙ্গরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং মনের তীব্রতা ভাষায় সঞ্চারিত করতে পারতেন। রামরাম ছিলেন খ্রিস্টধর্মের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন। কিন্তু খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন ধূর্ত ও বুদ্ধিমান। এসব সত্ত্বেও কেরি তাঁকে বিতাড়িত করে আবার আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কেরির

জার্নালের অনেক স্থানেই রামরামের শাস্ত্রীয় বিচারবুদ্ধির প্রশংসা আছে। মোটকথা, রামরাম ছিলেন দোষেগুণে এক খাঁটি বাঙালি। রামরাম বসুই বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম খ্রিস্টসঙ্গীত রচয়িতা, কবিতায় খ্রিস্টজীবনীর লেখক। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হলে অনুতপ্ত রামরাম ফিরে আসেন কেরির কাছে, কেরি তাঁকে আশ্রয় দেন এবং পরের বছর ৪মে থেকে তাঁকে মাসিক ৪০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগে অন্যতম সহকারী পণ্ডিত হিসেবে নিযুক্ত করেন।

যে সহযোগীদের সাহায্যে কেরি বাংলা গদ্যে ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক লিখিয়াছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রামরাম বসু (মৃত্যু ১৮১৩)। সেকালের সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত কায়স্থ ভদ্রলোকের মতো রামরাম ছিলেন ফারসীনবীশ মুনশী, সংস্কৃতে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল না, কিন্তু সেকালের চলিত রীতিতে বাংলা গদ্য ও পদ্য রচনায় অবিসংবাদিত দক্ষতা ছিল শ্রীরামপুর মিশনপ্রেস থেকে রামরামের দুটি বই মুদ্রিত হয়েছিল 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) এবং 'লিপিমালা' (১৮০২)।

রামরাম ছিলেন বঙ্গজ কায়স্থ। প্রতাপাদিত্য-গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয়। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বংশপরম্পরাক্রমে যে সব কাহিনি তিনি অবগত ছিলেন সেগুলি এবং ফারসিতে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যা কিছু লেখা ছিল তা নিয়ে তিনি 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রচনা করেন। বইটি মৌলিক রচনা, কোনো ফারসি বা সংস্কৃত গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ নয়। বইটির স্থানে স্থানে আরবি-ফারসি শব্দের বাহুল্য দেখে অনেকে এটিকে তাঁর রচনাশৈলীর দোষ বলেই ধরেছেন। যেখানে যেখানে মুসলমান শাসনকর্তার অথবা শাসনকার্য বা রাজস্ব বিষয়ের উল্লেখ আছে সেইখানেই বিদেশী শব্দের আধিক্য দেখা যায়, অবশ্য সেখানে এই আধিক্য অবশ্যম্ভাবী।

আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ প্রায়ই সুষ্ঠু ও সঙ্গত। এই প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রতাপাদিত্যের প্রাসাদ বর্ণনা প্রসঙ্গে হাজনি ব্যাপারে লেখা হইয়াছে 'খরিদ ফ্রোক্ত?'—ফারসি শব্দ, আর খুচরা ব্যাপারে লেখা হইয়াছে 'বিকিকিনি'—তদ্ভব অর্থাৎ খাঁটি বাংলা শব্দ। কোনো কোনো সমালোচকের মতে রাজা-প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের ভাষা ও ভঙ্গি বিজাতীয় ও বিশৃঙ্খল, 'কোনও নির্দিষ্ট রীতি বা পদ্ধতির পর্যায়ে পড়ে না।' এই ধারণাও ভুল। বইটির ভাষা সাধু বাংলা, পদ্ধতি পূর্বাপর প্রচলিত, বর্ণনাত্মক, কথকতা ধরণের। এই বইটির জন্য কলেজে কাউন্সিল তাঁকে তিনশো টাকা পারিতোষিক প্রদান করেছিলেন।

'রাজা-প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রকৃপক্ষে বাংলা গদ্যে প্রথম একটানা দীর্ঘ মৌলিক রচনার নিদর্শন এবং এই কারণেই বিচিত্র ভাষায় রচিত। তাঁর পাণ্ডিত্য বা ভাষাজ্ঞান গভীর না হলেও শুধুমাত্র সাহসের ওপর ভর করেই তিনি আরবি ফারসি বাংলা সংস্কৃত শব্দ পাশাপাশি সাজিয়ে আদর্শহীন গদ্যের যুগে একটা কিছু খাড়া করতে চেয়েছিলেন।

'লিপিমালা' আসলে প্রবন্ধ-পুস্তক। তার প্রস্তাবগুলি পত্রাকারে লিখিত হলেও সাধারণভাবে এদের যথার্থ চিঠি বলে মেনে নেওয়া যায় না; বরং এদের পত্রাকার প্রবন্ধ বা কাহিনি বলা যেতে পারে। এই বইয়ের পরিশিষ্টে আছে "অঙ্কমালা" অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ধারাপাত। এগুলির মধ্যে যে কাহিনি বা বিবরণ

পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষিতের কাহিনি, গোরা বা গৌরাঙ্গের উপাখ্যান, বাইবেলের অনুবাদ ও খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারকদিগের কথা, বারাণসীর বর্ণনা, শিব-সতী কাহিনি, শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনী, বৈদ্যনাথ তীর্থের প্রতিষ্ঠাকাহিনী, কালযবন ও মুচকুন্দের কাহিনী, অম্বরীষের কাহিনী, এবং সগর-ভগীরথ কাহিনি।

লিপিমালা প্রকাশিত হয় ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে। রচনা সমাপ্ত হয় ১২০৮ সালের ভাদ্র মাসে। এই তারিখের উল্লেখ গ্রন্থকার ভূমিকার শেষে পয়ারে নির্দেশ করেছেন।

শতাদিত্য বসু বর্ষ পশুশ্রেষ্ঠ মাস।
পরম আনন্দ রাম করিল প্রকাশ।।

রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের তুলনায় লিপিমালার ভাষা অনেকটা কথ্যভাষার অনুযায়ী। লিপিমালা রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শিক্ষার্থীকে চলিতভাষার ও দেশীয় লোকের বৈষয়িক ব্যবহারের পরিচয় দেওয়া। তাই রামরাম ভূমিকাতে বলেছেন—"এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এদেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেন না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্যক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে ও ভুমীর যাবতীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপিমালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল।"

লিপিমালা ভূমিকার শেষে এবং প্রথম ধারার প্রায় সব পত্রেরই শীর্ষে কয়েক ছত্র করে পদ্য দেওয়া আছে। এই লিপিগুলির ভাষাও অনেকটা নাটকোচিত অথবা কবিত্বময়। যেমন,

> একি তুমি কোন মানুষ যে কটক পাঁচনী কর এ অঞ্চলের উপর এ তোমার কি প্রকার ইতর বিবেচনা কোতা শুনিয়াছ শুনি আহারে শার্দ্দুল স্থকিত হও। এ সামান্য বিষয় প্রযুক্ত এখানকার কোপের বাহুল্য হয় না শৃগালের গর্জ্জনে কেশরী নহি রোষে যদিতু হইল তবে তোমার কি গতিক হইবে কোতায় যাইবা তোমার সহায় বা কে এবং রক্ষাবা কে করিতে পারে। এখানকার ক্রোধ যদি হয় তবে প্রতি ইন্দ্র সখ্য করিলে ওনা পাবে রক্ষা বৈরিদমা সেনা মোর যদ্যপি কোপে সসৈন্যোতে সংহার করিবে।

লিপিমালায় প্রাপ্ত অনেক শব্দ, পদ ও বাক্যাংশ সমসাময়িক ও পরবর্তী লেখকদের রচনায় প্রায় পাওয়া যায় না। প্রাচীন প্রয়োগও রয়েছে। তোমার প্রস্থ লোকেরা, এখান দিয়া (= আমার দ্বারা) যে আনুগত্য হইতে পারে তাহার ত্রুটি হইবেক না, বাহুড়িবার কালে, ইহাতে সন্দিগ্ধ নহিবেন, পর্ব্বতচোহাড় রাজা, কটক পাঁচনী, আপনার এস্থান ভিন্নকোটি নহে, পল্বাপল্বি সুশাসিত হয়, ধরাপত্তি লোকেরদিগকে, তবে যদি বরগীরা দুর্জ্জনপানাতে নিরস্ত না হয়, পথপ্রজ্ঞ লোক, পদাপদ্য নাই, কিন্তু ইহার প্রতুল এখান হইতে যদিতু না হয় তবে চন্দ্রাদিত্য কলঙ্ক, সাতি সাংগত্য করিয়া পাঠাইব, সেবাতি (= ভৃত্য), এক আদ কায্য, অক্ষরটা (= একটা অক্ষর), পদার্পিত (= নিযুক্ত) মাসেক পক্ষের মধ্যে, মাসেক দুই মাস, শত পঞ্চাশ টাকা, বিশ পঁচিশ টাকা পনান্দরে দিয়াছিল, অনুসন্ধান বিশ্বম্ভরমূর্ত্তিতে, আমাদিগের বাটির সকলে এখন

এটা কোতায়, যদি ভূপপ্রস্থ কেহ কোনও স্থানে গিয়া থাকেন, প্রজার উপর নিতান্ত শক্তি করিলে এক কালিন গ্রাম নিষ্প্রদীপ হয়, ইত্যাদি।

আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার নিতান্ত কম। এই শ্রেণীর শব্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : জমাদ্দার, রাই (= রহি) সহর বাজর, গতর্জ্জমা (= খাতিরজমা), হাজার, তবকি, বক্রি, বেলাত, ফলানা, তক, তাগিদ, নালিস, এস্তাহার, ফর্দ্দ, আদালত, মহিনা, কাগজ, সুরখি, এতমান, ইত্যাদি। ইংরেজি শব্দ আছে তিনটি : আফিস, কোর্ট, ডিসমিস।

রামরাম বসুর রচনাশৈলী সাধুভাষার অনুগত হলেও পণ্ডিতি ধরণের নয়, এটি কথকতার ভাষণরীতির অনুগামী। তাঁর রচনার কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ ও দোষ আছে। প্রধান গুণ হল সরলতা ও সুগমতা ও লোকপ্রচলিত শব্দ, পদ ও ইডিয়মের ব্যবহার। বিশেষ্য ও বিশেষণ পদকে ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহারেও বিশেষত্ব আছে। "বৈরি ব্যাপককাল স্থায়ী হইতে পারে না, এখন প্রায় প্রত্যহান্বিত সে রাজ্যের প্রজাগণের দুঃখ গুহারী পোঁছাইতেছে" ইত্যাদি। তৎসম শব্দের বানান সর্বত্র শুদ্ধ নয়। এই সমস্ত দোষ সত্ত্বেও কেরির সহকারী, লেখকদের মধ্যে রামরাম ছিলেন শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন প্রধানত অনুবাদকারী, মুন্‌শী রামরাম ছিলেন মৌলিক লেখক। সুতরাং কাব্যসাহিত্যিক হিসাবে রামরামের দাবি মৃত্যুঞ্জয়ের আগে।

উইলিয়ম কেরি :

তন্তুবায় পুত্র কেরি আক্ষরিক অর্থেই জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত করেছেন। উইলিয়ামের দু'বছর বয়সে পিতা শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। শিক্ষক পিতার আদর্শে কেরির মনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারার প্রতি আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছিল। শিখেছিলেন হাতে কলমে উদ্ভিদবিদ্যা, গ্রিক,, ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষা। ধর্মযাজক বৃত্তি গ্রহণ করেন ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ৩২ বছর বয়সে কেরি এদেশে আসেন। ব্যাপটিস্ট মিশনারি হিসেবে ভারতে আসার মূল কারণ ছিল এদেশীয়দের মধ্যে খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার। ১৭৯৪এ মালদহের মদনাবাটিতে নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়কের পদে কেরি নিযুক্ত হন। সেকানে ইউরোপীয় মতে স্থানীয় কৃষক ও প্রজাদের শিক্ষা দেবার জন্য একটি স্কুলও স্থাপন করেন। ১৮০০-র জানুয়ারি মাসে চলে এলেন শ্রীরামপুরে। সেখানে অন্যান্য মিশনারিদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরামপুর মিশন। তখন থেকেই কেরির জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। মিশনের কাঠের মুদ্রাযন্ত্রে ওই বছর ছাপা হল বাইবেল অনুবাদ 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত'। ছাপার জন্য প্রথম পাতা তৈরির পর, তাঁদের উৎসাহের সীমা ছিল না; সজনীকান্ত দাস লিখছেন— 'বাংলা দেশের আকাশ-আচ্ছন্ন-করা কুসংস্কারের মেঘ ধীরে ধীরে কাটিয়া আসিতেছে, ইহা মানস-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া সেদিন তাঁহারা উৎসব করিয়াছিলেন'।

ইতিহাসমালা বাংলা সাহিত্যে বহু আলোচিত। অধিকাংশ আলোচনার লক্ষ্য হল—(১) গ্রন্থটি আদৌ কেরির রচনা কিনা কিংবা এই গ্রন্থে কেরির ভূমিকা কতটুকু। (২) গ্রন্থটি ১৮১২ খ্রিস্টাব্দেই রচিত কিনা, যদি রচিত হয় তবে সমসাময়িক গ্রন্থ বা তৎপরবর্তী কোনও তালিকায় এই গ্রন্থের উল্লেখ নেই কেন,

(৩) গ্রন্থটির পরবর্তী কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা, (৪) সঙ্কলিত গল্পগুলির উৎস কোথায়, (৫) গল্পগুলির সাহিত্যমূল্য কতটুকু।

গ্রন্থ যে কেরির মৌলিক রচনা নয় সেটি স্পষ্ট। কেরির ভূমিকা শুধুমাত্র সঙ্কলকের, বলা ভাল, গ্রন্থকের। তাঁর নির্দেশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতরা গল্পগুলি নানা সূত্র থেকে সংগ্রহ করে অনুবাদ করেছেন, আর কেরি গল্পগুলিকে গ্রন্থন করেছেন মাত্র। *ইতিহাসমালা* সে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দেই রচিত হয়েছিল, বিভিন্ন গবেষণা ও অনুমানের ওপর ভিত্তি করে সেটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। গ্রন্থটির পরবর্তী কোনো সংস্করণ পাওয়া যায়নি। *পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বত্রিশ-সিংহাসন, বেতাল পঞ্চবিংশতি, পুরুষ পরীক্ষা, ঈশপ,* জাতক, ফারসি ও দেশীয় লোককথা, মঙ্গলকাব্য, ইতিহাস, সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ ইত্যাদি বিচিত্র উপাদানের ওপর ভিত্তি করে *ইতিহাসমালা* গড়ে উঠেছে।

যে সূত্র থেকেই সংগ্রহ করা হোক না কেন, প্রায় সব কটি গল্পের লক্ষ্য নীতিশিক্ষা প্রদান। অনেক গল্পের শেষে নীতিশিক্ষা রয়েছে, কিছু গল্পের সূচনাতেই নীতিকথাটি বলা হয়েছে, আবার কোনো গল্পের চরিত্রের উপলব্ধিতে বা উক্তিতে নীতিশিক্ষাটি ব্যক্ত।

ইতিহাসমালায় দেড়শত গল্প সঙ্কলিত। কোন প্রস্তাবই কেরির রচনা নয়, কেরি ছিলেন শুধু সংগ্রহকর্তা। গল্পগুলির অধিকাংশই প্রচলিত দেশী গল্প। কয়েকটি গল্পের মূল পাওয়া যায় বেতালপঞ্চবিংশতি ভোজপ্রবন্ধ ইত্যাদি সংস্কৃত গল্পের বইয়ে। কিন্তু এই শ্রেণীর কোন গল্পই অনুবাদ নয়। তিনটি গল্পের পাত্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি—প্রতাপাদিত্য, রূপ ও সনাতন এবং আকবর বীরবল। দুই একটি গল্পের বীজ ফারসিতে অথবা হিন্দুস্থানীতে রয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

গল্পগুলি একাধিক দেশীয় লেখকের দ্বারা লিখিত অথবা পরিমার্জিত হয়েছিল। কয়েকটি গল্পের রচনাভঙ্গি সংস্কৃত ঘেঁষা। এগুলি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রীতিতে রচিত, হয়ত তাঁরই লেখা। মোটের উপর ইতিহাসমালার রচনারীতি সুষম এবং প্রাঞ্জল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদের পুস্তকগুলির মধ্যে ইতিহাসমালা রচনাভঙ্গির দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ। মনোরম বিষয়বস্তু ও সহজ রচনাভঙ্গি বিদ্যালয়ে পাঠ্য হওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হয়নি বলেই সম্ভবত ইতিহাসমালা পাঠ্য পংক্তিভুক্ত হয়নি। কিন্তু বাংলা এবং ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম গল্পসংগ্রহ বলে ইতিহাসমালার মর্যাদা কখনও ক্ষুণ্ণ হবে না।

ইতিহাসমালার দু'চারটি কপি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লাইব্রেরিতে ছিল। বইটির প্রচার হলে কেরির যশ আরও বাড়ত। কেরির সংগ্রহ লোক-কাহিনীর। গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের গ্রন্থের প্রথম খণ্ড এবং কেরির গ্রন্থ একই সালে ছাপা হয়েছিল (১৮১২)। তখন পর্যন্ত জার্মান ও বাংলা ছাড়া আরও কোনও ভাষার লৌকিক কাহিনীর সংগ্রহ প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় অদ্যাবধি যে সম্মান পেয়ে এসেছেন, তারসম-সম্মান কেরিরও প্রাপ্য। সে কতা অবশ্যস্বীকার্য। এদিক দিয়ে 'ইতিহাসমালা' উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান।

আর এক হিসেবেও *ইতিহাসমালার* গুরুত্ব খুব বেশি। *ইতিহাসমালার* অনেক গল্প ঝরঝরে সরল

সাধুভাষায় রচিত। এমন ভাষা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কোন লেখকের কলমে আমরা পাই নি। সাহিত্যে ব্যবহৃত না হলেও যে মুখে মুখে বাংলা গদ্য উনিশ শতকের আগেই কতটা সরল ও শক্তিশালী হয়েছিল তাহার প্রমাণ প্রচুর আছে ইতিহাসমালায়। কেরি বাংলা ভালোই জানতেন, তাঁর ধারণায় বাংলা সংস্কৃত ভাষারই বিকৃত রূপান্তর মাত্র। তাই তিনি বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের প্রলেপ লাগাতে চেয়েছিলেন এবং একাজে সহকারী পেয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ের মতো পণ্ডিতকে। তবে মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে সেই বাংলা তেমন সফল হতে পারেনি। *ইতিহাসমালার* দুটি গল্প—

৫৯. এক রাজার দুই সন্তান কিন্তু উভয় মূর্খতম (১) রাণী পতিব্রতা (২) পরে রাজা আপন তনয়ের দিগের বিদ্যার নিমিত্তে নানা শাস্ত্রজ্ঞ একজন পণ্ডিত রাখিয়া পুত্র দিগকে সমর্পণ করিলেন। পণ্ডিত প্রত্যহ নীতিশিক্ষা করান এবং নানাবিধ তাড়না করেন। তাড়নাপ্রযুক্ত দুই ভ্রাতা রাগান্বিত হইল।

৬০ সদসদ বিবেচক বিজ্ঞ কোন লোক অন্য কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে উত্তম কিম্বা অধম বর্গেতে সুন্দর এবং কুৎসিত লোকেরা কোন বস্তুতে ভূষিত হইলে সর্বত্র আদরণীয় হয় আর তাহারদের সুখ্যাতিরূপে সৌরভ পবন কর্তৃক বাহিত হইয়া নানা দিগ্‌দেশীয় লোকেরদিগের মন হরণ করে যেমন শশী আত্মকিরণ প্রকাশেতে পৃথিবীমণ্ডল দীপ্ত করেন।

ইতিহাসমালায় অনেকগুলি গল্প পুরুষের অথবা নারীর মুখে শুনে লেখা। পদগুলি সাধুভাষার তবে সংস্কৃত প্রলেপ নেই। যেমন,

১৩৯. এক গৃহশেতর চার ভাই একত্র আছে। তাহার মধ্যে বড় যে ব্যক্তি সে ব্যবসা করে। একদিন সে বলদ লইয়া বাণিজ্যে যায় এই সময় তত্ত্ব করিয়া দেখিল যে গুণসূচি নাহি। পরে অনেক অন্বেষণ করিল এবং বাটীর প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিল কোন প্রকার পাইল না অতএব সে বড় বিরক্ত হইয়া বলিল হায় হায় আমার যদি পঞ্চাশ টাকা ক্ষতি হইত তাহাতেও এমন দুঃখী হইতাম না। আজি আমার গুণসূচি হারাইয়া যে দুঃখ হইয়াছে তাহা কাহারে কহিব।

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে যে বাইবেলের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় তাতে কেরির সহায়তা ও উদ্যোগ বিশেষভাবে ছিল। এর পর তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মনোনীত হন। বিদেশির পক্ষে কেরির বাংলা ভাষায় দখল ভালোই ছিল বলতে হবে। তিনি সংস্কৃত শিখেছিলেন, এবং অন্যান্য কয়েকটি আধুনিক ভারতীয় ভাষাতেও অল্পবিস্তর অধিকার ছিল। বাংলা গদ্যে দুটি পাঠ্যপুস্তক ছাড়া কেরি ইংরেজিতে *বাঙ্গালা ব্যাকরণ* (১৮০১) এবং *বাঙ্গালা-ইংরেজি অভিধান* (১৮২৮-২৫) সঙ্কলন করেন। এছাড়া তিনি পণ্ডিত ও সহকারীদের সাহায্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ, মারাঠী ব্যাকরণ, মারাঠী অভিধান, পাঞ্জাবী ব্যাকরণ, কানাড়ী ব্যাকরণ ইত্যাদি প্রকাশ করেন। তাছাড়া কৃত্তিবাসের সমগ্র রামায়ণ (১৮০২) ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের চার পর্ব (১৮০২), বিষ্ণুশর্মার *হিতোপদেশ* এবং *বাল্মীকির রামায়ণ* এই কয়েকটি গ্রন্থও প্রকাশ করেন।

উনিশ শতকে মুদ্রিত প্রথম বাংলা মহাভারত প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে সম্ভব হয়েছিল। সেটি শ্রীরামপুর

মিশনের মহাভারত। রাজা *প্রতাপাদিত্য চরিত্র* (১৮০১) মুদ্রিত হবার পর থেকেই কেরির নতুন পরিকল্পনা ছিল সংস্কৃত মহাভারত এবং হিতোপদেশ-এর বঙ্গানুবাদ করা। এ প্রসঙ্গে মার্শম্যান বলেছেন—

These works were followed by a Bengalee translation of the Sanskrit Hetopudes, executed by the chief pundit of the College; and arrangements were also made for publishing an edition of the metrical version of the great epic poem, the Mahabharat, which are deservedly popular throughout the country.

কেরি স্বয়ং জার্নালে লিখছেন :

I have been trying to compose a compendious rammer of the language, which I send you. together with a few pages of the Mahabharata, with a translation which I wrote out for may own exercise in the Bengalee...

মহাভারত পাঠ করে উইলিয়ম কেরি তার সঙ্গে হোমারের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। ১৮এপ্রিল ১৭৯৬ তারিখে বন্ধু ড. রাইল্যান্ডকে লেখা এক চিঠিতে তিনি মহাভারতকে পৃথিবীর অন্যতম সাহিত্যকীর্তি বলে ঘোষণা করেছিলেন। চার খণ্ডে মহাভারত মুদ্রিত হয় ১৮০১ থেকে ১৮০৩এর সময়কালে। প্রথম খণ্ড ১৮০১, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮০২ সালে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পদ্য পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হত। প্রথম সংস্করণের তেত্রিশ বছর পার হওয়ার পর ১৮৩৬-এ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সংশোধিত মহাভারত দু'খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন মিশন কর্তৃপক্ষ। প্রথম খণ্ডে আদি-সভাবনপর্ব এবং দ্বিতীয় কণ্ডে অবশিষ্ট পর্ব।

কেরির সঙ্কলিত দুটি বাংলা গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল—Dialogues intended to faclitate the acquiring the Bengali Language বা 'কথোপকথন' (১৮০১), এবং 'ইতিহাসমালা' (১৮১২)। সম্ভবত, বই দুটিতে একাধিক বাঙালি পণ্ডিত বা মুন্‌শির রচনা কেরি কর্তৃক সঙ্কলিত ও ইংরেজিতে অনুবাদিত হয়েছিল।

'কথোপকথন' বইটি দ্বিভাষিক, এক পৃষ্ঠায় বাংলা অপর পৃষ্ঠায় ইংরেজি। বিবিধবিষয়ক কথোপকথনগুলি অধিকাংশই বিদেশির ব্যবহারের ও শিক্ষার উপযোগী। কয়েকটি প্রস্তাবের বিষয় নিতান্ত ঘরোয়া অথবা সামাজিক ব্যাপার। এগুলি শ্রেণিবিশেষের কথ্যভাষার নিদর্শন হিসেবেই সঙ্কলিত হয়েছিল। কতকগুলি প্রস্তাবের রচনারীতি অবিমিশ্র সাধুভাষা, অপরগুলির রচনারীতি কথ্যভাষাশ্রিত। তবে দুটি বইয়েই ক্রিয়াপদে সাধুভাষার রূপ দিতে চেষ্টা করা হয়েছে। গাড়োয়ান স্থলে 'সারথি', মদ স্থলে 'মদিরা', বাবুর্চ্চি স্থলে 'সুপকার' ইত্যাদি আভিধানিক শব্দের প্রয়োগ কেরির সংশোধন।

উইলিয়ম কেরি ১৮০১ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময়কালের মধ্যে তিনি বাংলা ভাষা সংক্রান্ত ব্যাকরণ, অভিধান, বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা ছাড়াও বাংলাসহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ, বিভিন্ন ভাষায় ব্যাকরণ ও অভিধান

সঙ্কলন করেছেন। এছাড়া গবেষণা করেছেন ভারতীয় কৃষি, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে। বাংলা হরফ সংস্কার ও ভারতের অন্যান্য ভাষার হরফ তৈরিতে তাঁর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কেরির জীবনের অন্যতম কীতি ১৮১৮ সালে প্রকাশিত ইংরেজি ভাষায় মাসিক পত্রিকা 'The Friend of India' পরিচালনা। সহযোগী ছিলেন যোশুয়া মাশম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড। সম্পাদক তরুণ জন ক্লার্ক মার্শম্যান। পত্রিকাটিতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। কতিপয় গদ্য নিদর্শন নিচে উল্লিখিত হল :

কথোপকথন ১৮০১

আয়টে সকাল করে চল সূতা না বিকেলে তে নুন তেল বেসাতি পাতি হবে না।

ওটে বুন সে দিন কোলাঘাটার হাটে গিয়াছিলাম তাহাতে দেখিয়াছি সুতার কপালে আগুন লাগিয়াছে। পোড়া কপালে তাঁতি বলে কি আট পণ করে সুতাখান। সে সকল সুতা আমি এক কাহন বেচেচি টে।

সে দিন দেখে আর হাটপানে মুয়াতে ইচ্ছা করে না। চল দিকি যাই না গেলে তোহবে না ঘরে বেসাত পাত কিচু নাই ছেলেরা ভাত খাবে কি দয়া আর আধ সেরটাইক কাপাইস আনতে হবে।

ইতিহাসমালা ১৮১২

১. 'চম্পকারণ্যে চন্দন বৃক্ষে কপোত ও কপোতিকা দুইজন অনেককাল পর্য্যন্ত বাস করে। একদিন প্রাতঃকালে কপোতিকা অনিষ্ঠ দর্শন করিয়া কাতর হইয়া কপোতকে কহিল হে প্রাণনাথ অদ্য আমারদের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল, দেখ, বৃক্ষের তলেতে এক ব্যাধ ধনুকেতে বাণ সংযোগ করিতেছে এবং বৃক্ষের উপর শূন্য ভাগে এক শোন পক্ষী উড়িতেছে, এ কারণ এখন ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতরেকে আমারদিগের বাঁচিবার আর উপায় নাই। ইতোমধ্যে এক সর্প আসিয়া সেই ব্যাধকে দংশন করিলে বিষ জ্বালাতে ব্যাধের শরীর অবশ হইল তাহাতে সেই শর শোন পক্ষির অঙ্গে লাগিয়া শোনা পক্ষী মরিল ও সর্পাঘাতে সেই ব্যাধ বৃক্ষতলে মারা পনিল কপোতেরা নিরাতঙ্ক হইয়া কালযাপন করিতে লাগিল।

অতএব বলি প্রাণিরদিগের রক্ষার্থে পরমেশ্বরের কেমন ইচ্ছা তাহা কহা যায় না। ইতি।' (পৃ. ৬৬-৬৭)

২। 'কাশ্মীর দেশেতে মন্দবুদ্ধি নামে এক সেকচিল্লী থাকে সে নগরে মোট বহিয়া মজুরী করিয়া খায় এমতে কথক দিন যায়। এক দিবস কোন সিপাই হস্তিনা নগর হইতে সেখানে আসিয়া এক ঘড়া ঘৃত খরিদ করিয়া মজুর তল্লাস করিতে ঐ মন্দবুদ্ধ বলিল যে আমি এই ঘৃতকুম্ভ লইয়া যাইতেও পথি মধ্যে মনে বিচার করিতে লাগিল ঐ যে সিপাইর ঠাঁই মজুরী পাইব তাহাতে প্রথমে মুরগী খরিদ করিব তাহার অনেক বাচ্চা হইলে পাল বাড়িলে মুরগী বেচিয়া বকরী কিনিব তাহার পাল বাঢ়াইয়া বেচিয়া গরু কিনিব গরুরুর পাল বাঢ়াইয়া বেচিয়া হাতি কিনিব হার পাল বাঢ়াইয়া বেচিলে টাকা অনেক হইবে সেই টাকাতে কোঠা করিব এবং বিবাহ করিব বিবাহ করিলে পুত্ত হইবে আমি বড় মানুষ হইবে পুত্ত ডাগর হইবে আম দালানে বসিয়া থাকিব আমাকে ভাত খাইতে ডাকিতে আসিলে আম ভাত খাইব না ইহা বলিয়া মাতা লাড়িতেই মাথা হইতে সে ঘৃত কুম্ভ ভূমিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সিপাই তাহাকে ধরিয়া মারিল.....।'

গোলোকনাথ শর্মা :

গোলোকনাথ শর্মার সামান্য পরিচয় উদ্ধার করেছেন সজনীকান্ত দাস তাঁর 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' বইতে। যদিও তার প্রায় অনেকটাই অনুমাননির্ভর। তাঁর পুরো নাম গোলোকনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর ভাইয়ের নাম কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়। কাশীনাথ কিশোর বয়সেই কেরির পণ্ডিত হিসেবে নিযুক্ত হন। বর্তমান দিনাজপুর জেলার মহীপালদীঘির কাছাকাছি কোনও এক স্থানে বাস করতেন। মহীপালদীঘির নীলকুঠীর অধক্ষ জন টমাস বাংলা ও সংস্কৃত শেখার জন্য স্থানীয় এক পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেছিলেন। ইনিই গোলোকনাথ শর্মা। জন টমাস এবং কেরি কয়েকটি চিঠি এবং ডায়েরিতে গোলোকনাথকে 'Our Pundit' নামে অভিহিত করেছেন। গোলোকনাথ ১৭৯৪ থেকে আমৃত্যু মিশনারিদের সঙ্গেই ছিলেন। কেরির সঙ্গে তিনিও মালদহ ত্যাগ করে শ্রীরামপুরে এসেছিলেন। ১৮০৩-এ তাঁর মৃত্যু হয়। জন টমাসের নির্দেশে রচিত হিতোপদেশের অনুবাদিত গল্পগুলির সমষ্টিই 'হিতোপদেশ' নামে ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়। বইটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্বাচিত হয়।

সংস্কৃতে গোলোকনাথের জ্ঞান সুদৃঢ় ছিল না। গদ্যাংশের অনুবাদে তিনি গল্পের অনুসরণ করেছেন, সেজন্য অনুবাদ আক্ষরিক হয়নি এবং রচনাও নিতান্ত শ্রুতিকটু নয়। বরং অনুবাদ স্বাধীন হওয়ায় রচনার সহজতা বেড়েছে। কিন্তু শ্লোকের অনুবাদে গোলোকনাথের সংস্কৃতে দুবলতা রয়ে গেছে। অনেক শ্লোক অনুবাদে একেবারে পরিত্যক্ত হয়েছে। বহু তৎসম শব্দের বানান বিচিত্র—বিদ্যান, সমিভ্যারী, বাচ্ছল্য, অরুন্ধুতি, কৃচ্ছায়, দ্যোর্ডও, উর্দ্দ্যত, সম্প্রিতি, মলয়া, প্রেবেশ, উদ্দিশ্যে, বৃন্ধ্যাচল ইত্যাদি। অনুবাদে গোলোকনাথ মাঝে মাঝে কথ্যভাষার অনুসরণ করেছেন। তাতে রচনায় প্রাঞ্জলতা ও সরলতা সঞ্চারিত হয়েছে।

গদ্য নিদর্শন : হিতোপদেশ—(১৮০২)

১. চম্পকবতী নামেতে এক অরণ্য আছে সেই বনের মধ্যে মৃগ ও এক কাক এই দুইজনে অত্যন্ত সম্প্রীতিপূর্ব্বক উভয় বাস করেন ইতিমধ্যে এক দিন সেই মৃগ ইচ্ছাক্রমে বেড়াইতে বেড়াইতে এক শৃগাল দেখিল তাহাকে সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট স্নিগ্ধ শরীর। তাহা দেখিলে মনে বিবেচনা করিতেছেন আঃ এই যে পরিপাটির কোমল মাংস আমি কিরূপে খাইতে পাই। এসটা ভাবিলে মৃগের নিকট আসিয়া কহিলেন বন্ধু হে সকল মঙ্গল অনেকদিন অবধি চেষ্টা করিয়া ফিরিতেছি। অতএব আজি আমার সুপ্রভাতা রাত্রি যে তোমার সাক্ষাৎ হইল। মৃগ কহিলেন তুমি কে হে। শৃগাল কহিতেছেন ক্ষুদ্রবুদ্ধি নামে আমি জম্বুক এই অরণ্যের মধ্যে বন্ধুহীন মৃতবৎ একাকী বাস করি.....।

২. চম্পাভিধান নামেতে এক নগরী আছে সেইখানে চূড়াকণ নামেতে ভিক্ষুক তিনি বাস করেন তিনি ভোজনের অবশিষ্ট যে চাউল থাকে তাহা ভিক্ষা পাত্রে করিয়া থোন। আমি তাহা লইয়া প্রত্যহ খাই এইরূপে কতক কাল যায়। একদিন ঐ ভিক্ষুকের সুহৃদ বীণাকর্ণ নামে ভিক্ষুক সেখানে আইলেন তাহার সহিত নানা কথা বার্ত্তা হইলে অবস্থিতি করিলেন আমি থাকে ও খাই দাই ও ঘরের মধ্যে বেড়াই কিন্তু একদিন চূড়াকর্ণ নামে ভিক্ষুক আমার উপর উষ্মা করিয়া একখান ভাঙ্গা বাশের ঠেলা ফেলাইয়া মারিলেক তখন বীণাকণ কহিতেছেন কেন হে তোমারে উষ্মা যুক্ত দেখিতেছি তোমার কতাগুলা বিরক্ত বিরক্ত অন্য মুখ প্রসন্ন নহে কতা অনুরাগ মধুর বাণী সমস্ত অদর্শন হইয়াছে কেন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার :

'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় মৃত্যুঞ্জয়ের পদবি 'ভট্টাচার্য' লেখা হলেও তিনি 'চট্টোপাধ্যায়' বংশসম্ভূত। জন্মেছিলেন মেদিনীপুর জেলায়। সময় আনুমানিক ১৭৬২-৬৩ খ্রিস্টাব্দ। মাসিক ২০০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিত হিসেবে যোগ দেন ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে। ১৮০৫ থেকে ওই কলেজে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ১৫ বছর কলেজে অধ্যাপনা করেও তাঁর বিশেষ উন্নতি হয়নি। অর্থকরী উন্নতিলাভে উৎসুক মৃত্যুঞ্জয় ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে সুপ্রিম কোর্টের পণ্ডিত পদে যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ত্যাগ করলেন। হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রভিজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয় তখন কোর্টের জজ-পণ্ডিতের কাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। মতবাদের দিক দিয়ে গোঁড়া রক্ষণশীল হলেও ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে সদর দেওয়ান আদালতের প্রধান বিচারপতির অনুরোধ সহমরণ প্রথাকে অশাস্ত্রীয় বলতে দ্বিধা করেননি। রামমোহনও মৃত্যুঞ্জয়ের মতকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেছেন। মৃত্যুঞ্জয় হিন্দু কলেজের ২০ জন দেশীয় সদস্যের একজন এবং কলিকাতা 'স্কুল বুক সোসাইটির'ও অন্যতম সদস্য।

ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের উজ্জ্বলতম রত্ন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯) প্রাক্ বিদ্যাসাগর যুগের বাংলা গদ্যের প্রথম সচেতন নির্মাতা। মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন,

> "১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত-গ্রন্থ' প্রকাশিত হয়। তৎপূবে যাঁহারা বাংলা গদ্যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে—রামরাম বসু, উইলিয়ম কেরী, গোলোকনাথ শর্মা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি ও হরপ্রসাদ রায়। পাণ্ডিত্য ও ভাষার গুণ বিচার না করিয়াও শুধু রচিত-পুস্তকের সংখ্যাধিক্যেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার এই দলের প্রধান, গোলোক শর্মা, তারিণীচরণ, রাজীবলোচন, চণ্ডীচরণ, রামকিশোর ও হরপ্রসাদ প্রত্যেকেই একখানি করিয়া এবং কেরী ও রামরাম প্রত্যেকেই দুইখানি করিয়া সাহিত্য বিষয়ক গদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। একা মৃত্যুঞ্জয়ী ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চারিখানি গ্রন্থ—*বত্রিশ সিংহাসন* (১৮০২), *হিতোপদেশ* (১৮০৮), (৩) *রাজাবলি* (১৮০৮), (৪) *বেদান্তচন্দ্রিকা* (১৮১৭), (৫) *প্রবোধচন্দ্রিকা* (রচনা ১৮১৩, প্রকাশ ১৮৩৩)। প্রথম তিনটি তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত।"

মৃত্যুঞ্জয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, পরে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পাদরি উইলিয়ম কেরির শিক্ষাগুরু ছিলেন।

২. ফেব্রুয়ারি, ১৮২২ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় জানানো হয় শ্রীরামপুরে ছাপা 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর দাম ৫ টাকা। মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থেরই চতুর্থ সংস্করণ ১৮২১-২২-এ প্রকাশিত হয়। ১৮১০-২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থাদির একটি তালিকায় লেখক 'প্রবোধচন্দ্রিকা'-র রচনাকাল ১৮১৩ বলে অনেকে মনে করলেও সুকুমার সেন বলেছেন 'ইহা নিছক অনুমান মাত্র।' মৃত্যুঞ্জয়ের অনুরোধে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষকে লেখা উইলিয়ম কেরির চিঠি (৫ জানুয়ারি, ১৮১৯) ব্রজেন্দ্রনাথ এবং

সজনীকান্ত উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে দেখা যায় মৃত্যুঞ্জয় কেরির অনুরোধেই এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং চিঠিটি লেখার সময়ে 'প্রবোধচন্দ্রিকা' শ্রীরামপুর প্রেসে যন্ত্রস্থ ছিল। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থ যন্ত্রস্থ থাকার সময় মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হয়। ফলে মুদ্রণ বন্ধ থাকে এবং ১৪ বছর পর ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থের 'নির্ঘণ্ট' বা সূচিপত্রের আগে জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখিত একটি ভূমিকা আছে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু চারটি 'স্তবকে'-বিভক্ত। প্রত্যেকটি 'স্তবক' কয়েকটি 'কুসুম'-এ বিভক্ত। প্রথম স্তবকের প্রথম কুসুম—মুখবন্ধ, তৃতীয় ও চতুর্থ কুসুমে ব্যাকরণ পরিচয় ও কাব্য লক্ষণ, পঞ্চম কুসুমে দু'প্রকার গদ্য আখ্যায়িকা ও কথার পরিচয় আছে। এ বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয় আচার্য দণ্ডীর কাব্যাদর্শকে মান্য করেছেন। এই কুসুমে বিভিন্ন প্রকার ন্যায়ের বর্ণনাসূত্রের ছোট ছোট গল্পাকারে নীতিশিক্ষা রয়েছে। দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম কুসুমে 'বাক্যের দশবিধ গুণ' বর্ণনা প্রসঙ্গে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণগুলি নীতিশিক্ষামূলক। অন্যান্য স্তবকের প্রত্যেক কুসুমে নীতিশিক্ষা উচ্চারণ করে তার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থে সংস্কৃতেও বেশ কিছু নীতিবাক্য রয়েছে।

গদ্যস্রষ্টা মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে প্রথম কথা তাঁর অদ্বিতীয় ভাষাজ্ঞান। সংস্কৃতে অনায়াস অধিকারের ফলে তিনি দুরূহ শাস্ত্রবিচারকে আয়ত্ত করেছিলেন এবং সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র ও কাব্যে অশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। ফলে গদ্যরীতি (স্টাইল) সম্পর্কে তাঁর শিল্পীমন সচেতন হয়ে উঠেছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে তাঁর রচনাতেই সাহিত্যিক গুণ ছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি বাংলা লিখতে বসে একটি নিজস্ব স্টাইল খাড়া করেছিলেন এবং সাধু ও চলিত—এই দুই ভিন্ন রীতির পার্থক্য বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর পাঁচটি গ্রন্থ একই ভঙ্গিতে রচিত নয়, বক্তব্য-ভেদ ও গুরুত্ব-ভেদে তিনি স্টাইল বদল করেছেন।

মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, একথা ঠিক। কিন্তু সেই জ্ঞান তাঁর সাহিত্যকর্মের পথে অচলায়তন সৃষ্টি করেনি, পরন্তু তাঁর মনকে উদার ও গ্রহণেচ্ছু করে তুলেছে। কেরিকে তিনি যেমন সংস্কৃত ও বাংলা শিখিয়েছেন, তেমনই নিজে কেরির কাছে ইংরেজি গদ্যের পাঠ নিয়েছেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-গোষ্ঠীর লেখকরা পূর্বপ্রচলিত পণ্ডিতি পদ্ধতি, বা সংস্কৃত রীতি ও কথকতার কথ্যরীতিতে গ্রন্থ রচনা করতেন। আরবি-ফারসি শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ যেমন আছে, সংস্কৃত শব্দের উপর অতি-নির্ভরতাও আছে।

> "এই সকল গ্রন্থে রচনারীতির প্রধান দোষ হইতেছে—(১) দুরান্বয়, (২) পেরেনথিসস্‌ম-এর অত্যধিক ব্যবহার এবং (৩) ছেদচিহ্নের অল্পতা। তখনকার দিনের সাধুভাষার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লক্ষণীয় হইতেছে এই আটটি—(১) একাধিক বহুবচন বিভক্তির ব্যবহার, যেমন—স্ত্রীগণেরা, ভৃত্যবর্গেরা, পঞ্চজন যক্ষেরা ইত্যাদি। (২) তৃতীয়া-সপ্তমীতে-এতে বিভক্তির ব্যবহার, যেমন—হাতেতে, ঘরেতে, ইত্যাদি। (৩) ক্রিয়াযোগে চতুর্থীর স্থানে-কে বা-রে বিভক্তির ব্যবহার, যেমন—বিপরীত বুদ্ধি দাউদকে ঘটিল, আমি প্রসন্ন আছি তোকে, রাজাকে সন্তুষ্ট হইয়া, আমারও উচিত নহে এখানে থাকিতে, ইত্যাদি; (৪) তৃতীয় বিভক্তির স্থানে "করণকে" শব্দের প্রয়োগ, যেমন—ঐরাবত করণকে

পর্ব্বত বিদার করিয়া দিলে, হংস হত হইল পথিক করণকে, ইত্যাদি (৫) ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত বহুবচনের দিগ বিভক্তির যোগ, যেমন—তাহারদিগের, রাজারদিগকে ইত্যাদি; (৬) শতৃপ্রত্যয়জাত শব্দের অসমাপকা অর্তে প্রয়োগ, যেমন—চরত, আচরত, হওত, ইত্যাদি (৭) সামান্য অথবা নিত্যবৃত্ত অতীতের স্থলে অসম্পন্ন বর্তমান কালের ব্যবহার যেমন—পথিক প্রকাশ করিয়া কহিতেছে, ইত্যাদি (৮) -অন এবং -ইবা প্রত্যায়ান্ত শব্দে সপ্তমী বিভক্তি যোগ করিয়া তাহা -ইলে প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা অর্থের ব্যবহার, যেমন—হইবাতে, আইসনে, পাওনেতে ইত্যাদি।" (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য)।

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা ঐ যুগের রচনারীতির এইসব সাধারণ দোষ থেকে মুক্ত নয়। *বেদান্তচন্দ্রিকা* ছাড়া বাকি চারটি গ্রন্থই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক, বিদেশি ছাত্রদের জন্য লিখিত। তাঁর পাঁচখানি গ্রন্থে স্টাইলের যে বিবর্তন লক্ষ করা যায় তা থেকে মনে হয়, মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন সচেতন গদ্যনির্মাতা।

মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম গ্রন্থ 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২)। পরবর্তীকালে শ্রীরামপুর ও লণ্ডন থেকে এর কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বইটি অনুবাদ, স্থানে স্থানে আক্ষরিক অনুবাদ। ভাষা সংস্কৃত রীতির সাধু গদ্য। এর নমুনা—

১. "হে মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখনও কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্তমাংস মলমূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যান্তিক প্রীতি করা জ্ঞানী জনের উপযুক্ত নয় প্রীতি যেমন সুখদায়ক বিচ্ছেদে ততোধিক দুঃখদায়ক হন অতএব নিত্য বস্তুতে মনোভিনিবেশ জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। নিত্য বস্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমপুরুষ ব্যতিরেক কেন নয় তাঁহাতে মন সুস্থির হইলে জীব অসার সংসার কারাগার হইতে মুক্ত নন।" (মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, পৃ. ২৭)

যতিচিহ্নের অল্পতা সত্ত্বেও এখানে অর্থবোধে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। মৃত্যুঞ্জয়ের লিপিকুশলতার পরিচয়রূপে এই অংশকে গ্রহণ করতে পারি।

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'হিতোপদেশ' (১৮০৮) আক্ষরিক অনুবাদ, বাক্যরীতি সংস্কৃতানুসারী, মাঝে মাঝে উৎকট। বাক্যে ভারসাম্যের অভাব আছে।

২. "দ্বারবতী নামে পুরীতে কোন গোপের বন্ধু থাকে সে ভ্রষ্টা গ্রামের কোটালের এবং তাহার পুত্রের সহিত ক্রীড়া করে পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন কাষ্ঠেতে অগ্নি হয় না নদীতে সমুদ্র তৃপ্ত হয় না সমস্ত প্রাণিতেও যম তৃপ্ত হয় না। পুরুষেতে স্ত্রী তৃপ্ত হয় না। অপর স্ত্রীলোক দানেতে তুষ্ট হয় না ও সম্মানেতে তুষ্ট হয় না ও সারলোতে তুষ্ট হয় না ও সেবাতে তুষ্ট হয় না শাস্ত্রেতে বশীভূতা হয় না যেহেতু স্ত্রী জাতিরা সর্ব্বপ্রকারে বিষম।" (গ্রন্থাবলী, পৃ. ৮১)

এই ভাষা পূর্ববর্তী গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক সংস্কৃত-ঘেষা। সংস্কৃত ক্রিয়াপদের প্রভাব লেখক কাটিয়ে উঠতে পারেননি, প্রথম বাক্যেই তার পরিচয় আছে।

তৃতীয় গ্রন্থ 'রাজাবলি' (১৮০৮) অনুবাদ, বাংলা ভাষায় ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস। প্রথম দুটি গ্রন্থের দোষ থেকে মুক্তিলাভ করে এখানেই মৃত্যুঞ্জয় গদ্যস্রষ্টা রূপে আপন দাবি প্রতিষ্ঠিত করলেন। এতে উন্নত বাক্যপদ্ধতি ও অনাড়ষ্ট একাধিক পদ্ধতির বাক্য আছে, কিন্তু আগের মতো দুই

পদ্ধতির বিসদৃশ সংমিশ্রণ নেই। নমুনা—

৩. "যে সিংহাসনে কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ স্বর্ণদাতারা বসিতেন সেই সিংহাসনে মুষ্টিমাত্র ভিক্ষার্থী অনায়াসে বসিল। যে সিংহাসনে বিবিধপ্রকার রত্নালঙ্কারধারিরা বসিতেন সে সিংহাসনে ভস্মবিভূষিত সর্ব্বাঙ্গ কুযোগী বসিল। যে সিংহাসনে অমূল্য রত্নময় কিরীটধারি রাজারা বসিতেন সেই সিংহাসনে জটাধারী বসিল। যে সিংহাসনস্থ রাজাদের নিকটে অনাবৃত অঙ্গে কেহ যাসতে পারিত না সেই সিংহাসনে স্বয়ং দিগম্বর রাজা হইল। যে সিংহাসনস্থ রাজাদের নিকটে অনাবৃত অঙ্গে কেহ যাইতে পারিত না সেই সিংহাসনে স্বয়ং দিগম্বর রাজা হইল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের সম্মুখে অঞ্জলীকৃত হস্তদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া লোকেরা দাঁড়াইয়া থাকিত সেই সিংহাসনের রাজা স্বয়ং উর্দ্ধবাহু হইল।" (গ্রন্থাবলী, পৃ. ১৩৪)

একাধিক বহুবচন-বিভক্তির ব্যবহার ও ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্ত পদের সঙ্গে বহুবচন-বিভক্তির যোগ সত্ত্বেও এই গদ্যাংশের গতিবেগ সহজেই অনুভব করা যায়।

চতুর্থ গ্রন্থ 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (১৮১৭) রামমোহন রায়ের 'বেদান্তগ্রন্থ'-এর (১৮১৫) প্রতিবাদে লিখিত। বাংলা গদ্য গুরুচিন্তার ভারবহনে কতটা সমর্থ, তার পরীক্ষা এখানে করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের স্তর থেকে শাস্ত্রবিচারের স্তরে বাংলাকে গদ্যকে উন্নীত করলেন মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহন। কঠোর শাস্ত্রীয় বিচারে এতাৎকাল এই পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে। নব্যপন্থী রামমোহনের বাংলাভাষায় বেদান্তচর্চার প্রতি কটাক্ষ করে প্রাচীনপন্থী মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থ-উপসংহারে যে মন্তব্য করেছেন, তা থেকে *বেদান্তচন্দ্রিকার* বাক্যপদ্ধতি ও ভাষারীতির প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়।

৪. "পরমার্থদর্শী ধার্ম্মিক সৎপুরুষদের নিম্মলজলবদ্‌বুদ্ধিতে বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিস্তারার্থে তৈলকণাবৎ বেদান্তসিদ্ধান্তলেশমাত্র প্রক্ষেপ করা গেল আর যেমন মরি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে না কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে অতি যত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন তেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু সুপক্ক বদরীফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে। আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রির হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নানা উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রতেই পরান্মুখ হন। (গ্রন্থাবলী, পৃ. ২১৩)

লেখকের রক্ষণশীলতা এখানে দৃষ্টিভঙ্গি ও বাক্যপদ্ধতি, উভয়ত্রই লক্ষ্য করা যায়। *রাজাবলির* প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতা এখানে নেই। হয়তো বিষয়গুরুত্ব তার কারণ।

মৃত্যুঞ্জয়ের শেষ গ্রন্থ 'প্রবোধচন্দ্রিকা' লেখকের মৃত্যুর অনেক পরে প্রকাশিত (১৮৩৩)। এই গ্রন্থ বহু বৎসর যাবৎ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, হিন্দু কলেজ, হুগলি কলেজ ও পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলিত ছিল। *প্রবোধচন্দ্রিকা* লেখকের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বহু শাস্ত্র, অলংকার ও নীতিবিদ্যার সংকলন এই গ্রন্থ।

কেরির অনুরোধে হিন্দুসমাজ ও সাহিত্যের সামগ্রিক ইতহাস রূপে মৃত্যুঞ্জয় *প্রবোধচন্দ্রিকা* লেখেন। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে কেরি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে মৃত্যুঞ্জয়কে এই গ্রন্থ রচনার জন্য পুরস্কৃত করার সুপারিশ করেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় পুরস্কারের জন্য অপেক্ষা করেনন, কয়েক মাসের মধ্যেই ধরাধাম

পরিত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর চোদ্দ বছর পরে শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানার কবল থেকে 'প্রবোধচন্দ্রিকা' নিষ্কৃতি লাভ করে (১৮৩৩)।

প্রবোধচন্দ্রিকায় তিনটি বিভিন্ন রচনারীতি অনুসৃত হইয়াছে, কথ্যরীতি, সাধুরীতি ও সংস্কৃতরীতি। কথ্যরীত প্রধানত কতকগুলি লোকপ্রচলিত গল্পের বর্ণনায় ব্যবহৃত হইয়াছে। বইখানার অধিকাংশ সাধুরীতিতে লেখা। সংস্কৃতরীতির ব্যবহার কেবল সংস্কৃত হইতে আক্ষরিকভাবে অনূদিত অংশ এবং দার্শনিক ও আলঙ্কারিক বর্ণনাতেই। এযাবৎ যাঁহারা প্রবোধচন্দ্রিকা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই এই তৃতীয় রীতিকেই প্রবোধচন্দ্রিকার বিশিষ্ট রচনারীতি মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন। আসলে এই রীতি কেবল বিদেশী ছাত্রদিগকে সংস্কৃত লিখিত গ্রন্থের বা তত্ত্বের সারসংগ্রহ জানাইবার ও সেইসঙ্গে মূলের ভাষার পরিচয় উদ্দেশ্যেই স্থানে স্থানে মাত্র অবলম্বিত হইয়াছে। কথ্য ও সাধু উভয় রীতিতেই মৃত্যুঞ্জয় রচনাকুশলতা দেখাইয়াছেন। তবে তাঁহার রচনা সে যুগের রচনারীতির সাধারণ দোষ হইতে নির্মুক্ত নয়। স্থানে স্থানে সংস্কৃতানুসারী হওয়াতে ভাষাও সর্বত সুগম নয়। তবে কথ্যভাষামূলক অংশগুলি প্রাঞ্জল। (সুকুমার সেন *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য*)

প্রবোধচন্দ্রিকায় ব্যবহৃত এই তিন রীতির নমুনা

কথ্য বা মৌখিকরীতি—

১. "তাহার স্ত্রী কপালে করাঘাত করিয়া বলিল ওমা একি হইল শিয়ালের কামড় বড় মন্দ না জানি মোর ভাগ্যে কি আছে অভাগিনী জন্মদুঃখিনী মুই। মোরা চাস করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ধ অল্প করিয়া খাবো ছেলেপিলাগুলি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাকে কিছু খন্দ হয় না সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মসুর শাক পাত শামুক গুগলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কঞ্চী তুঁষ ও বিলঘুটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কাপাস তুলি তুলা করি ফুড়ি পিঁজী পাইজ করি চরকাতে সুতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি।"

২. অনন্তর ঐ স্ত্রী পতিকে কহিত হে প্রাণনাথ প্রতিদিবস প্রত্যুষ সময়ে এ গুলা ক ডাকে শুনিবামাত্র আমার হৃৎকম্প হয় ওমা এ বালাইগুলার ডাক এমন কেন আজ হইতে এ পাপ গুলার ডাক এমত যেন না হয় তাহা তুমি কর তোমার পায়ে পড়ি আমার মাথা খাও ভাগ্যে আজ বাঁচিলাম এমনি হইতে না জানি কোন দিন মরিয়া যাইব।'

বিরামচিহ্নের বিরলতা ছাড়া এই কথ্যরীতির বিশেষ কোনো দোষ নেই। প্রমথ চৌধুরী এই অংশ উদ্ধার করে এক ভাষণে বলেছিলেন, "এ ভাষা সজীব সতেজ স্বচ্ছন্দ ও সরল। ইহার গতি মুক্ত, ইহার শরীরে লেশমাত্রও জড়তা নাই। এবং এভাষা যে সাহিত্যরচনার উপযোগী, উপরোক্ত নমুনাই তাহার প্রমাণ। এই ভাষার গুণেই বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের রচিত পল্লিচিত্র পাঠকের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে।...আমার বিশ্বাস, আমাদের পূর্ববর্তী লেখকেরা যদি বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের রচনার এই বঙ্গীয় রীত অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে কালক্রমে এই ভাষা সুসংস্কৃত এবং পুষ্ট হইয়া আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি

করিত।" (উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ), *ফাল্গুন* ১৩২১)।

আলালী গদ্যরীতি এই নিরলঙ্কার কথ্যরীতির পরবর্তী রূপ।

সাধুরীতি : "পঞ্চকোট বনমধ্যে এক ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রী সুখে বাস করে। কালপ্রভাবে ঐ বাঘিনীর কাল হওয়াতে ব্যাঘ্র স্ত্রীবিয়োগে অতিকাতর হইয়া বিবাহাথ উন্মত্তপ্রায় হইল। স্বয়ং অনেক অন্বেষণ করিয়া কোথায় কন্যা না পাইয়া পথিকেরদিগকে ভক্ষণ করিয়া বস্ত্রালঙ্কার স্বর্ণরূপাদ যথেষ্ট সামগ্রী লইয়া রাত্রিকালে এক ঘটক ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে আসয়া গভীরস্বরে ডাকিয়া কহিল। ঘটক ঠাকুর তোমরা সকলের সম্বন্ধে নির্ণয় করিয়া বিবাহের মধ্যস্থ হইয়া পণের অংশ কিছু পাইয়া শুভ কর্ম্ম লগ্নানুসারে সম্পন্ন করিয়া থাক। আমি আগেই প্রচুর ধন আনিয়াছি তাহা নির্ভয়ে লও আমার বিবাহ যেরূপে হয় তাহা শীঘ্র কর। কন্যার কুলশীল সৌন্দর্য্য বয়স আমার কিছু নির্ব্বন্ধ নাই যেমন তেমন একটি স্ত্রী মাত্র হইলেই হয়।"

প্রবোধচন্দ্রিকায় তিনটি বিভিন্ন রচনারীতি অনুসৃত আছে—কথ্যরীতি, সাধুরীত ও সংস্কৃতরীতি। কথ্যরীতি প্রধান কতকগুলি লোকপ্রচলিত গল্পের বর্ণনায় ব্যবহৃত। বইখানির অধিকাংশ সাধুরীতিতে লেখা। সংস্কৃতরীতির ব্যবহার শুধুমাত্র সংস্কৃত থেকে আক্ষরিকভাবে অনুবাদিত অংশে এবং দার্শনিক ও আলঙ্কারিক বর্ণনাতেই। এযাবৎ যাঁরা *প্রবোধচন্দ্রিকা* নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই এই তৃতীয় রীতিকেই *প্রবোধচন্দ্রিকার* বিশিষ্ট রচনাপদ্ধত মনে করেছিলেন। আসলে এই রীতি কেবল বিদেশি ছাত্রদের সংস্কৃতে লিখিত গ্রন্থের অথবা তত্ত্বের সারসংগ্রহ বোঝানো ও সে-বঙ্গে মূলের ভাষার পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যে অবলম্বিত হয়েছিল।

কথ্য ও উভয় রীতিতেই মৃত্যুঞ্জয় রচনাকুশলতা দেখিয়েছেন। তবে তাঁর রচনা সে যুগের রচনারীতির সাধারণ দোষ থেকে মুক্ত নয়। স্থানে স্থানে সংস্কৃতানুসারী। ফলে ভাষাও সর্বত্র সুগম নয়। তবে কথ্যভাষামূলক অংশগুলি ভালো।

সুকুমার সেনের মতে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনারীতির বিশেষত্ব হল, মধ্যে মধ্যে অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ প্রয়োগ। কহ্, কান্দিশীক, অপত্রপা, লাজা, সৈংহিকেয়, দোধুয়মান, অব্রুবাণ, একপদে, ইত্যাদি। সর্বাপেক্ষা, অনুবজিয়া (= অনুব্রজিয়া), প্রথমতো যুদ্ধাথের, সূর্য্য চন্দ্রোভয়বংশের মধ্যে—ইত্যাদিতে সংস্কৃতের মতো পদ ধাতু ও সন্ধির ব্যবহার হয়েছে। "আছে" অর্থে 'থাকে' এই পদের অনেক সময় ব্যবহার হয়েছে : "নর্মদাতীরে এক অতি বড় শাল্মলি বৃক্ষ থাকে"। 'ইয়া' ও 'ইতে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার স্থলে শতৃপ্রত্যয়জাত 'অত' প্রত্যয়ান্ত পদের ব্যবহার মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার এক বড় বিশেষত্ব "তাহার অনুচর পক্ষি কর্তৃক দণ্ডারণ্য মধ্যেতে চত আমি দৃষ্ট হইলাম।"

গদ্য নিদর্শন :

বত্রিশ সিংহাসন : ১৮০২

১. 'দক্ষিণ দেশে ধারা নামে এক পুরী ছল সেই নগরের নিকটে সম্বদকর নামে এক সস্যক্ষেত্র থাকে তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত সেই কৃষক শস্য ক্ষেত্রের চতুর্দিগে পরিখা করিয়া শাল তাল তমাল পিয়াল হিন্তাল

বকুল আম্র আম্রাতক চম্পক অশোক কিংশুক বক গুবাক নারিকেল নাগকেশর মাধবী মালতী যুতী জাতী সেবতী কদলী দাড়িনী তগর কুন্দ মল্লিকা দেবদারু প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া এক উদ্যান করিয়া আপনি সেই উদ্যানের মধ্যে থাকেন।'

২. 'রাজা বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে যোগী যে বিষয় অবশ্য ভবিতব্য তাহার অন্যথা কদাচ হয় না। পুরুষের চেষ্টাতে কি হয়। ইহা শুনিয়া যোগী কহিলেন হে মহারাজ তুমি যে পুরুষ কহিলা এ নীতি শাস্ত্র বিরুদ্ধ নীতি শাস্ত্রের মতে যে পুরুষ উদ্যোগ সর্ব্বদা করে সেই উত্তম পুরুষে আর ভবিতব্যই হয় যে ভবিতব্য নয় সে নানা যত্নেতেও হয় না এ কাপুরুষের কতা অতএব কোন কর্ম্ম পুরুষার্থ ব্যতিরেকে হয় না। সে যে হউক অনুদ্যোগী পুরুষ যে হয় সে কাপুরুষ। অতএব বিষয়কর্ম্মে সর্ব্বদা উদ্যোগ করিবে।'

৩. এই পরামর্শ করিয়া রাজা হাজারু হুণ দেয়াইলেন রাজার নিকট হুণ পাইয়াও তথা হইতে গেল না কথাও কিছু কহিল না। তখন রাজা কহিলেন হে যাচক কথা কেন কহ না। ভিক্ষুক কহিল লজ্জা প্রযুক্ত কহিতে পারি না। ইহা শুনিয়া রাজা পুনর্ব্বার দশ হাজার হুণ দেওয়াইলেন। পুনশ্চ রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে যাচক আশ্চর্য কিছু যদি জান তবে কহ।'

হিতোপদেশ : ১৮০৮

১. 'নর্ম্মদাতীরে এক অতিবড় শাল্মলি বৃক্ষ থাকে সেই তরুতে আপন চঞ্চুকরণক নির্ম্মিত নীড়মধ্যে পক্ষিরা বর্ষাতেও সুখেতে বাস করে। অনন্তর নীলবর্ণ ছবির তুলা মেঘসমূহেতে গগণমণ্ডল আচ্ছন্ন হইলে পরে স্থূল ধারাতে অতিবড় বৃষ্টি হইল সেই তরুতলেতে বানরেরদিগকে আর্দ্রীভূত শীতার্ত্ত (শীতার্ত) কম্পিত কলেবর দেখিয়া করুণাপ্রযুক্ত পক্ষিরা কহিল ওহে বানরেরা শুন...'

২. 'মগধদেশে চম্পকাবতী নামে এক বন থাকাতে তাহাতে হরিণ ও কাক দুইজন বহুকাল বড় স্নেহেতে বাস করে সেই হরিণ আপন ইচ্ছামত ভ্রমণ করত হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইয়া কোন শৃগাল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইল তাহাকে দেখিয়া শৃগাল চিন্তা করিল আঃ কি প্রকারে এই উত্তম ললিত মাংস খাইব যা হউক বিশ্বাস জন্মাই এই পরামর্শ করিয়া সমীপে গিয়া বলিল হে মিত্র তোমার মঙ্গল। মৃগ কর্ত্তৃক কথিত হইল কে তুমি শৃগাল কহিতেছে ক্ষুদ্রবুদ্ধি নামে শৃগাল আমি।'

চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর জন্মের স্থান-কাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়নি। তবে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের পরে কোন এক সময়ে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রিভি কাউন্সিলের সভায় চণ্ডীচরণকে বাংলা ভাষায় তুতিনামা অনুবাদের জন্য একশ টাকার পুরস্কার দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। চণ্ডীচরণ সে সময় মাসিক তিরিশ টাকা বেতনের এক পণ্ডিত ছিলেন। তোতা ইতিহাস কলেজের জন্য একশ কপি কেনা হয়েছিল। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৯ নভেম্বর চণ্ডীচরণ দেহত্যাগ করেন।

তাঁর একমাত্র গ্রন্থ *তোতা ইতিহাস* শ্রীরামপুরে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। 'তোতা ইতিহাস' কাদির বখ্‌শ রচিত ফারসি 'তুতিনামা'-র বঙ্গানুবাদ। পাঠ্যপুস্তক ও গল্পের বই দুই হিসাবেই চণ্ডীচরণের গ্রন্থের কিছু আদর ছিল। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনে হটন-সঙ্কলিত যে পাঠ্যসংগ্রহ প্রকাশিত হয় তাহার অর্ধেকের বেশি অংশ চণ্ডীচরণের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। ইয়েটসের সংগ্রহেও *তোতা ইতিহাস*-এর কয়েকটি কাহিনী স্থান

পেয়েছিল। এই বইয়ে মোট ৩৫টি কাহিনী আছে।

শুক বা তোতাপাখির মুখনিঃসৃত কাহিনী বা গল্প সেকালে খুবই জনপ্রিয় ছিল। *তোতা ইতিহাস*-এর ২য় সংস্করণ ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৪। লঙের তালিকায় এটি 'মুসলমানের গ্রন্থ' রূপে নির্দেশিত। অপর তালিকায় বলা হয়েছে গ্রন্থর প্রথম সংস্করণ ১৮০১ এবং শেষ সংস্করণ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ রায় *তোতা ইতিহাস*-এর একটি সংশোধিত সংস্করণ ১৮০১ এবং শেষ সংস্করণ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ রায় তোতা ইতিহাসের একটি সংশোধিত সংস্করণ (শুকোপাখ্যান) প্রকাশ করেন।

বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে *তোতা ইতিহাস*-এর যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল বিদেশিদের কাছে। *তোতা ইতিহাস*-এর লৌকিক রস এই গুরুত্বের অন্যতম কারণ। গ্রন্থর মূল্য নির্দেশ প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই মন্তব্য করেছেন—'১৯শ শতাব্দীর প্রধান বাণী—সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে মানবরস উপলব্ধি। *তোতা ইতিহাস*-এর কটু ব্যভিচারের গল্পের মধ্যে সেই মানবরসই ঈষৎ স্থূলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইসলামী বাতাবরণের জন্যই এই গল্পগুলির মধ্যে একটা তৃষাতপ্ত মর্ত্য-প্রেমের স্পশ পাওয়া যায়—যাহা একান্তভাবে দেহকেন্দ্রিক।'

গদ্য নিদর্শন :

তোতা ইতিহাস ১৮০৫

১. 'পূর্ব্বকালের ধনবানেদের মধ্যে আমদ সুল্‌তান নামে একজন ছিলেন যাঁহার প্রচুর ধন ও ঐশ্বর্য্য এবং বিস্তর সৈন্যসামন্ত ছিল এক সহস্র অশ্ব পঞ্চশত হস্তী একশত উষ্ট্রভারের সহিত তাঁহার দ্বারে হাজীর থাকিত কিন্তু তাঁহার সন্তান সন্ততি ছিল না এই কারণ তিনি দিবারাত্রি ও প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ঈশ্বরপূজকেরদের নিকটে গমন করিয়া সেবার দ্বারা সন্তানের বর প্রার্থনা করিতেন। কতক দিবস পরে ভগবান সৃষ্টিকর্তা সূর্য্যের ন্যায় বদন চন্দ্রের ন্যায় কপাল অতি সুন্দর এক পুত্র তাঁহাকে দিলেন।' (ময়মুনের জন্ম...পৃ. ১)

২. 'পরে রজনীতে খোজেস্তা উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া সারীর সম্মুখে আসিয়া চৌকির উপরে বসিয়া মনের মধ্যে বিবেচনা করিলেন যে আমি স্ত্রী ও সারী ও স্ত্রী এ সব কার্য্যেতে সারী আমার কথা শুনিয়া রাজনন্দনের নিকট আমাকে যাইতে অনুমতি দিবেক ইহা বুঝিয়া সমস্ত বিস্তারিত সারীকে গোচর করিলেন পরে সারী নীতিবাক্য দ্বারা কহিলেক যে এ কর্ম্ম স্ত্রীজাতির অতি অকর্ত্তব্য ইহাতে বড় দুর্নাম হইবে আর লজ্জা পাইবে খোজেস্তা প্রীতিতে ক্ষিপ্তবৎ হইয়াছেন অতএব সারীর নিষেধে অতি ক্রোধিত হইয়া দুই পদে অতি দৃঢ় করি ধরিয়া সারীকে ভূমিতে এমন আছাড়িলেন যে সারীর প্রাণ শরীর হইতে ত্যাগ করিলে সেই সারী মরিলে পরে সারীর পিঞ্জর খালি পড়িয়া রহিল।' (পৃ. ৯-১০)

তারিণীচরণ মিত্র (*The Oriental Fabulist*)

জন গিলক্রিস্টের তত্ত্বাবধানে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতরা হিন্দুস্থানি বিভাগের অধ্যক্ষ জন গিলক্রিস্টের তত্ত্বাবধানে কলেজের ছাত্রদের জন্য ঈশপ ও অন্যান্য প্রাচীন ফেবলস্ ইংরেজি ভাষা থেকে

কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় ভাষান্তরিত করেছিলেন। বইটি The Oriental Fabulist নামে রোমান অক্ষরে কলকাতায় ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। বঙ্গাংশ অনুবাদ করেছেন হিন্দুস্থানি বিভাগের দ্বিতীয় মুন্‌শী তারিণীচরণ মিত্র। গ্রন্থে ছোট ৫৪টি 'কথা' বা গল্প রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। এটি কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রচিত এবং কর্তৃপক্ষের অর্থানুকুল্যে প্রকাশিত। ৫৪টি গল্পের মধ্যে ৪০টি ঈশপের। গল্পের শেষে নীতিবাক্য উচ্চারিত। ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্টের বিষয়বস্তু 'মানবেতর প্রাণীর সাহায্যে মানবনীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।'

ফারসি উর্দু ইংরেজিতে তারিণীচরণের যতই ব্যুৎপত্তি থাক, তিনি বাংলা লেখায় তেমন পটু ছিলেন না। তারিণীচরণের রচনা অনুবাদ হলেও বাংলা হয়নি। তবে যেখানে মূল গল্পের বাক্যপদ্ধতি সরল, সেখানে অনুবাদ অবশ্য খানিকটা নির্দোষ। পাঠ্যপুস্তকরূপে তারিণীচরণের অনুবাদের তেমন জনপ্রিয়তা ছিল না।

ফোট উইলিয়ম কলেজ ছাড়াও কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি এবং ধমসভার সঙ্গে তারিণীচরণের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। গোঁড়া হিন্দু তারিণীচরণ স্বাভাবিক কারণেই সতীদাহপ্রথার ঘোর সমর্থক ছিলেন।

গদ্য নিদর্শন :

The Oriental Fabulist—১৮০৩

১. 'এক বলদ যে নাবল ভূমে চরিতেছিল, তাহার প্রাশস্তা ও তেজ এক বেঙ দেখিয়া বড় চকিত হইল, এবং অধৈয্য হইয়া চাহিলেক যে সেই প্রকার স্থৌল্য মত আপনাকে বিস্তার করে। ক্ষণেক কাল পযন্ত্য বায়ু পুরিত হইয়া এবং ফুলিয়া কহিলেক, "হে ভগিনী, তুমি কি বুঝ ইহাতেই হইবেন।" সে বলিলেক, অহা হইতে অনেক দূর আছ। ফিরে কহিলেক, "এখন হইল?" সে কহিলেক, কিছুই হয় নাই। পুনশ্চ জিজ্ঞাসিলেক, "কেমন নিঃসন্দেহ এই হইল?" সে উত্তর দিলেক, কিছু অহার ন্যায় হয় নাহি। পরে, এমত বৃথা মনঃস্থতে বিস্তর হাস্যস্পদ চেষ্টা পাইয়া, সেই বেঙ আপনার চাম ফাটাইলেক, এবং সেইখানে ব্যামোহত সারা হইল।

ফল, মহৎ ব্যক্তিরদিকের আন্ত্রিক গুণ অপেক্ষা, তাহারদিগের বাহ্য বিষয়ের সহিত সমান হইবার মিথ্যা বাসনাকরণ পুন পুন আমার দিগের নষ্ট হওনের হেতু ইতি। (ত্রয়োবিংশতি কথা, 'ভেক ওবলদের')

২. 'এক নেকড়িয়া অত্যন্ত লোভেতে একখান হাড় গিলিতে, তাহা দুরাদৃষ্টক্রমে তাহার গলাতে আটকিল; আর আপন অতিশয় বেদনাতে তাহা বাহির করিবার নিমিত্তে সকল পশুর নিকট মিনতি করয়া, প্রাথনা করিলেক। কেহ এমন ভয়ানক কপাল পরিক্ষার ঝুঁকী লইলেক না, কেবল সারস তারা পুরুষ্কারের ধমত বচনে সম্মত হইয়া, আপন অত্যন্ত লম্বা গলা তাহার গলার ভিতর প্রবেশ করিতে অসংসাহসি করিলে, এবং স্বচ্ছন্দে কর্ম সম্পন্ন করিয়া পুরুষ্কার চাহিলেক। নেকড়িয়া কহিলেক, দেখ কোন কোন পশুর এ কি অন্যায়। আমি কি তোকে আপন গলা আমার মুখে হইতে স্বচ্ছন্দে বাহির করিতে দি নাহি, যে তুই আপন উচিত জ্ঞানে আর পুরষ্কার চাহিস?'

হরপ্রসাদ রায় :

হরপ্রসাদ রায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একজন অস্থায়ী পণ্ডিত ছিলেন। জেমস লং তাকে কাঁচড়াপাড়ার লোক বলেছেন। হরপ্রসাদ রায়ের একমাত্র বই 'পুরুষপরীক্ষা' শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হয় ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে।

বইটি মৈথিল কবি বিদ্যাপতির 'পুরুষপরীক্ষা'র অনুবাদ। হরপ্রসাদ রায়ের রচনা মূল সংস্কৃতের অনুগত হলেও যথাসম্ভব সরল।

লণ্ড সাহেব বলেছেন ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে। ড. শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—'পুরুষপরীক্ষা' গ্রন্থ হরপ্রসাদ রায়ের নামে প্রচলিত বটে, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নামে ১৯০৪ সালে বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে ঐ একই বই প্রকাশিত হয়। তা হরপ্রসাদ রায়ের বই-এর অনুরূপ। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়েরও ধারণা, বইটি মৃত্যুঞ্জয়েরই লেখা। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষ বইটি দশ টাকা করে একশ কপি কিনেছিলেন।

গ্রন্থে প্রথাসিদ্ধ সূচিপত্র নেই। পরিবর্তে গ্রন্থের মূল বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যটি বর্ণিত। 'অভিনব প্রজ্ঞাবিশিষ্ট বালকেরদিগের নীতিশিক্ষার নিমিত্তে এবং কামকলা কৌতুকাবিষ্ট পুরস্ত্রীগণের হর্ষের নিমিত্তে শ্রীশিবসিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন...। যে গ্রন্থের লক্ষণোক্ত পরীক্ষার দ্বারা পুরুষ সকলের পরিচয় হয় এবং যে গ্রন্তের কথা সকল লোকের মনোরমা সেই পুরুষপরীক্ষা নামে পুস্তক রচনা করা যাইতেছে।'

'পুরুষপরীক্ষা'য় পুরুষের বিভিন্ন লক্ষণ নির্দেশ করে ৪৪টি গল্প আছে। এছাড়া আরও কয়েকটি উপদেশাত্মক গল্পও আছে। মোট চারটি পরিচ্ছেদে বাহান্নটি শিক্ষাপ্রদ উপদেশাত্মক গল্প আছে। সংস্কৃতের অনুবাদ বলে এই বইয়ের ভাষা সংস্কৃতানুসারী। স্থানে স্থানে কঠিন শব্দপ্রয়োগে দুর্বোধ্য হলেও লেখক ভাষাকে 'বিশেষ ওজস্বিতাগুণসম্পন্ন' করতে পেরেছিলেন।

গদ্য নিদর্শন :

পুরুষপরীক্ষা—(১৮১৫)

১. মথুর নগরীতে গূঢ়ধন নামা এক বরিক অত্যন্ত কৃপণ ছিল সে পিপ্পলীর বাণিজ্য করিয়া অতিশয় ধনবান হইল। এক সময় আসন্ন দুর্ভিক্ষ দেখিয়া এই চিন্তা করিল যদি এই দুর্ভিক্ষেতে স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারগণ আমার সকল অর্থ ভোজন করে তবে সেই ধনশোকেতে আমার প্রাণবিয়োগ হইবে...

২. উজ্জয়িনী নগরীতে এক রাজার তিন পুত্র ছিল। প্রথম পুত্র ভর্ত্তৃহরি দ্বিতীয় শক তৃতীয় বিক্রমাদিত্য এই তিন সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভর্ত্তৃহরি তিনি পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য হেতুক দ্বেষাদি দোষেতে রহিত ও পবিত্র এবং শান্তান্তঃকরণ আর সকরুণ এবং সকল বিষয়েতে বিরক্ত ছিলেন।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের একজন সহকারী পণ্ডিত ছিলেন। তার 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' শ্রীরামপুরে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এই বইয়ের জন্য রাজীবলোচনকে একশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয় এবং কলেজ-কর্তৃপক্ষ একশ কপি বই কিনতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বইটি অনেকটা রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের আদর্শে রচিত। বর্ণনামূলক

সাধু ভাষায় লেখা, বাক্য সরল ও সংক্ষিপ্ত। রচনাভঙ্গি রামরামের তুলনায় সরলতর। মধ্যে মধ্যে অন্ত্যর্ত ক্রিয়া কর্তৃপদের অপ্রয়োগ রাজীবলোচনের ভাষার এক বড় বিশেষত্ব : 'রাম সমাদ্দার পুত্রকে দেখিয়া বিবেচনা করিতেছেন বুঝি এই পুত্র হইতে আমাদিগের কুল উজ্জ্বল হইবেক আনন্দাণবে মগ্ন হইলেন।" অপর লক্ষণীয় বিশেষত্ব হল ফারসী "ত্বক" শব্দের গৌণকর্মবাচী অনুসর্গরূপে প্রয়োগ : দ্বারী মহারাজতক নিবেদন করিল", "পরে মুরসিদাবাদতক সমাচার হইল"।

ফোট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে রাজীবলোচনের বিশিষ্টতা ছিল সরল গদ্যে ধারাবাহিক বর্ণনায়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ঈশ্বরী পাটনীর বৃত্তান্ত। রাজীবলোচনের বইয়ের সমাদর অনেককাল পর্যন্ত ছিল।

রামকিশোর তর্কচূড়ামণি

বাংলা বিভাগের পণিহত রামকিশোরের 'হিতোপদেশ' বইটি চাক্ষুষ করার সুযোগ ঘটেনি। তিনি কলেজের পণ্ডিতের কাজ করতেন। বইটি প্রকাশিত হয় ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

কাশীনাথ ফোট উইলিয়ম কলেজের একজন সহকারী পণ্ডিত ছিলেন। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই পদে যোগ দেন। ১৮৩১ পর্যন্ত তিনি কলেজে চাকরি করেছেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে 'পদার্থকৌমুদী' নামে তাঁর যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল সেটি স্কুল বুক সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য ছিল না।

২.৪ সারাংশ

এই পর্বে বাংলাগদ্যের আবির্ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের আলোচনা করা গেল। খ্রিস্টান মিশনারীরা তাদের ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে গদ্যের ব্যবহার শুরু করেন। একই সময়ে ইংরেজ শাসকবর্গ শাসনব্যবস্থা চালনার উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করলেন। ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যে অধ্যক্ষ কেরি নিজে গদ্যে গ্রন্থ রচনা করলেন, তার অধ্যাপকেদের নির্দেশ দিলেন গদ্য রচনা। বর্তমান আলোচনায় তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

২.৫ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং শ্রীরামপুর মিশন, উভয়ের মেলবন্ধনে বাংলা গদ্য কীভাবে উপকৃত হয়েছে, সংক্ষেপে লিখুন।
২. বাংলা গদ্যে রামরাম বসুর ভূমিকা বিষয়ে তথ্যসহ মন্তব্য করুন।
৩. বাংলা গদ্যে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থটির গুরুত্ব কোথায়? বুঝিয়ে দিন।
৪. 'ইতিহাসমালা' বাংলা গদ্যে কী কারণে স্মরণীয়, বুঝিয়ে দিন।

৫. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে বর্ণনা করুন।
৬. চলিত গদ্যরীতির সূচনাপর্বে সাধু গদ্যে লেখা 'প্রবোধচন্দ্রিকা' স্থান করে নেবার কারণ কী? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৭. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের দ্বারা একাধিক হিতোপদেশ অনুবাদিত হয়েছিল। প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির গদ্যরীতির তুলনা করুন।
৮. বাংলা গদ্যে উইলিয়ম কেরির অবদান বিষয়ে অন্তত দুটি বইয়ের নিরিখে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
৯. শুকপাখির মুখে শোনা গল্প বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীচরণ মুনশির 'তোতা ইতিহাস' গ্রন্থে যেভাবে রূপ পেয়েছে, তার বিবরণ দিন।
১০. বাংলা গদ্যানুবাদে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের ভূমিকা কতটুকু ছিল, এ বিষয়ে তোমার মতামত যুক্তিসহ জানান।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গ্রন্থগুলির নাম কী? প্রকাশকালসহ উল্লেখ করুন।
২. শ্রীরামপুর মিশন-প্রকাশিত রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থ দুটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
৩. 'লিপিমালা' সম্বন্ধে টীকা রচনা করুন।
৪. বাংলা ভাষায় ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস গ্রন্থের নাম কী?
৫. 'কথোপকথন' বইটি কী কারণে বাংলা গদ্যের ইতিহাসে বিখ্যাত? অল্প কথায় লিখুন।
৬. 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' বইয়ের রচয়িতা, প্রকাশকাল ও বিষয়বস্তু বর্ণনা করুন।
৭. রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচিত গ্রন্থটির নামোল্লেখ করে বিষয়-বিবরণ দিন।
৮. গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' কী কী কারণে বাংলা গদ্যে উল্লেখযোগ্য?
৯. 'পুরুষপরীক্ষা' বইটি কার লেখা? লেখক কোন বই থেকে এটি অনুবাদ করেছিলেন?
১০. ঈশপের গল্প ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্যগ্রন্থে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছিল?

২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৫
বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য—সুকুমার সেন ১৯৯৮
বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস ১৯৮৮
বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ২০০০
সাহিত্য-সাধক চরিতমালা (১ম খণ্ড)—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

একক ৩ ❑ বাংলা গদ্য ও প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশ

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৩.৪ অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাদ মিত্র

৩.৫ কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩.৬ মীর মশাররফ হোসেন

৩.৭ স্বামী বিবেকানন্দ

৩.৮ সারাংশ

৩.৯ অনুশীলনী

৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ উদ্দেশ্য

আগে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে গদ্যের চর্চা আলোচনা করেছি। এই পর্বে ব্যক্তিগত বাঙালি বিদ্বোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের যে উদ্যোগ পাওয়া যায় সে সম্পর্কে আলোচনায় শিক্ষার্থীদের জ্ঞানকে আরও স্পষ্ট করাই উদ্দেশ্য।

৩.২ প্রস্তাবনা

বাংলা গদ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগেও বাংলা গদ্য প্রাণ পেল। সামাজিক প্রয়োজনে বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হল, সঙ্গে যুক্ত হল ধর্মের চাহিদা। এরপর এল বাঙালির জন্য শিক্ষার চাহিদাপূরণে পাঠ্যপুস্তকে বাংলা গদ্যের ব্যবহার। ধীরে ধীরে গদ্যের ক্ষেত্রটি বিস্তৃত হল। সমাজের নানা অবিচার, কুসংস্কার, ভ্রান্তর বিরুদ্ধে লেখককুল প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন। হাতিয়ার বাংলা গদ্য। গদ্যে এল মুক্ত, মননের ক্ষুরধার দীপ্তি। এ নিয়েই আমাদের এবারের আলোচনা।

৩.৩ রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রামমোহন রায়

উনিশ শতকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাংলা গদ্যের ব্যবহার সর্বপ্রথম করেছিলেন রামমোহন রায়। রামমোহন রায়ের হাতেই বাংলা গদ্যে দার্শনিক জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত। তবে একথা মানতেই হয়, সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি গদ্যচর্চা করেন। তাই তার রচনায় সাহিত্যরসের সন্ধান পাওয়া যাবে না। বরং বিষয় অনুযায়ী যুক্তিনিষ্ঠ গদ্যরচনায় তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। সেকালের নিরিখে রামমোহনের গদ্য ছিল অবশ্যই প্রাঞ্জল। এই গুণটি সমসাময়িক বাংলা গদ্যে দুর্লভ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর লেখা সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখতেন,...কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তদৃশ মিষ্টতা ছিল না।'

তিনি সেকালের বাংলা গদ্যের দুর্বলতা কোথায়, সে-সম্বন্ধে ভালোভাবেই জানতেন। ফলে রামমোহন রচনারীতিতে যথাযোগ্য সারল্যের উপস্থিতি ছিল। প্রাথমিক পর্বে বাংলা গদ্যের যে নড়বড়ে ভাবটি দেখা যায়, তার অন্যতম কারণ ছিল অন্বয়ের শিথিলতা বা দুর্বোধ্যতা এবং যথাযথ বিরামচিহ্নের অভাব। রামমোহন এ বিষয়েও সচেতন ছিলেন। তাঁর সচেতনতার পরিচয় আছে 'বেদান্তগ্রন্থ'র ভূমিকায়। তার রচনাদির রূপ, লাবণ্য এবং সাহিত্যমূল্য না থাকলেও ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে।

রামমোহনের প্রথম দুটি বই—*বেদান্তগ্রন্থ* (১৮১৫), *বেদান্তসার* (১৮১৫)। তার বেদান্তচর্চার বিরুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার লিখেছিলেন *বেদান্তচন্দ্রিকা*। এর প্রত্যুত্তরে রামমোহন লেখেন 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার'। সহমরণপ্রথার অশাস্ত্রীয়তা ও অযৌক্তকতা প্রতিপন্ন করে রামমোহন দুটি বই লিখেছিলেন 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১৮১৮), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৯)। কাশীনাথ তর্কপঞ্চনন রামমোহনকে কটাক্ষ করে লিখেছিলেন *পাষণ্ডপীড়ন* (১৮২৩)। তার প্রত্যুত্তর রামমোহনের *পথ্যপ্রদান* (১৮২৩)। রামমোহন উপনিষদের বেশ কিছু অংশও অনুবাদ করেন। সুকুমার সেনের মতে 'অনুবাদের ভাষা সরল ও সহজ'।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রামমোহনের সমকালে এবং বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের আগেই সংবাদ-সাময়িকপত্রের কল্যাণে বাঙালি পাঠক সাধু ছাঁদের বাংলা গদ্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তখনও বাংলা গদ্যের বাক্যগঠনের স্থিতিস্থাপকতা কোনও নির্দিষ্ট রূপ পায়নি। বিদ্যাসাগর তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ('বেতালপঞ্চবিংশতি') থেকেই বাংলা গদ্যের মেদমাংসে লাবণ্য সঞ্চার করতে থাকেন। গদ্যভাষারও যে একটা বিশিষ্ট রচনাপদ্ধতি আছে, তারও কবিতার মতো সুর-তাল-গতি আছে—সর্বোপরি গদ্যেও ফুটে উঠল।

বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' ১৮৪৭ সালে (সংবৎ ১৯০৩) প্রকাশিত হয়। এই আখ্যানগ্রন্থ থেকে সে যুগের বাঙালিসমাজ সর্বপ্রথম গল্পরসের আস্বাদ লাভ করে। বেতালের অদ্ভুতরস

এবং বুদ্ধির চমক সে যুগের সাধারণ পাঠকের বিশেষ কৌতূহল জাগিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' সংস্কৃত থেকে নয়, হিন্দি 'বৈতালপচ্চীসী' গ্রন্থ থেকেই অনুবাদিত হয়েছিল। এর প্রথম থেকে নবম সংস্করণ পর্যন্ত তিনি বিরামচিহ্ন হিসেবে শুধু দাঁড়ি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু দশম সংস্করণ (১৯৩৩ সংবৎ—১৯৭৭ খ্রিঃ অঃ) থেকে ইংরেজি গ্রন্থের কমা-সেমিকোলন প্রভৃতি বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছিল। সরস অনুবাদের গুণে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' একদা অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বাংলা গদ্যের বিবর্তন ইতিহাসের দিক থেকেই 'বেতালপঞ্চবিংশতি' একদা অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বাংলা গদ্যের বিবর্তন ইতিহাসের দিক থেকেই 'বেতালপঞ্চবিংশতি' অধিকতর মূল্যবান, কারণ এই গ্রন্থেই সাহিত্যের গদ্যের প্রথম সাথক ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে।

জন ক্লার্ক মার্শম্যানের Outlines of the History of Bengal for the use of Youths in India গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বনে বিদ্যাসাগর 'বাংলার ইতিহাস—দ্বিতীয় ভাগ' (১৮৪৮) রচনা করেন। বিদ্যাসাগর স্কুলপাঠ্য পুস্তকের জন্যই এই অনুবাদ করেছিলেন বটে, কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য এই গ্রন্থের প্রথম পরিকল্পনা হয়। এর ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গিমা এত চমৎকার যে, একে প্রায় মৌলিক গ্রন্থ বলেই মনে হয়।

১৮৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'এর কাহিনির অনুবাদ—'শকুন্তলা'। এর পর তার সম্পাদনায় ১৮৬১ সালে 'কুমারসম্ভবম্', ১৮৬৯ সালে 'মেঘদূতম্' এবং ১৮৭১ সালে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'এর সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শকুন্তলার দ্বারাই তিনি পাঠকমহলে যথাথ গদ্যশিল্পী বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন—যথার্থ সাহিত্যরস ও লিপিকৌশল সর্বপ্রথম 'শকুন্তলা'য় প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর অনুবাদের বহুস্থলে মুখের ভাষা ও রস বজায় রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। প্রয়োজনস্থলে আলঙ্কারিক শব্দপ্রয়োগেই কুণ্ঠিত হননি।

নিছক সাহিত্যচর্চা ও 'রসচর্বণা' তার মতো উপযোগবাদী মানবপ্রেমিকের কাছে অলস মানসিক বিলাস বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক লিখলেও মূলতঃ ছিলেন শিল্পী; তাঁর অজ্ঞাতসারেই পাঠ্যপুস্তক ও অনুবাদ গ্রন্থে ব্যক্তিস্পর্শজনিত পারিপাট্য ও শ্রীছাঁদ সঞ্চারিত হয়েছে—রামমোহনের গদ্যে যার একান্ত অভাব। যাঁরা বিদ্যাসাগরের পূর্বে গদ্য রচনা করেছিলেন, তাঁরা বস্তু ও ভাবের দিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের গদ্যে তদতিরিক্ত শিল্পশ্রী, সুর, ছন্দ রং ও রস ফুটে উঠল। তার পূর্ববর্তী লেখকেরা শুধু গদ্যলেখক, বিদ্যাসাগর হলেন গদ্যশিল্পী। প্রকাশভঙ্গিমাই সাহিত্যের মূল রহস্য একথা বিদ্যাসাগর জানতেন।

বিদ্যাসাগর দীর্ঘ, জটিল, মিশ্র ও যৌগিক বাক্যকে ভেঙে প্রায়ই সরল বাক্যে পরিণত করেছেন, কোথাওবা সরল বাক্যগুলিকে সংযোজক অব্যয় সহযোগে সন্নিবেশ করেছেন—আবার প্রয়োজনে অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা একাধিক বাক্যকে এক সরস ভাবমণ্ডলের মধ্যে এনেছেন। অনুবাদের ভাষাকে সংহত রূপ দেবার জন্য বিদ্যাসাগর অনেক সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করেছেন।

বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' (১৮৬১) শ্রেষ্ঠ বাংলা ক্লাসিক গ্রন্থরূপে উনিশ শতকের বাঙালি-জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর সাহিত্যগুণ বাদ দিলেও, এ ভাষার পদবিন্যাস, বাক্যপ্রকরণ, শব্দসম্ভার, সমাস-সন্ধি-অলঙ্কারের পরিমিত প্রয়োগ প্রভৃতি আয়ত্ত করতে গেলে এ গ্রন্থের ভাষাশিক্ষাগত উপযোগিতা বিশেষভাবে স্বীকার করতে হবে। 'সীতার বনবাস'-এর ভাষা একটু গুরুভার ও সমাসবদ্ধ, জটিল বাক্যের সংখ্যাও বেশি।

গদ্যে ছন্দের দোলন এবং ভাবযতি অব্যাহত রেখে তালে তালে ধ্বনিস্পন্দন সৃষ্টি বিদ্যাসাগরের নিজস্ব স্টাইল। কাজের ভাষা গদ্যেরও যে ছন্দ-তাল আছে, তা তিনিই প্রথম ধরেছিলেন এবং 'কমা' বিরতিচিহ্নের বহুল ব্যবহারে ধ্বনি-সামঞ্জস্য ও অর্থযুক্ত পদান্বয়পদ্ধতি বাঙালির কানে ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

The Comedy of Errors নাটকখানিকে তিনি এমন নিপুণভাবে আত্মস্থ করেছিলেন যে, মূল কমেডির হাস্যতরঙ্গ লঘু ধরনটি 'ভ্রান্তিবিলাস'-এ তাঁর হাতে চমৎকার ফুটেছে; বরং 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস', বিশেষতঃ 'সীতার বনবাস'-এর ভাষা একটু গুরুভার, সমাস-সন্ধির বাহুল্য বাক্‌রীতিকে কছু ক্ষতিগ্রস্থ করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর বর্ণনারীতি হালকা ধরনের হওয়াতে ভাষায় সরসতা সঞ্চারিত হয়েছে। কথার মারপ্যাচ বা হেঁয়ালিকেও তিনি অনেকটা সরল ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন।

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে (১৭৭১ শকাব্দ) কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য মনীষীর জীবনকথা অবলম্বনে বিদ্যাসাগরের 'জীবনচরিত' প্রকাশিত হয়। 'জীবনচরিত'-এর চরিত্রগুলি সাধারণ ছাত্রের কাছে কিছু নীরস। বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গেও যে যুগের অধিকাংশ পাঠকের কিছুমাত্র যোগ ছিল না। এই জন্য 'জীবনচরত'এর ভাষা ঈষৎ গুরুভার বলে মনে হয়।

য়ুরোপীয় সাহিত্যে ঈশপের গল্পের মতোই 'কথামালা' বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক গ্রন্থরূপে পরিগণিত হয়েছে। ছাত্রপাঠ্য এবং মূলতঃ অনুবাদমূলক হলেও এর ভাষারীতি অতি পরিচ্ছন্ন, সংযত এবং সরস। গ্রন্থটিকে কোথাও অনুবাদ বলে মনে হয় না।

বিধবাবিবাহ এবং বহুবিবাহ নিয়ে বিদ্যাসাগরের মোট চারটি বইয়ের প্রতিবাদে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বহু বই প্রকাশিত হয়েছিল। দুটি বিষয়ের প্রথম দুটি বইয়ের প্রতিবাদে যেসব বই বেরিয়েছিল, বিদ্যাসাগর তাঁদের মত খণ্ডন করেছেন পরের দুটি ভাগে। প্রথম দুটির মতো শেষের দুটি ভাগও বেরিয়েছে স্বনামে। কিন্তু স্বনামে যা বলতে পারেননি, ক্রোধের উদ্‌গীরণ ঘটাতে এবার বেনামীতে কলম ধরলেন। 'অতি অল্প হইল' এবং 'আবার অতি অল্প হইল' বহুবিবাহ বিষয়ক প্রত্যুত্তরের প্রতিবাদ, বলা যেতে পারে এ-দুটি তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে তুলোধোনা করে লেখা। বিধবাবিবাহের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর ব্রজবিলাস, বিনয়পত্রিকা, রত্নপরীক্ষা।

বিদ্যাসাগর-জীবনীকার বিহারীলাল সরকার এই বইগুলিকে বিদ্যাসাগর-রচিত বলে মানতে রাজি হননি। ব্রজবিলাস ও রত্নপরীক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় বিজ্ঞ গম্ভীর-চরিত্র লোক এরূপ চপলতা করিবেন, ইহা প্রত্যয় করিতে প্রবৃত্তি হয় না।' *রত্নপরীক্ষা* সম্বন্ধে আরও বলেছেন 'সত্য সত্য যদি ইহা তাঁহার লিখিত হয়, তাহা হইলে, তাঁহার কলঙ্কের কথা বলিতে হইবে।' বিনয়পত্রিকা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন 'ইহাও চপলতাদোষে সম্পূর্ণ কলঙ্কিত।'

স্বীকার করে নিতে হয়, 'অতি অল্প হইল' এবং আবার 'অতি অল্প হইল'তে গলাগলি অপেক্ষা গালাগালির পরিমাণ অধিক হওয়ায় পাঠকের অস্বস্তি থাকেই। কিন্তু ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে চিনে নিতে এই বেনামী রচনাগুলির মূল্য আছে। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, ক্রোধ, রসবোধ, শব্দনির্বাচন, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি শাণিত আক্রমণ—এ সবই মিলেমিশে একাকার। 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) এই বেনামী বইটির রচয়িতা হিসেবে বিদ্যাসাগরকে স্বীকার করতে চাননি বিহারীলাল সরকার—'ভাষাভঙ্গী ভীষণ ভ্রুকুটীময়ী, তাহা সভা সাহিত্যের সম্মানাস্পদ নহে।...এ ভাষার ভাব-ভঙ্গী বিদ্যাসাগরের চরিত্রোচিত নহে।'

বিদ্যাসাগরের 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার' (১৮৭১) গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর তারানাথ তর্কবাচস্পতি সংস্কৃতে তার একটি উত্তর দিয়েছিলেন। 'অতি অল্প হইল' তারই প্রত্যুত্তর। 'অতি অল্প হইল'তে আক্রমণ আরও ঝাঁঝালো, তীক্ষ্ণ। তাতেই রয়েছে তারানাতের প্রতি আক্রমণ। এখানে তারানাথকে তিনি 'বড় নির্ব্বোধ', 'বেহুদা পণ্ডিত', 'লেখাপড়ায় তত দখল নাই', 'লজ্জা শরম কম বটে' বলে গাল দিতে ইতস্তত করেননি।

'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) পুস্তিকাটি একই বছরে প্রকাশিত। তারানাথ তর্কবাচস্পতির প্রতি আক্রমণের দ্বিতীয় পর্ব। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঝাঁঝ এখানেও অব্যাহত। এখানেও তিনি তারানাথের প্রতি ইষ্টক বর্ষণ করেছেন। প্রতি-আক্রমণের ভাষা—'খুড়র গায়ে মানুষের চামড়া নাই', 'বিদ্যা, বুদ্ধির দৌড় অতি বেয়াড়া', 'বেহুলা পণ্ডিত', 'হতভাগার বেটা' ইত্যাদি ইত্যাদি।

ব্রজবিলাস (১৮৮৪) সম্পর্কে ১২৯১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রবাহ মন্তব্য করে—

> গ্রন্থখানি তীব্র ব্যঙ্গ ও স্থানে স্থানে অনাবশ্যক কটুকথায় কলঙ্কিত। এরূপভাবে উতোর কাটাকাটি গ্রন্থকারের অগৌরবের বিষয়...বর্তমান লেখক যে অসাধারণ পণ্ডিত তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার যুক্তি সর্বত্রই সারবান, ভাষা নির্দোষ ও লিখনভঙ্গী সুপক্ক। গ্রন্থ আমূল অসাধারণ রসিকতায় পরিপূরিত।

বিনয়পত্রিকা বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা (১৮৮৪) বইটি বিধবাবিবাহের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর। দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে বইটির নাম হয় *বিনয় পত্রিকা*। নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, কোঁড়কদিনিবাসী রামধন তর্কপঞ্চানন, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং ধর্মসভার সহকারি সভাপতি জনমেজয় ঘটকের যুক্তিসমূহ বিদ্যাসাগর খণ্ডন করেছেন ব্যঙ্গবিদ্রূপসহ। রচনাকাল ১কার্তিক, ১২৯১বঙ্গাব্দ। রচনাকার হিসেবে বিদ্যাসাগরের নাম নেই।

রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬)-র বিজ্ঞাপনই তার গদ্যভাষার প্রমাণ—

> ...এইরূপ বলিয়া, তিনি, নিতান্ত ম্লান বদনে কহিলেন, দেখুন, আমি ব্রজবিলাস লিখিয়া, বিদ্যারত্ন খুড়র মানবলীলা সংবরণের কারণ হইয়াছি। মদীয় বিষময়ী লেখনীর আঘাতেই, তদীয় জীবনযাত্রার সমাপন হইয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। আমাদের সমাজে, গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্য ক্রমে, ব্রজবিলাস লিখিয়া, কোন পাপে লিপ্ত হইয়াছি, বলিতে পারি না। এ অবস্থায়, আর আমার মধুবিলাস লিখিতে সাহস ও প্রবৃত্তি হইতেছে না। মধুবিলাস লিখিলে, হয়ত, আমার পুনরায় ঐরূপ পাপে লিপ্ত হইতে হইবেক। বিশেষতঃ, স্মৃতিরত্নখুড়ী বুড়ী নহেন; তাঁহাকে, ইদানীন্তন প্রচলিত প্রণালী অনুসারে, দীর্ঘ কাল, ব্রহ্মচযাপালন করিতে হইবেক, সেটিও নিতান্ত সহজ ভাবনা নহে। যদি বল, আমরা উদ্যোগী হইয়া পুনঃসংস্কার সম্পন্ন করিব; সে প্রত্যাশাও সুদূরপরাহত। এই সমস্ত কারণ বশতঃ, আর আমার, কোনও মতে, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে, সাহস হইতেছে না। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা। বিদ্যাসাগর যথার্থ অর্থে 'প্রথম গদ্যশিল্পী'। তিনি গদ্যে প্রথম কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেছেন। সমাসের বেড়াজাল থেকে বাংলা ভাষাকে মুক্ত করার কৃতিত্বও তাঁর। আভিধানিক শব্দের বন্ধন থেকে বাংলা গদ্যকে মুক্তি দিয়ে তাতে উপযুক্ত ছেদ-যদি চিহ্নের প্রবর্তন বিদ্যাসাগরের অন্যতম কীর্তি। বাংলা গদ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা, লালিত্য-নমনীয়তা আনয়ন করার প্রচেষ্টা বিদ্যাসাগরকে 'শিল্পী' হিসেবে গণ্য করেছে।

৩.৪ অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র

অক্ষয়কুমার দত্ত

ঈশ্বর গুপ্তের হাত ধরে অক্ষয়কুমার দত্ত এসেছিলেন দেবেন্দ্রনাথের কাছে এবং গুপ্ত কবির প্রস্তাবেই 'তত্ত্ববোধিনী সভা'-র সভ্যপদ গ্রহণ করেন। তিনি কুড়ি বছর বয়সে ৮ টাকা বেতনে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক আর ২ বছর পর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ৩০টাকা বেতনে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হন। পাঠশালার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতায় বলেন—

এই পাঠশালার পরম সৌভাগ্য যে, অক্ষয়কুমারের মত এমন উপযুক্ত ও উৎসাহী শিক্ষক পাওয়া গিয়াছে। তিনি 'আত্মচরিত'-এ বলেছেন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগের জন্য অনেকের রচনাই পরীক্ষা করেন, "কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম।...আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয়বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম"।

এই দেবেন্দ্রনাথই 'এক-এক দিন অক্ষয়বাবুর রচিত প্রস্তাব সকল তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাহা সংশোধন করিতে করিতে তিনি গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেন।'

অক্ষয়কুমার দত্তই ছিলেন ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’-র লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান। অক্ষয়কুমারকে পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বাংলা গদ্যের ‘প্রথম সুলেখক’ বলে সুকুমার সেন মনে করেছেন। প্রথাগত শিক্ষা তেমন না পেলেও পরবর্তীকালে নিজস্ব ঐকান্তিক ইচ্ছায় পাশ্চাত্য রীতিতে জ্ঞানার্জন করেছেন। সংস্কৃত ভাষায়ও তাঁর দখল ছিল। তাঁর প্রথম প্রকাশিত পাঠ্যগ্রন্থ *ভূগোল* (১৮৪১)। বইটি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রচিত। তাঁর দ্বিতীয় পাঠ্যগ্রন্থ *চারুপাঠ* (১ম-১৮৫২, ২য়- ১৮৫৪, ৩য়-১৮৫৯)। এই বইটি তাঁর সবচেয়ে সমাদৃত। *পদার্থবিদ্যা* (১৮৫৫) তাঁর আর একটি পাঠ্যগ্রন্থ। পাঠ্য-বহির্ভূত গ্রন্থাদির মধ্যে ‘বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার’ (১৮৫২৫৩) জর্জ কুম্বের ‘দ্য কনস্টিটিউশন অব ম্যান’ অবলম্বনে রচিত হলেও এখানে তাঁর নিজস্বতা যথেষ্ট। বইটি প্রকাশিত হবার পর স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন—

> তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম, এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম; কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর, তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ—আকাশ পাতাল প্রভেদ।

ভারতবর্ষে রেলযাত্রা শুরু হবার পর এদেশবাসীর কাছে তা ছিল রীতিমতো কৌতুহলোদ্দীপক এবং অভিনব। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার খুবই ক্ষুদ্রাকৃতি একটি বই লিখেছিলেন ‘বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ’ (১৮৫৫) নামে।

অক্ষয়কুমার দত্তের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ (১ম ১৮৭৬, ২য় ১৮৮৩)। নিদারুণ রোগকষ্টের মধ্যে অক্ষয়কুমার এই মহা মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। দুটি গ্রন্থেই বিশাল উপক্রমণিকা। প্রথম ভাগে ইন্দো-ইউরোপীয়. ইন্দো-ইরাণীয়, বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এই প্রথম কোনও ভারতীয়ের ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা দেখা গেল। দ্বিতীয় ভাগে বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম ও দর্শনের আলোচনা রয়েছে। হোরেস হেম্যান উইলসন রচিত ‘এসে অ্যান্ড লেকচারস্ অন দ্য রিলিজিয়ন অব দ্য হিন্দুস্’ অবলম্বনে অক্ষয়কুমার বইটি লিখেছিলেন। ওই বইয়ের কয়েকটি প্রস্তাব তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন প্রকাশ করেছিলেন। উইলসনের গ্রন্থে ৪৫টি সম্প্রদায়ের বর্ণনা ছিল। অক্ষয়কুমারের গ্রন্থে আছে ১৮২টি সম্প্রদায়ের বর্ণনা। এছাড়া উইলসনের গ্রন্থের অনেক অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটি অক্ষয়কুমারের গ্রন্থে সংশোধিত হয়েছিল। এই বইটি সম্বন্ধে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন ‘বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায় বাঙ্গালী মনীষীর প্রথম উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠ কৃতি’।

অক্ষয়কুমারের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল একটি চোট বই ‘প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার’ (১৯০১)। পাশ্চাত্য রীতিতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার পথ দেখিয়েছেন

অক্ষয়কুমার দত্ত। সাহিত্যের রসসৃষ্টিতে তাঁর আগ্রহ ছিল না। বিষয়ানুগ গদ্যে তাঁর রচনা ছিল 'প্রকাশক্ষম, বাহুল্যবর্জ্জিত, ব্যবহারোপযোগী এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট। এই কারণেই, অক্ষয়কুমারের রচনারীতি তৎসমশব্দবহুল।'

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

১৮২৭-এ চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনিশ শতকে হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র রাজনারায়ণ বসু এবং মধুসূদন দত্তের সহপাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায়। হিন্দু কলেজের আগে তিনি কিছুদিন পড়েছেন সংস্কৃত কলেজে। হিন্দু কলেজের পাঠ শেষ করে তিনি ১৮৪৬-এ হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হয়ে যোগ দেন। দু'বছর পর প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন কলকাতা মাদ্রাসায়। ১৮৫৬-তে হুগলির নর্মাল স্কুলের প্রধান। ১৮৬২-তে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্, ১৮৮২-তে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সস্ট্রাকটর-এর পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৮৭৭-এ পেয়েছেন সি আই ই সম্মান। মতামতের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী। সরকারি পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন, কিছু পাঠ্যপুস্তকও লিখেছেন।

শুধু তাঁর পড়াশুনা বা চাকরির কথাতেই শিক্ষার কথা শেষ হচ্ছে না। সম্পাদনা করেছেন 'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার' এবং 'এডুকেশন গেজেট' নামে দুটি শিক্ষাবিষয়ক বিখ্যাত পত্রিকা। আদ্যন্ত শিক্ষক এবং শিক্ষানুরাগী ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতের জীবনাদর্শের সঙ্গে নবীন ইউরোপীয় জীবনবাদের এক সমন্বয়সাধন করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে পাশচাত্যের জ্ঞানবাদ এবং প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদ—এ দুয়ের সম্মিলন দেখা গেছে। সেদিক থেকে তাঁকে উনিশ শতকের যথার্থ যুগনায়ক বলা যেতে পারে।

অন্যদিকে তিনি ব্যক্তি-সমাজ ও পরিবার এই দু'দিকের মিলনসাধন করেছেন বাস্তবমুখী দৃষ্টি নিয়ে। তাঁর চেতনাটি সবসময়ই সামাজিক কল্যাণবোধের দ্বারা চালিত হয়েছে। ফলে তিনি খুঁজেছেন ব্যক্তির সঙ্গে পরিবার ও সমাজের যোগ কীভাবে শুভ হতে পারে, কল্যাণকর হতে পারে।

শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে দীর্ঘদিন নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকে ভূদেব বাংলাদেশের শিক্ষাদানের ভুলত্রুটি ভালোভাবে বুঝেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন উপযুক্ত পাঠ্যবই না থাকায় প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাব্যবস্থায় এক বড় গলদ রয়ে গেছে। এ কারণে তিনি পাঠ্যপুস্তক শ্রেণির কয়েকটি বই লিখেছিলেন।

তাঁর পাঠ্যপুস্তকগুলি—১. 'শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব' (১৮৫৬), ২. 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' (১৮৫৮-৫৯), ৩. 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' (১৮৬২), ৪. 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' (১৮৬২), ৫. 'গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস' (১৮৬২), ৬. 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ৩য় ভাগ (১৮৬৬)। শেষের বইটির ১ম ভাগ লিখেছিলেন রামগতি ন্যায়রত্ন, ২য় ভাগ বিদ্যাসাগর। ৩য় ভাগের ইতিহাস ভূদেব 'শিক্ষাদর্পণ' পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। ১২৭২-এর অগ্রহায়ণ মাস (১৮৬৫) থেকে। এর কিছুটা প্রকাশিত হয়েছিল 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায়। স্কুলপাঠ্য হলেও এই বইগুলিতে তাঁর যত্ন, সতর্কতা, কর্তব্যবোধের প্রমাণ আছে।

ভূদেবের ইতিহাসপ্রেমের পরিচয় আছে দুটি বইয়ে। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫১) এবং 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৭৫)। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বইয়ে দুটি আখ্যান আছে। একটি 'সফল স্বপ্ন' অপরটি 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। প্রথমটি খুবই ছোট। ভূমিকায় ভূদেব বলেছেন 'গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইহাতে দুইটি স্বতন্ত্র উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে।...উভয় উপন্যাসেই রাজা সম্বন্ধীয় যে সকল কথা আছে, তাহা প্রকৃত ইতিহাসমূলক।' প্রথম কাহিনিতে মৌলিকতা নেই। বরং একে স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদ বলা যেতে পারে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' কাহিনির জন্যই ভূদেবকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক বলা হয়ে থাকে। মূল ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রেখেই তনি কাহিনি বয়নে সচেষ্ট হয়েছেন। 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' বইটি ভূদেবের কল্পনানির্ভর কাহিনি। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে যদি মারাঠারা জয়লাভ করত, তবে ভারতবর্ষের ইতিহাস কেমন হত, তারই একটি কল্পনানিভর ছবি এখানে আঁকা হয়েছে। সংস্কৃত-ঘেঁষা ভাষা হলেও সুকুমার সেন একে 'সহজ এবং সুললিত' বলেছেন। 'ভাষার স্বচ্ছতা' এবং 'বিষয়ের অভিনবত্ব' থাকলেও বইটি সমাদৃত হয়নি। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫১) এবং 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' বই দুটিতে তাঁর রসবোধ শিল্পরূপ এবং ঐতিহাসিক চেতনার যথার্থ সম্মিলন ঘটেছে।

পুরাণ নিয়েও তাঁর আগ্রহের পরিচয় আছে দুটি বইয়ে। 'ঊনবিংশ পুরাণ' (১৮৬৯) এবং 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৭৬)। 'ঊনবিংশ পুরাণ' গ্রন্থে ভূদেবের 'কবিত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক দৃষ্টি এবং যোগীজনসুলভ ভবিষ্যৎদৃষ্টি সুপ্রকাশিত।' এই বইয়ের কয়েক বছর পর প্রকাশিত হয় 'পুষ্পাঞ্জলি'। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন— 'প্রায় বিংশতিবর্ষ অতীত হইল আমি ইংরেজিরীতির অনুকরণে একটি আখ্যায়িকা বাঙ্গালাভাষায় লিখিয়াছিলাম। সেই সময় হইতেই ইচ্ছা ছিল যে দেশীয় প্রাচীন রীতি অবলম্বন করিয়া আর একখানি পুস্তক লিখিব। কিন্তু ইংরাজি নবেলের উপাদান এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকার উপাদান স্বতন্ত্ররূপ।...তবে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, ইহা অলৌকিক ব্যাপার সংশ্লিষ্ট একটি অদ্ভুত বর্ণনা মাত্র নহে।' প্রকৃতপক্ষে 'পুষ্পাঞ্জলি'তে অলৌকিক কিছু নেই। পুরাণ যে অর্থে জাতির ইতিবৃত্ত, পুষ্পাঞ্জলি ততোধিক ব্যাপক ও বাস্তব অর্থে ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত। 'পুষ্পাঞ্জলি' ভূদেবের মাতৃস্তোত্র। এই দুটি বইয়ে পুরাণকথার আকারে ভূদেবের স্বদেশচিন্তা পরিস্ফুট হয়েছে।

ভূদেব মূলত গদ্যকার, প্রাবন্ধিক। বাংলা প্রবন্ধ রচনায় ভূদেবের স্বদেশচিন্তা, রক্ষণশীলতা কয়েকটি গ্রন্থে প্রকাশিত। 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৭৬, ১৮৮৫), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১৮৮২-৮৩), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৮৭-৮৯), 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯০-৯৩)—বইগুলির জন্য ভূদেব বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে আজও পরিচিত হয়ে আছেন। 'পারিবারক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ' এই তিনটি বইয়ে ভূদেবের সমাজ-দার্শনিক মননের পরিচয় আছে। 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ' এই তিনটি বইয়ে ভূদেবের সমাজ-দার্শনিক মননের পরিচয় আছে। সামাজিক প্রয়োজনে ব্যক্তি পরিবার

ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পরিবার ও সমাজের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্য ও আচরণের সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। সমাজ ও পরিবারের দিকে তাকিয়ে লেখা বলে এই বইগুলির মধ্যে শিল্পরস আশা করা যায় না।

'পারিবারিক প্রবন্ধ'র অধিকাংশ রচনা 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রচনাকাল ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ। তিনটি পর্যায়ে প্রবন্ধগুলি বিভক্ত। তিনটি পর্যায়ে মোট ৩৯টি প্রবন্ধ 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম পর্যায়ে প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করার সময় ভূদেব নিজেই এডুকেশন গেজেটে লিখেছিলেন—'পাঠকবর্গ দেখিবেন প্রবন্ধগুলি একজন গৃহস্থ ব্যক্তির পারিবারিক অভিজ্ঞতাজনিত প্রকৃত মনোভাবের পরিচায়ক।' স্বধর্মনিষ্ঠ বাঙালি ব্রাহ্মণ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিগত জীবনে যে একনিষ্ঠ শাস্ত্রানুমোদিত জীবনচর্যায় অভ্যস্ত ছিলেন, 'পারিবারিক প্রবন্ধ' তার দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনি বাল্যবিবাহের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তবে পারিবারিক জীবনে একান্ত রক্ষণশীল হলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে তিনি মুক্তমনেরও পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মহু মতামত বর্তমান দিনে পরিত্যক্ত। 'পারিবারিক প্রবন্ধ'-র সাহিত্যিক মূল্য ভাষার সহজতায়, বক্তব্য-উপযোগী প্রাঞ্জলতায়। কিছু কিছু স্থানে রসসৃষ্টির প্রয়াসও লক্ষণীয়।

'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম ভাগ তিনটি প্রবন্ধের সংকলন। তিনটি প্রবন্ধই 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। সাহিত্যরসিক ভূদেবের পরিচয় এই গ্রন্থে লভ্য। সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় সাহিত্যে তাঁর গভীর দখল থাকায় তাঁর নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছিল। সেই দৃষ্টিভঙ্গি সামঞ্জস্যবোধ-নিয়ন্ত্রিত। 'উত্তরচরিত', 'রত্নাবলী' ও 'মৃচ্ছকটিক'—ভারতীয় সাহিত্যের এই তিন বিখ্যাত সৃষ্টিকে ঘিরে তিনটি প্রবন্ধ। সাহিত্যিক ভূদেবের পরিচয় প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া যাবে। বইটিতে ভূদেবের সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের ধারাবাহিক বিবর্তনের নিপুণ ও বিশ্লেষণমূলক ছবি আছে।

'সামাজিক প্রবন্ধ' প্রথম প্রকাশিত হয় এডুকেশন গেজেট পত্রিকায়। প্রবন্ধগুলি রচিত হয় ১৮৮৭ থেকে ১৮৮৯ সালে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। ভূমিকায় তিনি বলেছেন—"একখানি সর্ব্বদেশ-সাধারণ সমাজতত্ত্ব গ্রন্থ প্রণয়ন উদ্দেশে, অথবা রাজনৈতিক কোন প্রকার আন্দোলনের সহকারিতা করিবার নিমিত্তে, এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হয় নাই।... ইংরাজ-রাজ প্রদত্ত...বিদ্যাবিস্তারের উপাদান, এবং এই অভূতপূর্ব্ব শান্তিসুখের অবসরপ্রাপ্ত হইয়া এখন আমাদের প্রকৃত অবস্থা কি তাহা বুঝিয়া আমাদের নিজেদের কর্ত্তব্য অসাধারণ করা একান্ত আবশ্যক। এই পুস্তকের দ্বারা সেই কর্ত্তব্য অবধারণ কার্য্যের কোনরূপ সাহায্য হইলেই উদ্দেশ্যসিদ্ধ জ্ঞান করিব।" একদিকে ইংরেজিয়ানার অন্ধ অনুকরণ, অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দুদের গোঁড়াম—এ দুয়ের মধ্যে ভূদেব সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেছেন। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে তিনি প্রকৃত ভারতীয়ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থে এটিই সারকথা।

'আচার প্রবন্ধ'-র রচনাকাল ১৮৯০ থেকে ১৮৯৩ পর্যন্ত এডুকেশন গেজেট পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৯৫-এ। উসর্গপত্রে লেখক বলেছেন—'...তোমাদের ন্যায় স্বদেশীয় যুবক ও বালকবৃন্দের

আচার শিক্ষার আনুকূল্যে এবং স্বজাতীয় পরমপবিত্র শাস্ত্রের মহত্ত্ব উপলব্ধির সাহায্যে এই আচার প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছি।' শাস্ত্রচর্চা এবং সদাচার পালনকে তিনি পরমধন বলে বিশ্বাস করেছেন, তাকে অবিকৃতরূপে রক্ষা করতেও চেয়েছেন। প্রাচীন আর্যসমাজের শাস্ত্রীয় আচারবিধিকে তিনি পরমধন বলে বিশ্বাস করেছেন, তাকে অবিকৃতরূপে রক্ষা করতেও চেয়েছেন। প্রাচীন আর্যসমাজের শাস্ত্রীয় আচারবিধিকে তিনি সযৌক্তিক সমর্থন জানিয়েছেন। এই গ্রন্থের ভাষাও সহজ এবং প্রাঞ্জল। বক্তব্য স্বচ্ছ। উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে লেখা এই বইটি ভূদেবের পরিণত মেধা ও বুদ্ধির প্রকাশ।

প্যারীচাঁদ মিত্র

হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলা গদ্যে চলিত ভাষার ছাঁদে এক নতুন রীতির সূচনা করেন। ১৮৫৪-র ১৬ আগস্ট প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'মাসিক পত্র'। ওই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় লেখা হল—

> এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।

সেকালে যে এই নীতি অসমসাহসিকতার পরিচয়, তা আর বলার অপেক্ষা করে না। কথ্যভাষার রীতিতে বাক্যরচনা, তদ্ভব-ফারসি শব্দের বিপুল প্রয়োগ পত্রিকাটর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। এই পত্রিকার সপ্তম সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরে দুলাল' (১৮৫৮)। অনেক গবেষক এই রচনাটিকেই 'প্রথম উপন্যাস' বলে মনে করেন। সুকুমার সেন মনে করেন, বিলিতি আদর্শে নভেল বা উপন্যাসের সূচনা এই বই থেকেই হয়েছিল। এই 'উপন্যাসে' কোনও প্রেমের চরিত্র নেই। তবে উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন প্যারীচাঁদ। এই কারণে তাঁর রচনায় বিচিত্র সমন্বয় লক্ষ করা যায়। তাঁর গদ্যে এই পরীক্ষা করার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই বইয়ের কাহিনি কিছুটা বিক্ষিপ্ত, মূল সুর মৃদু হাস্যরস পরিপূর্ণ। এছাড়া অধিকাংশ চরিত্রই অপরিস্ফুট, নায়কের ব্যক্তিত্বও অস্বচ্ছ।

কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র ঠকচাচা। এই চরিত্রের ওপর আখ্যায়িকার আবর্তন নির্ভর করেছে। ঠকচাচা চরিত্রটিকে প্যারীচাঁদ পাষণ্ড রূপে চিত্রিত করলেও সে নিতান্ত অমানুষ নয়। সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন 'ঠকচাচা কবিকঙ্কণের ভাঁড়ুদত্তের মতো উজ্জ্বল, জীবন্ত চরিত্র।' সর্বসাধারণের বোধগম্য সরস সাধারণ ভাষাই আলালীয় ভাষার প্রধান গুণ। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য চলিত ভাষার ধাতুর ব্যবহার, তদ্ভব ও দেশি শব্দের প্রচুর প্রয়োগ, ফারসি শব্দ, কথ্যভাষার ইডিয়ম ও প্রবাদবাক্যের ব্যবহার। ড. সেন একে 'মিশ্র সাধুভাষা' বলেছেন।

প্যারীচাঁদের পরের বই মদ খাওয়া বড় দায়, *জাত থাকার কি উপায়* (১৮৫৯)। আকারে ছোট এই

বইয়ে গোঁড়া হিন্দুসমাজের মদ্যপ, জাত্যাভিমানী পাষণ্ডদের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রচনারীতি পূর্ব্ববৎ সরল ও সরস। সাধুভাষাও অনেক উন্নততর। প্যারীচাঁদের পরবর্তী মুদ্রিত বই *রামারঞ্জিকা* (১৮৬০)। এটি মহিলাদের জন্য রচিত। দেশ বিদেশের অনেক মহিমামণ্ডিত নারীর চরিত্র এখানে বর্ণিত। রচনারীতি বিশুদ্ধ সাধুভাষাসম্মত। *যৎকিঞ্চিৎ* (১৮৬৫) গ্রন্থে একটা ক্ষীণ গল্পসূত্র আছে ঠিকই, তবে এটি মূলত আধ্যাত্মিক বিষয়াভিত্তিক বই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ, আত্মার অবনাশত্ব, পরলোক, ঈশ্বরের রাজ্যের নিয়ম, উপাসনা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক বিষয় আলোচিত হয়েছে। গুরুগম্ভীর বিষয় সত্ত্বেও ক্বচিৎ সরসতার স্পর্শ আছে।

পরবর্তী গ্রন্থ *অভেদী* (১৮৭১)। এটি রূপক কাহিনি। গল্পের কাঠামোতে অনেকগুলি প্রাসঙ্গিক চিত্র আছে, যেগুলি কাহিনির আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে।

'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা' (১৮৭৮) একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। সেকালে ভারতবর্ষে নারীদের শিক্ষা ও মহত্ত্বের পরিচয়দান উপলক্ষে বেশ কিছু পৌরাণিক নারীচরিত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। *আধ্যাত্মিকা* (১৮৮০) রূপক ও আধ্যাত্মিকতায় মেশামেশি। বাস্তবচিত্র বেশ কয়েকটি আছে। সেগুলি প্রায় কথ্যভাষার স্টাইলেই রচিত। প্যারীচাঁদের শেষ বই *বামাতোষিণী* (১৮৮১) নারীশিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত।

৩.৫ কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০)

উনিশ শতকের বাঙালি ধনী তরুণ কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যাচর্চা ও সংস্কৃতিচর্চায় নিবিড়ভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন। সমসাময়িক উজ্জ্বল নক্ষত্র সকলের সঙ্গেই তাঁর সখ্য এবং সুসম্পর্ক ছিল।

কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রাচীন ও আধুনিক দুই যুগের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *বাবু নাটক* (১৮৫৪), *বিক্রমোর্বশী* (১৮৫৭), *সাবিত্রী সত্যবান* (১৮৫৮), *মালতীমাধব* (১৮৫৯), *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (১৮৬২)। প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের সহযোগিতায় মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করা তাঁর অন্যতম প্রধান কীর্তি। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত মহাভারতের নাম ছিল পুরাণ সংগ্রহ। কালীপ্রসন্ন চারটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। *বিদ্যোৎসাহী পত্রিকা* (১৮৫৫), *সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশিকা* (১৮৫৬), *বিবিধার্থ সংগ্রহ* (১৮৬১), *পরিদর্শক* (১৮৬১)।

কলকাতার মানুষ, তাদের ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতকে তিনি অনুধাবন করেছেন গভীরভাবে। এই সংস্কৃতির কিছু যে তাঁর মনোমত ছিল, এমন নয়। লেখনীর মাধ্যমে তা প্রকাশ পেল *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (১৮৬২)য় রঙ্গব্যঙ্গের ছুরিকাঘাতে। কলকাতার সামাজিক নানা উৎসবের বর্ণনায় কলকাতার 'বাবু' সম্প্রদায়ের অনাচার

প্রদর্শনই কালীপ্রসন্নের উদ্দেশ্য ছিল; এই বইয়ে খাঁটি কলকাতার উপভাষার ছাপ সুস্পষ্ট। 'এই কথ্যভাষার প্রধান গুণ সরসতা, লঘুতা এবং অদম্য প্রাণশক্তি।'

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য এই ভাষার প্রশংসা করতে পারেননি। তিনি বলেছেন, 'হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর, এবং যেখানে অশ্লীল নয় সেখানে পবিত্রতাশূন্য।' (*বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫*) প্রমথনাথ বিশীর মতে হুতোমের ভাষা 'শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়, আর তা অত্যন্ত দ্রুত। এভাষা যেন শব্দের ভিড়।...লেখক ছুটছেন, ভাষা ছুটছে, বর্ণনীয় বিষয় একটা আর একটার ঘাড়ে হুড়মুড় করে এসে পড়ছে, ঘনায়মান আকাশের নীচে ভাষার সঙ্গে পাঠক ছুটছে—।'

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছেন ১৯৩৮-এর ২৬ জুন। পড়াশুনা করেছেন হুগলি মহসিন কলেজ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ব্যাচের বি.এ। চাকরি করেছেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টরের পদে। আইন পাশ করেছেন ১৮৬৯-এ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় সাহিত্য রচনার হাতেখড়ি, তা-ও কবিতায়। তিনি ঈশ্বর গুপ্তকে গুরুপদে বরণও করে নিয়েছিলেন। সেই প্রভাবেরই ফল 'ললিতা ও মানস' (১৮৫৬) গ্রন্থটি। কিন্তু সেটি তাঁর স্বক্ষেত্র ছিল না। তাই গদ্যে দেখা দিলেন ১৮৬৫তে।

কয়েক বছর কাটল, এল ১৮৭২। প্রকাশিত হল বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' সাময়িকপত্র। ততদিনে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হয়ে পাঠকমহলে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের পাঠকের জন্য আরও চমক অপেক্ষা করছিল। 'বঙ্গদর্শন' সেই হীরকদ্যুতি। বঙ্কিমচন্দ্র পত্রিকার সূচনায় এই আশা প্রকাশ করেছেন 'ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক।' 'বঙ্গদর্শন' পরবর্তী চার বছর এই কথার সত্যতা প্রমাণ করেছে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিক বেরোতে লাগল 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস। কিন্তু কেবল উপন্যাস নয়, বঙ্গদর্শন এর পৃষ্ঠা ভরে উঠতে লাগল নানা রুচির নানা স্বাদের প্রবন্ধে। বিষয়বৈচিত্র্যে তা হয়ে উঠল অভিনব। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সঙ্গীত, সাহিত্য-সমালোচনা, ব্যঙ্গকৌতুক কিছুই বাদ গেল না।

প্রথমে দেখে নিই প্রবন্ধ বলতে আমরা কী বুঝি। 'প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত' সাহিত্যকে আমরা প্রবন্ধ বলি। প্রবন্ধের দুটি প্রকার। বস্তুগত ও বিষয়গত। বস্তুগত প্রবন্ধকে আমরা তিনট ভাগে দেখতে পারি। নিবন্ধ, বিতর্কমূলক ও গবেষণামূলক। আর বিষয়গত প্রবন্ধের দুটি ভাগ। ব্যক্তিগত ও রম্যরচনা। একসময়ে সাময়িকপত্রের তাগিদে তথ্যনষ্ঠ জ্ঞানগর্ভ বা ভাবগর্ভ লেখাই মডেল হয়ে উঠেছিল। তবে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে রসের পরিণতি থেকে সিদ্ধান্তের পরিণতিই মুখ্য স্থান নিয়েছে। তথ্যপ্রকরণের যথাযথ সমাবেশ, ভাবে-ভাষায়-চিন্তার অনন্যতায় প্রতিপাদ্যকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়।

বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটা দূরত্ববোধ থাকেই। কিন্তু ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধে উভয়ের মধ্যে যেন একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেখানে তথ্যের ভার, তত্ত্বের জাল থাকে না। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখকের বিচারবুদ্ধি ও চিন্তা মুখ্য। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে লেখকের অনুভূতি সরসতা পায়। সেখানে তিনি আর পাঠক এক এবং অভিন্ন। আত্মনিবেদনের ভঙ্গিতে লেখক ও পাঠক মিশে যান।

বিষয়গত ও বস্তুগত এই দু'ভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলিকে ভাগ করলে প্রথমভাগে থাকবে 'লোকরহস্য' (১৮৭৪) 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'। দ্বিতীয়ভাগে থাকবে 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫), 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬), 'সাম্য' (১৮৭৯), 'প্রবন্ধ পুস্তক' (১৮৭৯), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১৮৮৭, ১৮৯২), 'ধর্ম্মতত্ত্ব' (১৮৮৮) ইত্যাদি।

লোকরহস্য গ্রন্থে সমাজ, শিক্ষাদীক্ষা, চারিত্রনীতির অসঙ্গতি, কৌতুকরসের মধ্য দিয়ে ফুটেছে। বইটি সমালোচক মহলে বিশেষ আলোচিত নয়। আবার কারও কারও মতে এটি বঙ্কিমের 'অক্ষয় কীর্তি'। এই বইয়েরই একটি প্রবন্ধ 'বাবু'। বিজ্ঞানের কথা পরিচ্ছন্ন ও সাহিত্যগুণান্বিত হয়ে উঠেছে *বিজ্ঞানরহস্য* গ্রন্থে। বঙ্কিমচন্দ্র *বঙ্গদর্শন*-এর পাতায় বিজ্ঞানের নব আবিষ্কৃত জটিল তত্ত্বকথা সহজ সরল ও সরস করে প্রকাশ করতেন। সেই লেখাগুলিই এখানে স্থান পেয়েছে।

কমলাকান্তের দপ্তরকে পুরো প্রবন্ধ বা রচনাসাহিত্য বলে বিশেষ অভিধায় ফেলা যায় না। বৃদ্ধ কমলাকান্তের আড়ালে থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ-মানুষ-দেশের নানা অসঙ্গতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপের রূপকে তুলে ধরেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব সুন্দরভাবে বলেছেন 'বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত...একটা ধুমকেতুর মতো, তাই থেকে আসে এবং চলে যায় পৃথিবীর গায়ে আলোর ঝাঁটা বুলিয়ে দিয়ে।'

বিবিধ প্রবন্ধ তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। এই বইয়ে বঙ্কিম-ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। বিবিধ প্রবন্ধেই তাঁর বহু উপন্যাসের বীজ রয়ে গেছে। সংকলিত প্রবন্ধগুলিতে উনিশ শতকের শেষাংশের বাঙালি মানসিকতার পরিচয়ও বহন করে। বিবিধ প্রবন্ধে সমালোচক বঙ্কিমের এক সামঞ্জস্যবোধেরও পরিচয় আছে। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। তার পাশাপাশি দ্বিধাবিভক্ত বাঙালি মানসের সমন্বয়সাধনও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। বলা যেতে পারে তিনি আবেগপ্রবণ বাঙালির সঙ্গে যুক্তিপ্রবণ ইউরোপীয়দের মিলন ঘটিয়েছিলেন। একই সঙ্গে একথাও স্বীকার করে নিতে হবে যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকীয় দ্বিধাকে অতিক্রমও করতে পারেননি।

সাম্য প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। যদিও পরিবর্তিত মানসিকতায় তিনি প্রবন্ধটির প্রচার বন্ধ করেছিলেন। তিনি নিজে বলেছেন 'সাম্যটা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না।' এই প্রবন্ধে প্রমাণিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি খুব ভালোই অবহিত ছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি অর্থনৈতিক দিক থেকে মানবসভ্যতার বিচার করেছেন। তার পরিণতিতে সমাজব্যবস্থার আমূল সংস্কারেরও প্রস্তাব করেছিলেন।

তাঁর আর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ *কৃষ্ণচরিত্র* (১৮৮৬) ভক্তিবাদী ভাবনার দ্বারা কৃষ্ণ-অনুধ্যানে অভ্যস্ত ভারতীয় চেতনাকে প্রায় পুরোপুরি বর্জন করে বৃহৎ মানবতার আদর্শে কৃষ্ণচরিত্রকে স্থাপন করেছেন। ইউরোপের নব্যমানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে অনৈসর্গিকতা এবং অলৌকিকতাকে গুরুত্ব দেননি। মহাভারতের ঐতিহাসিকতার প্রমাণসহ তিনি দেখিয়েছেন, মহাভারত কল্পনামূলক কাব্য নয়, অনেকটাই প্রামাণিক ইতিহাস। এই প্রবন্ধে ভাষাভঙ্গি কথ্যরীতি অনুসারী। প্রকাশভঙ্গিতে এমনই অনায়াসস্বাচ্ছন্দ্য ও লঘুতা আছে যে মনে হয় কথ্যভাষাই চলমান। এটাই বঙ্কিমের প্রধান গুণ, এটিই তাঁর স্টাইল, যার উৎস লেখকের সরস মনীষা।

১৮৮৮-তে প্রকাশিত হয় *ধম্মতত্ত্ব প্রবন্ধ*। ফরাসি দার্শনিক কান্ট-এর মতমাদে খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বের স্থানে মানুষকে, স্বর্গের স্থানে মর্ত্যকে এবং পরকালের বদলে ইহলোকের কথা প্রচার করা হয়েছে। কান্ট-অনুরাগী বঙ্কিমচন্দ্রও দেখিয়েছিলেন, মানবপ্রবৃত্তির সমূল উৎপাটন জীবধর্মের উদ্দেশ্য নয়। প্রবৃত্তির সংযম ও সমন্বয়ই মানুষের ধর্ম। এখানে বঙ্কিমের আরাধ্য দেবতা ভাগবত-পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ নন, মহাভারতের সূত্রধার পার্থসারথি। এই প্রবন্ধে আমরা দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাই।

বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানকে আমরা সংক্ষেপে সূত্রাকার ব্যাখ্যা করতে পারি।

ক) তিনিই প্রথম বাংলা প্রবন্ধকে নিজস্ব মর্যাদায় ভূষিত করেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের জন্মদাতা বঙ্কিমচন্দ্র।

খ) তাঁর হাতে বাংলা প্রবন্ধ নৈর্ব্যক্তিকলোক থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ব্যক্তি-চৈতন্যলোকে উপনীত হয়েছে। লেখকের ব্যক্তিত্বের স্পর্শে বাংলা প্রবন্ধ হয়ে উঠল রঙিন।

গ) ব্যক্তিগত রচনায় বর্তমান সমাজ-সম্বন্ধীয় রচনাকে, যা রবীন্দ্রনাথের মতে 'বাজে রচনা', প্রমথ চৌধুরীর মতে 'খেয়ালীপনা' এবং আধুনিকদের মতে 'রম্যরচনা'—তার প্রথম এবং প্রধান রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র।

ঘ) বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়বৈচিত্র্য অসাধারণ। সাহিত্য ইতিহাস সমাজনীতি ধর্মকথা দর্শন শিল্পতত্ত্ব রাজনীতি থেকে বাংলার কৃষকদের দুরবস্থা, সাহিত্যসমালোচনা সবই আছে।

ঙ) তাঁর রচনায় যুক্তিবাদ এবং রোমান্টিকতার সহাবস্থান ঘটেছে। যুক্তিআশ্রয়ী সিদ্ধান্ত ও মননশীলতা তাঁর প্রবন্ধে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তত্ত্ব ও তথ্য তাঁর প্রবন্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলেও তা কখনই বোঝা হয়ে দাঁড়ায়নি।

চ) বাংলায় প্রথম তুলনামূলক প্রবন্ধ রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্র-পরবর্তীকালে তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনার যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার সূচনা বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই।

ছ) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণধর্মিতা। ইংরেজিতে একে বলা হয় 'ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রসিয়েশন।' প্রতিটি প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত তাঁর নিজস্ব।

'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'বাঙ্গালাভাষা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন:

> রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দয, সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হইবে।'

এই বক্তব্যেই লেখক বঙ্কিমের গদ্যভাষা সম্পর্কে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। 'বঙ্কিমের প্রবন্ধ-গদ্যের লক্ষ্য—

বক্তব্যপ্রধান, নৈর্ব্যক্তিকতা, যুক্তিধর্মিতা, বিশ্লেষণপ্রবণতা। তাই দেখা গিয়েছিল বক্তব্যবিন্যাসকারী নিটোল অনুচ্ছেদ নির্মাণে ঝোঁক, শব্দের ব্যবহারে পরিমিতিবোধ ও নিবাভরণতা, নিশ্চয়াত্মক বাক্যের প্রয়োগ।' 'নৈয়ায়িকের যুক্তিধর্মিতা' প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর গদ্যে ভাবালুতা ও কল্পনার স্থান নেই, বুদ্ধির প্রাধান্য আছে। চিন্তামূলক গদ্যের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র।

আর একটি উদ্ধৃতি দেখে নিই তাঁর 'সাম্য' প্রবন্ধ থেকে।

> তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের দিন শুভ পুণ্যাহ উপস্থিত। পরাণ পুণ্যাহের কিস্তিতে দুই টাকা খাজানা দিয়া থাকে। তাহা ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজনা। শুভ পুণ্যাহের দিনে জমিদারকে কিছু নজর দতে হইবে। তাহাও দিল। হয়ত জমিদারেরা অনেক সরিক, প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ নজর দিতে হয়। তাহার পর নায়েব মহাশয় আছেন—তাহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। পরে গোমস্তা মহাশয়েরা, তাঁহাদিগের ন্যায্য পাওনা—তাঁহারাও পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল,—তাহার কাছে বাকী রহিল। সময়ান্তরে আদায় হইবে।

ছোট ছোট বাক্যে পূর্ণ ক্রিয়াপদের স্বল্পতা চোখে পড়ার মতো। পুরো অংশটুকু কথ্যভাষার ঢঙে রচিত। দেশি বিদেশি শব্দ নির্বাচনে লেখক কার্পণ্য করেননি।

ইতিহাসের ভাষায় বলতে পারি প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের রাজত্বকাল ১৮৭২ থেকে ১৮৯২—মাত্র কুড়ি বছর। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সূচনা থেকে গ্রন্থাকারে 'কৃষ্ণচরিত্র'র প্রকাশ পর্যন্ত এই কুড় বছর প্রাপ্তিকালের মধ্যেই প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের রাজত্বের শিকড় নেমে গেছে বাংলা সাহিত্যের গভীরে। বহুমুখিতার মধ্যেও প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের মননদীপ্ত তীক্ষ্ণ, বিশ্লেষণ, অকৃত্রিম লোকহিতৈষণার উত্তরাধিকার বাংলা সাহিত্য সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করেছে। যে মানব-উজ্জীবনমন্ত্র রামমোহন বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমারের লেখনীতে উচ্চারিত হয়েছে, প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র তারই সার্থক উত্তরসূরী। ধর্ম, বিজ্ঞান, সমাজ, ইতিহাস ও সাহিত্য ইত্যাদি নানা

ধরনের রচনার মধ্য দিয়ে যে জিজ্ঞাসা বারবার প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রকে আলোড়িত করেছে, উদ্বুদ্ধ করেছে, তা হল মানবজিজ্ঞাসা। অন্য সব পরিচয় ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে 'হিউম্যানিস্ট' বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন।...তিনি যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন—বাক্‌চাতুরী দ্বারা আপনাকে বা অন্যকে বঞ্চনা করেন নাই।'

৩.৬ মীর মশাররফ হোসেন

মশাররফের নিজের বাড়িতে সাহিত্যের পরিবেশ ছিল না, ছিল ভোগ বিলাসিতার চূড়ান্ত রূপ। ছোটবেলায় আত্মীয়-স্বজনের মুখে মুখে শুনেছেন 'হাতের তাই', 'সোনাভান', 'আমীর হামজা'-র গল্প। দেখেছেন পল্লীগান বাউলগানের চর্চা। তাঁর বাড়ি লাহিনীপাড়ার খুব কাছাকাছি থাকতেন লালন ফকির। 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র সম্পাদক কুমারখালির কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের সঙ্গে লালন ফকিরের ঘনিষ্ঠতা ছিল। হরিনাথ ছিলেন মশাররফের সাহিত্যগুরু।

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময়ই মশারফ মার্জিত, উন্নত ও সুশৃঙ্খল বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচিত হন। অবশেষে ১৮৬৫-তে মশারফ 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি নিজেই লিখেছেন 'প্রভাকরে এক প্রবন্ধ লিখিলাম। মুসলমানের বিবাহ পদ্ধতি—মনের কথা যাহা মনে উদয় হইল; যেরূপ বিবাহ হইয়া থাকে, তাহার দোষ ধরিয়া যথাসাধ্য লিখিলাম।'

১৮৬৯-র সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয়েছিল 'রত্নবতী'। বইয়ের ভূমিকায় লেখক বলেছেন 'একটি কৌতুকাবহ গল্প অবলম্বন করিয়া ইহার রচনাকার্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে।" বইটির আলোচনা প্রসঙ্গে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' ওই বছর অক্টোবরে মন্তব্য করে,

> ...মুসলমানদিগের রচিত এরূপ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বোধ হয়, পূর্ব্বে আর কাহারও মস্তক হইতে বহির্গত হয় নাই। এই রত্নবতীই প্রথম। ইতিপূর্ব্বে কোন কোন সংবাদ পত্রিকায় সম্পাদক মুসলমানদিগের বাঙ্গালা ভাষা জ্ঞান বিষয়ে আক্ষেপ করেন, মীর মসারফ হোসেন তাহার কতক অভাব (দূর) করিলেন।

'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রিকায় কিছুটা সমালোচনার সুরে বলা হয় 'ইহার রচনা অতি প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু উপন্যাসটিতে বিশেষ চাতুর্য কিছু প্রকাশ পায় নাই।'

মশারফকে বাঙালি মনে রেখেছে 'বিষাদসিন্ধু'র সৃষ্টিকর্তা হিসেবে। এই ইতিহাসমূলক উপন্যাসটি তার সাহিত্যকর্মের শ্রেষ্ঠ রচনাই নয়, তার সমগ্র খ্যাতির মূলেও এই উপন্যাস। তিন পর্বে বিভক্ত (মহরম পর্ব, উদ্ধার পর্ব, এজিদবধ পর্ব) 'বিষাদসিন্ধু'র রচনা কাল ১৮৮৫-১৮৯১।

'বিষাদসিন্ধু' প্রকাশোত্তর কালে মুসলিম সমাজের বেড়া ডিঙিয়ে সমগ্র পাঠক সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পাঠকের প্রতিক্রিয়া সেকালে পত্র-পত্রিকায় ঢেউ তুলেছিল। 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' (১১) জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২) বলেছে ইহার এক একটি স্থান এরূপ করুণরসে পূর্ণ যে পাঠকালে চোখের জল রাখা যায় না।' 'ভারতী' পত্রিকায় (ফাল্গুন, ১২৯৩) বলা হল, ইহার বাঙ্গালা যেমন পরিষ্কার, ঘটনাগুল যেমন পরিস্ফুট, নায়ক নায়িকার চিত্র ইহাতে তেমনি সুন্দর রূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে একজন মুসলমানের এত পরিপাটি বাঙ্গালা রচনা আর দেখয়াছি বলিয়া মনে হয় না।' 'ঢাকা প্রকাশ' (৪ আশ্বিত্রন, ১২৯৩) মন্তব্য করে 'এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে, কেবল মুসলমান নয়, হিন্দুগণেরও বিলক্ষণ প্রীতি জন্মিতে পারে।' 'বসুধা' পত্রিকায় (ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩১৮) অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখলেন 'মহরমের আখ্যানকাব্য বিষাদসিন্ধু কিরূপ প্লাবনীকরুণ রসে টলটল করিতেছে।'

এই উপন্যাসে লেখক সমকালীন জনজীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, বিশেষত স্বাধীনতা লাভের কথা বলেছেন। সমগ্র বিষয়টি তার উপলব্ধিজাত। ১৮৭৫-এ ইন্ডিয়ান লীগ, ১৮৭৬-এ ভারত সভা, ১৮৮৫তে জাতীয় কংগ্রেস—ইত্যাদি বিষয়গুলি মশারফ গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করেছিলেন বলেই মনে হয়। এ কারণে সামাজিক চেতনার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষও তার রচনায় দেখা গেল। মশারফের ব্যক্তি চেতনা এ ক্ষেত্রেও অগ্রবর্তিতার স্বাক্ষর রেখেছে।

১৮৮২তে দয়ানন্দ সরস্বতী 'গো-হত্যা নিবারণী' সভা স্থাপন করেছিলেন। ভারত জুড়ে শুরু হয় বিতর্ক। আর ঠিক সে সময়ই ১৮৮৮ সালে 'আহমদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হল মশাররফের একটি প্রবন্ধ 'গো কুল নিম্মুল আশঙ্কা'। এরপর গ্রন্থাকারে 'গো জীবন' নামে ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। 'উৎসর্গপত্র'-এ লিখলেন 'পঞ্চবিংশতি কোটি ভারত-সন্তান করে গো-জীবন সমর্পণ করিলাম।' আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল।

> আমি মোসলমান—গো জাতির পরম শত্রু। আমি গো মাসে হজম করিতে পারি। পালিয়া, পুষিয়া বড় বলদটির গলায় ছুরি বসাইতে পার, ধমের দোহাই দিয়া দুগ্ধবতী গাভী, দুগ্ধপায়ী গো বসের প্রাণ সংহার করিয়া পোড়া উদর পরপোষণ করিতে পার...। কিন্তু শাস্ত্রে এ কথা লিখা নাই যে, গো-হাড় কামড়াইতেই হইবে, গো মাংস গলাধ করিতেই হইবে, না করলে নরকে পচিতে হইবে।

মশাররফের বিরুদ্ধে প্রচারে নামলেন মুসলিম সমাজের একটি বড়ো অংশ। মতামত প্রকাশিত হতে থাকল পত্র-পত্রিকায়। একদিকে 'আহমদী' অন্যদিকে মৌলবী নইমুদ্দিন সম্পাদিত 'আখবারে ইলামিয়া'। মোট কথা, এই গোজীবন গ্রন্থে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীত রক্ষায় মশাররফের ঐকান্তিক মনোভাব ব্যক্ত হয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি মশাররফ নিবেদন করেছিলেন, 'গো-জীবনের চির অরি, প্রতিবাদকারী মহাত্মাগণ, গো জীবনে সুতক্ষ্ণ (যদেব) ছুরিকা সম লেখন (যদেব) আঘাতে যে প্রকার ক্ষত বিক্ষত করিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিয়া স্ব-স্ব মত প্রকাশ করিলে; পরম প্রীতিলাভ করিব।' উনিশ শতকে যে সময় উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং মুসলমান ধর্ম্মান্ধতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল সে সময় একজন

প্রকৃত মানুষ হিসেবে মশাররফ এই অগ্রবর্তী চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁকে অভিনন্দ না জানিয়ে থাকা যায় না।

'জমিদার দর্পণ' এবং 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় জমিদারদের অত্যাচারের কথা তুলে ধরে তিনি কৃষকের পক্ষ নিয়েছিলেন। 'জমিদার দর্পণ'-এ জমিদার নারীসম্ভোগ উদ্‌গ্রীব। কিন্তু ইতস্তত করে আইনের কারণেই। বলে 'এখন ইংরেজী আইন বিষদাঁত ভাঙা।' আইনের হাত যে কতদূর যেতে পারে সে সম্বন্ধেও তার ধারণা স্পষ্ট। 'কোণের বউ পর্যন্ত আইন আদালতের খবর রাখে। হাইকোর্টের চাপরাসীরাও সকুয়িট আর কমন ল'র মারপ্যাঁচ বোঝে।'

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় প্রজার উক্তি নিজেরা অশক্ত হইলে রাজদ্বার খোলা আছে, তখন রাজার আশ্রয় লইব। দেশের হাকিমের নিকট জানাইব। রক্ষা কর বলিয়া গলবস্ত্রে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইব।' 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৮৯০-এর আগস্ট মাস। ৪২টি অধ্যায় সম্বলিত আত্মজীবনীমূলক এই উপন্যাস সে যুগের নীলকরদের অত্যাচার, নীলবিদ্রোহ এবং লেখকের পারিবারিক জীবনের সত্যনিষ্ঠ ও সামগ্রিক বিবরণ রয়েছে। নীলকররা চেয়েছিল হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য সৃষ্টি করে সে সুযোগে শোষণ ও শাসন বজায় রাখতে। ঠিক এই জায়গাটাই মশাররফ ধরতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যই নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করতে পারে। তাই প্যারীসুন্দরীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন,

> যাহাতে সকলের মন এক হয় তাহার উপায় করা চাই। প্রকাশ্যে যাহাই করুক, হিন্দু-মুসলমানকে এক ভাবা চাই। শত্রুকে বিনাশ করতে একতা শিক্ষা করা চাই। একতাই সকল অস্ত্রের প্রধান অস্ত্র। জাতিভেদে হিংসা, জাতিভেদে ঘৃণা, দেশের মঙ্গলজনা একেবারে অন্তর হইতে চিরকালের জন্য অন্তর করা চাই।

১৮৯৯-এ প্রকাশিত হয় 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'। ২৪টি 'নথি' (অধ্যায়) বইটি পড়তে গেলে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-কে মনে পড়বে। এখানে লেখক ও গাজী মিয়াঁ বা ভেড়াকান্ত একাকার। গাজী মিয়াঁ নিজের জীবনের সম্পূর্ণ কাহিনি বলতে চেয়েছে। তবে এটি আত্মজীবনী নয়। স্থান কাল পাত্র সবই কাল্পনিক। স্থাননাম—অরাজকপুর, যমদ্বার, নচ্ছারপুর, হাতপাতা, নেংটচোরা ইত্যাদি। চরিত্রনাম—ভেড়াকান্ত, দাগাদারী, জয়ঢাক, সবলেট চৌধুরী, মাথা পাগলা রায়, ঘরভাঙা, লাল আলু, জ্বালাতন্নেসা, চাঁদবদনী, শিকলিকাটা টিয়ে ইত্যাদি।

বোঝা যায়, এই উপন্যাসে মশাররফের লক্ষ্য নির্দিষ্ট ছিল। তাদের তিনি ব্যঙ্গের মাধ্যমে কড়া চাবুক হেনেছেন। সমাজের উচ্চ আসনে ক্ষমতাসীন মানুষের হাতে সাধারণ মানুষের নির্যাতনের প্রতিবাদ এই রচনায় ব্যঙ্গের রূপে প্রকাশ পেয়েছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'প্রদীপ' পত্রিকার ১৩০৮-এর পৌষ সংখ্যায় মন্তব্য করেছেন,

> গাজী মিয়াঁর বস্তানী একখান বিচিত্র সমাজচিত্র, সুশোভিত সুলিখিত উপন্যাস। ইহাতে নাই, এমন রস দুর্ল্লভ। কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, অম্লমধুর, মধুর, অতিমধুর—যাহা চাও, তাহাই প্রচুর। অথচ সকল রসের উপর দিয়া কাতর করুণরস উছলিয়া পড়িতেছে।...এমন ভাষা, এমন ভাব, কাহিনীবন্যাসকৌশল মুসলমান সাহিত্যসেবকদিগের মধ্যে এ পর্য্যন্তও কেবল বিষাদ-সিন্ধুর রচয়িতাতেই লক্ষিত হইয়াছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি মুসলিম সমাজের আগ্রহ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। তখন শুরু হল অগ্রসর হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে সলতে উসকে দিয়েছিল ইংরেজরা। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তৈরি হল ব্যাপক সংঘর্ষের পরিবেশ। মশাররফ এই হিন্দু-মুসলিম সংঘাতকে মেনে নেননি। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের 'কোহিনূর' পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় 'সৎ প্রসঙ্গ' নামে একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করলেন,

> হিন্দু মুসলমানে বিবাদ, কি লইয়া বিবাদ? কিসের জন্য বিবাদ? নিরপেক্ষচিত্তে যদি দশরাত্রি দশদিন একাসনে বসিয়া চিন্তা করিবার শক্তি জন্মে, তথাপি বিবাদের মূল খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য।

এইরকম দ্বন্দ্বজটিল সামাজিক সংকটের সময় মশারফ নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু উটপাখির মতো বালিতে মুখ না গুঁজে সামাজিক দায়িত্ব নিষ্ঠাভরে পালন করেছেন। উদার মানবতাবাদ, স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, সামাজিক কল্যাণচেতনার দ্বারা চালিত হয়েছেন। এখানেই তাঁকে আধুনিক অগ্রবতী চেতনার অধিকারী বলে মেনে নিতে হয়।

৩.৭ স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৬৩ থেকে ১৯০২, এই উনচল্লিশ বছরের মধ্যেই তিনি একাধারে গৃহী ও সন্ন্যাসী, দাশনিক ও চিন্তানায়ক, ধার্মিক ও সমাজতন্ত্রী, সংগীতশিল্পী ও রন্ধনশিল্পী, প্রাবন্ধিক ও সত্যদ্রষ্টা পুরুষ। তিন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ।

সাহিত্যের আকাশে তখন অনেক নক্ষত্রের ভিড়। অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, বিহারীলালের নাম লোকের মুখে মুখে ফেরে। সাড়া ফেলে দিয়েছেন দীনবন্ধু, মধুসূদন, রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র। আর নরেন্দ্রনাথের জন্মের দু'বছর পরেই বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

নরেন্দ্রনাথ এঁদের সকলের সৃষ্টির সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের দেখানো পথে হাঁটলেন না মাত্র পঁচিশ বছর বয়স থেকেই তিনি ভারতপথিক, বিশ্বপথিক। পরিব্রাজকের ব্রত গ্রহণ করে চিনেছেন ভারতবর্ষকে, জেনেছেন বিশ্বকে। ব্রত পালনের মাধ্যমে তাঁর মানসচক্ষু প্রসারিত হল। দেখলেন দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার ঘিরে আছে ভারতের সর্বত্র। সাধারণ মানুষ উপেক্ষিত হয়ে আছে। ওই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা যোগানোর মানুষের বড়ো অভাব। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের পার্থক্য ধরা পড়ল তাঁর অনুভবে। আর সেই অনুভূতিই ফুটে উঠল বিবেকানন্দের লেখনীতে।

সাহিত্যিক হবার বাসনায় কলম ধরেন। এ কারণে বিবেকানন্দের সৃষ্টিসংখ্যা সামান্যই। মাত্র চার-পাঁচটি। ‘ভাববার কথা’, ‘বর্তমান ভারত’, ‘পরিব্রাজক’, ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’। আর আছে শ’দেড়েক চিঠিপত্রের সংকলন পত্রাবলী। এইসব রচনার কাল মাত্র সাত বছর। ১৮৯৩ থেকে ১৯০০। কিন্তু প্রায় সবই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রয়াণের পর।

বিবেকানন্দের বাংলায় লেখা গ্রন্থ হিসেবে ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ই ১৩০৯ বঙ্গাব্দে সর্বপ্রথম প্রকাশিত। পরিব্রাজক ও বর্তমান ভারত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩১২ বঙ্গাব্দে। ‘ভাববার কথা’ প্রকাশিত হয় ১৩১৪ বঙ্গাব্দে। ‘পত্রাবলী’ দুই ভাগ ১৩৫৫ এবং ১৩৫৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা জানি ‘সাহিত্য সমাজের দর্পণ’। অর্থাৎ সমাজ ভাবায়, সাহিত্য ভাবে। বিবেকানন্দও এইভাবে ভেবেছেন। বলেছেন— ভাষাকে করতে হবে, যেন সাফ্ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর...। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায় লক্ষণ।... দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদ বিশেষণেও নাই। আর ঠিক এই কারণেই আশ্রয় করেছেন প্রধানত চলিত গদ্যকে, যা সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা। তিনি জানতেন সমাজের কথা, সাধারণ মানুষের কথা বলতে গেলে তাদের ভাষাতেই কথা বলতে হবে। করে তুলতে হবে সর্বজনগ্রাহ্য। সাহিত্যিকে তাই অভিজাত শ্রেণীর ড্রয়িং রুম থেকে নিয়ে এসেছিলেন হাটে মাঠে, পথে-প্রান্তরে। কীভাবে বিবেকানন্দের সামাজিক অভিজ্ঞতা আর ব্যক্তিগত অনুভূতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে গদ্য রচনার মধ্যে তারই কিছুটা পরিচয় দিই।

প্রথমবার আমেরিকা যাওয়ার আগে বিবেকানন্দ আসমুদ্র হিমাচল ভ্রমণ করে ভারতাত্মার প্রাণস্পন্দন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। এরপর আমেরিকা গিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐক্য ও পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন হন। আর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য পরিক্রমাকালে প্রথম অভিজ্ঞতার পরিমার্জনা ও পুষ্টিসাধন করে এ বিষয়ে আরও কৃতনিশ্চিত হন। তারই ফসল ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ বইটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরিমার্জনা ও পুষ্টিসাধন করে এ বিষয়ে আরও কৃতনিশ্চিত হন। তারই ফসল ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’। বইটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্র সেনকে সার কথাটি বলেছিলেন ‘চলিত বাংলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে, তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব, তেমনি ভাষা, তেমনি উদার সূক্ষ্ম দৃষ্টি আর পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তন, শ্রেণীভিত্তিক সমাজের জন্ম ও রূপান্তর ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখা একমাত্র বিবেকানন্দের পক্ষেই সম্ভব ছিল। এই বইয়ে বারবার নারীর প্রসঙ্গ এসেছে। মানব সমাজের বিবর্তনে নারীর ভূমিকা তিনি বিশ্লেষণ করেছেন অসাধারণ মনীষা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সাহায্যে।

‘পরিব্রাজক’ লেখা হয়েছিল বিবেকানন্দের দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণবিবরণ অবলম্বনে। এই গ্রন্থে বিবেকানন্দের গভীর ইতহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, দশনচর্চার পরিচয় রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও এশিয়ার নানা দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের দোলাচল দুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে কীভাবে বেড়ে

উঠেছিল সেটি তার অসাধারণ বিশ্লেষণ রয়েছে এই গ্রন্থে। সমকালের ইউরোপের সকল পেশাদার শিল্পী সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য রয়েছে। 'পরিব্রাজক'-এ ইউরোপের পাশাপাশি প্রাচীন ভারতের গৌরবগাথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বারবার। তিনি ভারবর্ষের নবজন্ম চেয়েছেন। বলেছেন—

> —নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ-জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।...এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন।

একই ধারা বজায় আছে 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থেও। চলিত ভাষায় লেখা না হলেও সাধু গদ্য যে কতটা দ্রুতগতিসম্পন্ন হতে পারে, বইটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারতের অতীত ইতিহাস সমীক্ষা করে যুগান্তরের চারটি পর্ব ব্রাহ্মণ পর্ব, নৃপতি পর্ব, বৈশ্য পর্ব ও শূদ্র পর্ব অসাধারণ মুন্সীয়ানায় তুলে এনেছেন। এই গ্রন্থের শেষাংশে গভীর স্বদেশপ্রেম ধ্বনিত হয়েছে, যা স্বদেশমন্ত্র নামেই পরিচিত।

> হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য সর্বত্যাগী শঙ্কর...ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত—ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোর রক্ত, তোমার ভাই।

তাঁর শেষ বই 'ভাববার কথা'-তে আছে মোট ৯টি রচনা। পত্রিকার প্রস্তাবনা, পুস্তক সমালোচনা, মূল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, ঘটনার ওপর মন্তব্য, বক্তৃতা, অসমাপ্ত গল্প ইত্যাদি। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি। চলিত ভাষার সপক্ষে এর থেকে আক্রমণাত্মক যুক্তি আর দেখা যায়নি।

শেষ করব দুটি কথা দিয়ে। প্রথম কথা, বাংলা গদ্যের আবির্ভাব ঘটেছিল রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে—আইন-আদালতের কাগজে, শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বুড়ো সিবিলিয়ানদের বাংলা শেখানোর জন্য। গদ্য গতি পেয়েছিল সামাজিক প্রয়োজনে—সতীদাহ প্রথা, জমিদারদের অত্যাচার, সামাজিক কুসংস্কার-এর বিরুদ্ধে কলম ধরবার কারণে। গদ্য কুসুমিত হয়েছিল চিন্তনমনের খোরাক এবং শিল্পসৃষ্টির তাগিদে।

দ্বিতীয় কথা, বিবেকানন্দের পথ কোনোদিনই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তাই গদ্যকে কুসুমিত করার বিষয়েও তিনি ঘাম ঝরাননি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

যে পারে সে আপনি পারে

পারে সে ফুল ফোটাতে।

বিবেকানন্দ পেরেছিলেন। তাই সকল কাঁটা ধন্য করে সে-ফুল আপনিই ফুটে উঠেছিল। সেখানেই বিবেকানন্দ আজও প্রাসঙ্গিক হয়ে রয়েছেন।

৩.৮ সারাংশ

বর্তমান আলোচনায় বাংলা গদ্যচর্চায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের গদ্য রচনার আলোচনা করা হয়েছে। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মশারফ হোসেন, স্বামী বিবেকানন্দের গদ্যচর্চার পরিচয় দেওয়া হল। এঁদের সকলেই সমৃদ্ধ করেছেন।

৩.৯ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১. 'দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন'—রামমোহন রায়ের গদ্যভাষা সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন ঈশ্বরগুপ্ত। মন্তব্যটি কতখানি সঠিক বলে আপনি মনে করেন? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন।

২. বাংলা গদ্যের ইতিহাসে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' কী কী কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তোমার মতামত বিবৃত করুন।

৩. সংস্কৃত সাহিত্য থেকে অনুবাদের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব সযৌক্তিক ব্যাখ্যা করুন।

৪. বিধবাবিবাহ এবং বহুবিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের স্বনামে ও বেনামে যে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে, বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাসে তার গুরুত্ব বিষয়ে সংক্ষেপে লিখুন।

৫. পাঠ্যগ্রন্থের বহির্ভূত যেকটি গ্রন্থের জন্য অক্ষয়কুমার দত্তের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৬. গদ্যশিল্পী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় পাঠ্য-বহির্ভূত গ্রন্থে কীভাবে ফুটেছে, সেটি গুছিয়ে লিখুন।

৭. 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা গদ্যে কোন দিকে নতুনত্ব এনেছিল? বইটির সংলাপ ও বর্ণনায় লেখক যে অভিনবত্ব এনেছিলেন, তার পরিচয় দিন।

৮. 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' গ্রন্থে উনিশ শতকীয় কলকাতার ছবিটি ভাষাভঙ্গিতে নানা রূপে যেভাবে রঙিন হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৮. 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' গ্রন্থে উনিশ শতকীয় কলকাতার ছবিটি ভাষাভঙ্গিতে নানা রূপে যেভাবে রঙিন হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৯. প্রবন্ধসাহিত্য কাকে বলে? প্রকৃত প্রবন্ধসাহিত্য কোন সময় থেকে বিকশিত হতে শুরু করে। সূচনালগ্নের ছবিটি স্পষ্ট করুন।

১০. বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১. পরিব্রাজক বিবেকানন্দের পরিচয় কোন কোন গ্রন্থে ধরা পড়েছে? প্রকাশকালসহ উল্লেখ করুন।

২. 'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থটি কার রচনা? এই গ্রন্থে রচয়িতার কৃতিত্বের পরিচয় দিন।

৩. 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধের বিষয়বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের স্টাইল সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।

৪. 'রামারঞ্জিকা' গ্রন্তের লেখক কে? গ্রন্থটির উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু কী ছিল?

৫. 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থে লেখক কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন? তার প্রয়োজনীয়তা লেখক কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

৬. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিন।

৭. প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম কী? বইটির লেখক ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে টীকা রচনা করুন।

৮. চলিত গদ্যের অন্যতম রূপকার বিবেকানন্দের অন্তত দুটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করে তাঁর চলিত রীতি সম্বন্ধে দু'চার কথা লিখুন।

৯. 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' বইটি কার লেখা? লেখক সম্বন্ধে সামান্য পরিচয় দিন।

১০. 'গো জীবন' গ্রন্থটি নিয়ে বিতর্কের কারণ কী? বিতর্কের সারসংক্ষেপ করুন।

৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য—সুকুমার সেন ১৯৯৮।

বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ২০০০।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য—শিপ্রা লাহিড়ী ১৯৬৩।

ভূদেব চরিত্র (১ম ভাগ)—১৩২৪ বঙ্গাব্দ।

বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা—ভূদেব চৌধুরি (২য় খণ্ড)

বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একক ৪ ❑ বাংলা গদ্যের বিকাশে সাময়িকপত্রের অবদান

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ বাংলা গদ্যের বিকাশে সাময়িকপত্রের অবসান

৪.৪ সারাংশ

৪.৫ অনুশীলনী

৭.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের দুই অসাধারণ ব্যক্তির গদ্যরচনার সঙ্গে ধারণা পৌঁছে দেওয়া। গতানুগতিক প্রসঙ্গ ও ভাষারীতির নিদর্শন এখানে আলোচিত হয়েছে।

৪.২ প্রস্তাবনা

উনিশ শতকের সূচনা থেকে বাংলা গ্রন্থের দেখা মিললেও বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের কথা ছিল কল্পনারও অতীত। কলকাতার মানুষ ততদিনে দেখেছে ইংরেজি ভাষায় সংবাদপত্র। কিন্তু বাংলায় সংবাদপত্রের দেখা পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরও প্রায় দুই দশক। এই অসম্ভব একসঙ্গে সম্ভব হয়েছিল মিশনারী ও বাঙালি উভয়ের দ্বারাস, একই বছরে। বাঙালি তার রেশ ধরে রাখতে পারেনি, মিশনারিরা পেরেছিল। বাংলা গদ্যের সঞ্চরণ ঘটল দৈনিক জীবনে। ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় বাংলা গদ্য চলে এল মন ও মননের কাছাকাছি। নিছক ঘটনার গদ্য ধীরে ধীরে দেখা দিল সাময়িকপত্রে সাহিত্যের গদ্য হিসেবে, যুক্তিতর্কের পথ ধরে। এবারের আলোচনায় তারই হদিশ।

৪.৩ বাংলা গদ্যের বিকাশে সাময়িকপত্রের অবসান

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা গদ্য পাঠ্যপুস্তক, ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ের আবদ্ধ ছিল। এই বেড়াজাল থেকে বাংলা গদ্যের মুক্তি ঘটল সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলিতে। সেখানে অন্যান্য খবরাখবরের সঙ্গে আটপৌরে জীবনের খুঁটিনাটি খবর, ধনী মানুষের বিলাস-বাসন ইত্যাদি সবকিছুই ফুটে উঠতে লাগল সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। বাংলা গদ্যের বিস্তৃতি ঘটল অনেকদূর।

১৮১৮-য় সংবাদ-সাময়িকপত্রের আবির্ভাবকালে বাংলা গদ্যগ্রন্থের সংখ্যা ছিল গুটিকয়েক। তখন বাঙালি নিজ মতামত প্রকাশের বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছিল এসময়কার পত্র-পত্রিকাগুলিকে। উনিশ শতকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংখ্যা বারোশোর কিছু বেশি। তাদের মধ্যে প্রকাশচরিত্রেরও ভিন্নতা ছিল। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ইত্যাদি রূপেই প্রকাশিত হত পত্রপত্রিকাগুলি। উনিশ শতকের বাংলা বই-এ গদ্য নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার অধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এইসব সংবাদ-সাময়িকপত্রে।

সামাজিক প্রয়োজনেই বাংলা সংবাদপত্রের সৃষ্টি। শুরুর দিকে পাঠকের কাছে গদ্যের মাধ্যমে বোধগম্য ভাষায় সংবাদ পরিবেশনের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, সংবাদপত্রের লেখকরা। তখন গদ্যে যথাযথ বিরামচিহ্নের অভাব আমাদের নজর এড়ায় না।

গসপেল ম্যাগাজিন-এ (১৮১৯) কমা, সেমিকোলন ব্যবহৃত হলেও, যতিচিহ্নে সর্বত্র দাঁড়ির বদলে ফুলস্টপ ব্যবহৃত; বাক্যগঠন রীতিও যথাযথ ছিল না। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা থেকে একটি উদাহরণ দেখে নিই—

> প্রভু যিশু খ্রিষ্ট তিনি পারিদিগের পাপ বিনাশের জন্যে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া আপন বলিরূপী হইয়া আপনাকে উৎসর্গ করিলেন, এই হইয়াছে পাপের প্রায়শ্চিত্ত, পরে যাহারা ঐ প্রায়শ্চিত্তেতে প্রত্যয় রাখিয়া তাঁহার আশ্রয় লয় তাহারদিগের পাপ বিমোচন হয়, আর পাপ করিতে ইচ্ছা নষ্ট হওয়ার স্থূলখানাও এই সে কেবল ধর্ম্মাত্মার শক্তিতেই হয়, সে ধর্ম্মাত্মা মিলিবারও প্রধান কারণ হইয়াছেন ঐ প্রভু যিশু খ্রীষ্ট, (সূত্র: *উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র*, স্বপন বসু)

বলতেই হবে, এই ধরনের লেখার সঙ্গে একালের বাঙালি পাঠক পরিচিত নন। সেকালের মানুষজনের কাছে মিশনারিদের এ ধরনের গদ্য 'শ্রীরামপুরী বাংলা' অভিধা পেয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত এই গদ্যে 'সাহেব সাহেব গন্ধ' পেয়েছিলেন। সংবাদ-সাময়িকপত্রে বাংলা গদ্যের চচা সূচনা হয়েছিল এভাবেই। ক্রমশ এতে দেখা দিল বিষয়বৈচিত্র্য, কথাসাহিত্যের অঙ্কুরোদ্গাম।

উনিশ শতকে তৃতীয় দশকে পত্রিকার সংখ্যা বাড়ল বহুগুণ। সংবাদপত্রের জগতে বেশ কিছু শক্তিশালী লেখকের আগমন হল। বাংলার 'প্রথম গদ্য স্টাইলিস্ট' ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই ধরি। প্রিভি কাউন্সিলে সতীদাহ সমর্থকদের আবেদন খারিজ হয়ে যাবার সংবাদপ্রাপ্তিতে ক্ষুব্ধ ভবানীচরণ সমাচার চন্দ্রিকা-য় লেখেন—

> আমরা মহাখেদে ও মনস্তাপে তাপিত ও ভাবিত এবং উদ্বেগসাগরের মগ্ন হইয়া নয়ননীরে ভাসিতে ২ সতীর অশুভ সংবাদ প্রকাশ করিতেছি ইহাতে পাঠকবগ মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম পরায়ণ মহাশয়দিগের মর্ম্মবেদনা অন্তর্যাতনা অত্যন্তই হইবেক ইহা নিশ্চয় জানিয়াও অশুভ সম্বাদ প্রকাশকরণে বাধিত হইলাম যেহেতু সম্বাদপত্রের নিয়মই এই শুভাসুভ সকলি প্রকাশ করিতে হয়। বিশেষতঃ সতী বিষয়ের সম্বাদ মনুষ্যমাত্রেই শ্রবণেচ্ছু। যদ্যপি সতীর সপক্ষ বিপক্ষ ইহাতেই জয় পরাজয় জানিবার বাঞ্ছা উভয় প৫েরি হয় সুতরাং আমারদিগকে বাধত হইয়া অশুভ সম্বাদ প্রকাশ করিতে হইল। (সূত্র: উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র, স্বপন বসু)

সমকালীন বাঙালি লেখকরা ছেদ, যদিচিহ্ন ব্যবহারে ততটা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে না পারলেও পূর্ণযতিচিহ্ন হিসেবে ভবানীচরণ দাঁড়ি ব্যবহার করেছেন। ভবানীচরণের গদ্য অনুসরণ করলে বোঝা যায়, তিনি গদ্যে যুক্তি, আবেগ ও গতি সঞ্চারিত হল। গদ্যরচনার নমুনা হিসাবে ১৮৪৩-এ এই পত্রিকায় প্রকাশিত অক্ষয়কুমার দত্তের একটি রচনার অংশবিশেষ উদ্ধার করা যেতে পারে—

> যৌবন অতি বিষম কাল। এই কালে ইন্দ্রিয় সমুদয় বলবান্ হয়, অন্তঃকররের বৃত্তিসকল তেজস্বি হয়, চতুর্দ্দিক হইতে নানা বিষয়ের প্রতিমা চিত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া নানা অভিলাষের সঞ্চার করে। এই কাল সুকর্ম্ম ও দুষ্কর্ম্ম উভয় পথের সন্ধিস্থল, তোমরা এইক্ষণে সেই সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছ, অতএব এই তোমারদিগের বিবেচনার কাল এই সময়ে বিচার করিয়া সৎপথ অবলম্বন কর (সূত্র: *উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র*, স্বপন বসু)

এই গদ্যের হাত ধরে সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম, বিজ্ঞান, অর্থনীতির বিভিন্ন দিক পাঠকের সামনে এল। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র এই কাঠামোতে যোগ করেছেন নতুন মাত্রা। আর পরবর্তীকালে সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ তাকে ফলে ফুলে পল্লবিত করে তুলেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী-র সমসময়ে অন্যান্য পত্র-পত্রিকার অনেক সম্পাদকেরই এমন সুললিত গদ্য রচনার ক্ষমতা ছিল না।

সেকালে বাংলা গদ্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার হাত ধরে অনেকদূর এগিয়ে গেলেও সমকালে অনেক পত্রিকা-সম্পাদক বেশ পিছিয়েই ছিলেন। তাঁরা তখনও তৎসম শব্দবহুল জটিল গদ্য অবলম্বন করেই লেখালেখি করতেন। নমুনা হিসেবে সংবাদ **শশধর**-এর (১৮৫২) অনুষ্ঠানপত্র দেখাই—

> মানবজাতির সর্ব্বকল্যাণ ওসর্ব্বসম্পদদায়িনী ভারতভূমি, পুরুষোত্তমের অনির্ব্বচনীয় অনুকম্পায় সমস্ত প্রধান শান্ত দান্ত দয়াশীলগণের নিবসতি প্রযুক্ত বিবিধ শাস্ত্র ও বিজ্ঞান কাণ্ডের পরমাকর হইয়াছে কালে সে কাল কালগত, এখানে স্বদেশীয় শাস্ত্রাদির আলোচনার কাল আগত তথাপি এই স্থান পরম পুরুষের প্রিয়তম স্থান প্রযুক্ত এতজজ্ঞানাকর জ্ঞানরত্ন দানে নিতান্ত ক্ষান্ত না হইয়া এক্ষণে সংবাদপত্রাদি প্রকটনে দেশীয় ভাষালোচনার ও শাস্ত্রামৃতাস্বাদনের উপযুক্ত হইয়াছে দিগবৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বদিগে সংবাদপত্র ব্যাপক ছিল না অধুনা প্রায় দিনমণির প্রভাব ন্যায় সর্ব্বস্থানে আলোক প্রদান করিতেছে...(সূত্র: *উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র*, স্বপন বসু)।

সংস্কৃতজ্ঞ মানুষজনের লেখনিতে বাংলা গদ্য প্রথম পর্বে লালিত হয়েছে। ফলে প্রথম থেকেই মুখের ভাষা ছিল ব্রাত্য। কৃত্রিম এক ভাষারীতিকে আশ্রয় করে গদ্যের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। পণ্ডিতরা একেই বলেছেন সাধুভাষা। এই ভাষার থেকে অনেক দূরে ছিল আরবি-ফারসি এবং বহুল প্রচলিত আটপৌরে শব্দ। কিন্তু মুখের ভাষাকেই কাছে টেনে নিলেন কিছু মানুষ। তাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্নর আবির্ভাবের আগেই চলিত ভাষাকে সাহিত্যের দরবারে নিয়ে এলেন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' (১৮৪৭)-এর পাতায় দেখা গেল একেবারে আটপৌরে ভাষার ঝলক।

প্রশ্ন : ওগো, ও দিদি কি শুনতেছি মেয়েদের লেখাপড়া শেখার তরে নাকি একটা স্কুল হয়েছে।

উত্তর : হ্যাঁলো বোন তুই কি এতদিন তা শুনিস নি? এক মাস হলো ছোট ২ মেয়ে সকল সেখানে যেতেছে।

প্রশ্ন : দিদি তারা সব কি শিখ্‌তেছে?

উত্তর : ছেলেদের মত কাগজ লিখছে, বই পড়ছে, বাড়ার ভাগ আবার দর্জ্জির কার্য্য শিখতেছে। আহা! বোন্ ক্ষুদে ২ মেয়েগুলীন কেমন টুপি সেলাই করে, দেখে অমনি চক্ষুঃ জুড়ায়। আমি সে দিনে গঙ্গাজলের বাড়িতে সাধের নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলেম, সে পাড়ার একটি বামুনের মেয়ে তোর এই রাখালীর চেয়ে কিছু বাড়ন্ত গড়ন কেমন হাসি ২ মুখখানি কোরে বল্লে লো। (সূত্র: *উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র*, স্বপন বসু)

এই লেখাটিকে প্রমাণস্বরূপ রেখে আমরা বাংলা চলিত গদ্য ব্যবহারের প্রথম গৌরব সংবাদ-সাময়িকপত্রকে দিলে ভুল করব না। এরপর বাংলা সাহিত্যে সাধু গদ্যরীতির একচেটিয়া আধিপত্যের দিন প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ল। সংবাদ-সাময়িকপত্র চলিত ভাষা ব্যবহারের এটি বিচ্ছিন্ন কোনও দৃষ্টান্ত নয়।

শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ১৮৮৫ সালে প্যারীচাঁদ মিত্র আর রাধানাথ শিকদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘মাসিক পত্রিকা’। তখন শিক্ষার আলোয় বাঙালি মেয়েরা আলোকিত হতে শুরু করেছে। এর আগে নারীর শিক্ষা মানেই বিধবা হবার ভয়। তাই লেখাপড়ায় নবাগত সদ্য অক্ষরজ্ঞানসম্পন্না মেয়েদের পক্ষে গুরুগম্ভীর সাধুভাষা বোঝা সম্ভব ছিল না। তাই মেয়েদের সহজবোধ্য সহজ সরল ভাষায় এই পত্রিকার জন্য লিখতে শুরু করলেন প্যারীচাঁদ আর রাধানাথ। ‘মাসিক পত্রিকা’র প্রথম সংখ্যা থেকে ‘স্ত্রীশিক্ষা’ নামে একটি প্রস্তাব ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। এতে মেয়েকে স্কুলে পাঠানো উচিত কিনা তা নিয়ে পদ্মাবতী ও স্বামী হরিহরের কথোপকথন। এটির লেখক প্যারীচাঁদ স্বয়ং। পদ্মাবতী বলছেন—

মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখে কি করবে? সে কি লেখাপড়া শিখে চাকরি করে টাকা আনবে? মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে বরং লোকে নিন্দে করবে। রবিবার দিন দিদীর বাড়ি গিয়েছিনু, সেখানে মাসী-পিসী সকলে এসেছিলেন। তাদের কাছে মেয়ের লেখাপড়ার কথা বললে তাহারা সকলে বললেন—মেয়েমানুষের লেখাপড়া শেখায় কাজ কি? কেউ কেউ বললেন, মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখলে রাঁঢ় হ। মা গো মা সে কথাটা শুনে অবধি মনটা ধুকপুক ধুকপুক করছে। কাজ নাই বাবু আর লেখাপড়ায় কাজ নাই—আমার মেয়ে অমনি থাকুক। যে কয়েকদিন পাঠশালে গিয়াছিল তার দোষ কাটাবার জন্য চূড়ামণিকে দিয়ে ঠাকুরের কাছে তুলসী দেওয়াবো। (সূত্র: *উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র*, স্বপন বসু)

১৮৫৪ সালে প্রকাশিত এই রচনার সমকালেই প্রকাশিত হয়েছে বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা। মাস দুয়েক পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য় বেরিয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তক। ১৮৫৫-য় মাসিক পত্রিকা’-য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল আলালের ঘরে দুলাল। সাধু গদ্যের কাঠামো বজায় থাকলেও তৎসম শব্দের একাধিপত্য আর রইল না। আরবিফারসি শব্দ জায়গা করে নিল তার লেখায়। কিছুদিন পরেই আবির্ভূত হলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। কলকাত্তাইয়া বুলিকে আশ্রয় করে একটি গোটা বই লিখে ফেললেন তিনি। তবে সংবাদ-সাময়িকপত্রে ব্যবহৃত এই ভাষারীতি

সোমপ্রকাশ-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের পছন্দ হয়নি।

সোমপ্রকাশ-এ দীর্ঘ সতর্কবার্তা অনেকেই কানে তোলেননি। চলিত ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা থেকে বাংলা সংবাদপত্র মুক্ত হয়নি। উনিশ-শতকের সাতের দশক থেকে বাংলায় বেশ কয়েকটি ব্যঙ্গ পত্রিকা ছাপা হতে শুরু করে। গদ্যকে সহজ এবং যুগোপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে এইসব পত্রিকার সদর্থক ভূমিকা অনস্বীকায। বাংলায় প্রথম পাঞ্চজাতীয় পত্রিকা প্রকাশের কৃতিত্ব ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৮৭০-এ বিদূষক নামে যে পত্রিকাটি তিনি প্রকাশ করেন, তার প্রতিটি সংখ্যার প্রতিটি লেখা চলিত গদ্যে রচিত। 'চলিত ভাষায় প্রথম বই লেখার গৌরব যেমন কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রাপ্য, তেমনি আগাগোড়া চলিত গদ্যের ওপর নিভর করে পত্রিকা প্রকাশের কৃতিত্বের দাবিদার ভুবনচন্দ্র।'

হুতোম প্যাঁচার নকশা প্রকাশের পর ১৮৭৫ সালেই দুর্গাদাস ধর হুতোম নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল হুতোমি ভাষার অনুসরণে সামাজিক বিভিন্ন অসঙ্গতিকে তুলে ধরা। এই পত্রিকার স্বচ্ছন্দ গদ্যের একটু নমুনা দেখা যাক—

> আজকাল গ্রন্থ লেখার বড় ধুম পড়েছে, আজব শহরেই প্রতি গলীতেই খুঁজে দেখলে দশ বিশ জন গ্রন্থকার পাওয়া যায়। যেমন এক এক সময়ে এক এক পল্লীতে এক একটি সংক্রামক রোগ উপস্থিত হয়ে সেই স্থানের সকল লোককেই আক্রমণ করে, গ্রন্থকাররূপ সংক্রামক রোগও সম্প্রতি শহরের অধিকাংশ লোককে আক্রমণ করেছে। সংক্রামক রোগ যেমন অল্প বয়স্ক বালকদের অধিক পরিমাণে আক্রমণ করে, গ্রন্থ লেখা রোগটাও সেইরূপ ইস্কুল বয়েদের মধ্যে পারিমাণিক অধিক দেখতে পাওয়া যায়। আমি একজন গ্রন্থকার, গ্রন্থকার বলে আমায় দশ জনে জানবে, পুস্তকের টাইটল পেজে ডবল ইংলিশ টাইপে অমুক বসু বা মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত ছাপা হবে, সম্বাদপত্রের সম্পাদকের সমালোচনারূপ প্রশংসাবাদে দিক্‌বিদিক্ পরিপূর্ণ করবে, পটাপট বই বিক্রি হয়ে যাবে, ছাপার খরচা বাইরে বাইরে শোধ হবে, আর লাভও হবে, আর নগদ দশটাকা হাতে আসবে, এইগুলি, গ্রন্থকার রোগ উৎপত্তির প্রধান কারণ। (সূত্র: *উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র*, স্বপন বসু)

১৮৮৩-তে কিষেণলাল বর্মণের সম্পাদনায় গোপাল ভাঁড় নামক ব্যঙ্গ পত্রিকাটির প্রতিটি লেখায় চলিত গদ্যরীতি অনুসৃত। অর্থাৎ 'বঙ্গদর্শন-আর্য্যদশন-ভারতীর সমকালে বাংলা চলিত ভাষার শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে শুরু হয়েছে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।'

কোনও কাগজ প্রকাশের আগেই সম্ভাব্য পাঠকের কথা মনে রেখেই পত্রিকার ভাষারীতি ঠিক করা হতো। যেমন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের সময় দেবেন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমার দুজনেই জানতেন, 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সঙ্গে যুক্ত শিক্ষিত মানুষজন এবং ব্রাহ্মসমাজের সদস্যরাই পড়বেন এই পত্রিকা। তাই তৎসম শব্দবহুল তাত্ত্বিক আলোচনা বা সমাজনীতির বিশ্লেষণ বুঝতে কোনও অসুবিধা হবে না তাদের। এ কারণে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বছরের পর বছর বিশুদ্ধ সাধুগদ্যের চর্চা করছে। বঙ্গদর্শন প্রকাশকালে বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের কথাই মনে রেখেছিলেন। ফলে এই পত্রিকার পাঠকরা বিনা বাধায় 'উত্তরচরিত' বা 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এর মতো প্রবন্ধের বক্তব্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এরই পাশাপাশি

সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে 'বিষবৃক্ষ'-র মতো উপন্যাস। কিন্তু ১৮৭০-এ কেশবচন্দ্র সেন যখন সুলভ সমাচার প্রকাশ করলেন, তখন তাঁর নজর ছিল সেইসব মানুষের দিকে 'খাটিতে খাটিতে রাতদিন যাঁহাদের মাতার উপর দিয়া চলিয়া যায়।' বঙ্গদর্শন বা জ্ঞানাঙ্কুর এইসব মানুষের মুখ চেয়ে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু সুলভ সমাচার তো ছিল খেটে খাওয়া মানুষের পত্রিকা। তাই স্বল্পশিক্ষিত নিম্ন মধ্যবিত্ত এইসব মানুষ সুলভ বলতে ছিলেন পাগল। এঁদের গ্রহণযোগ্যতার কথা ভেবে পত্রিকার ভাষাকে করে তোলা হয় একেবারেই সাদামাটা, আটপৌরে।' এই ভাষার একটা নমুনা দেখা যাক—

> এদেশের লোকদের নম্রতা কম। যাঁর পঞ্চাশ টাকা আয় তাঁর পা মাটিতে পড়ে না। যার একখানি গাড়ি আছে তাঁর তো কথাই নাই। হঠাৎ বাবুরা আরো দেমাকে, চাল চোল্ ঠিক নবাব শিরজুদ্দৌল্লার মত, কথাগুলা ভারি, পৃথিবীর রাজা উজীর কাহাকেও গ্রাহ্য হয় না। পেটে যদি একটু ইংরেজি বিদ্যা প্রবেশ করে তাহা হইলে সোনায় সোহাগা। লক্কা পায়রার ন্যায় গলা ফুটে ওঠে, ঘাড়টা একটু বেঁকে যায়, বুড় বাপ মা পযন্ত্য কেহ ভয়ে সম্মুখে আসিতে পারেন না। (সূত্র: *উনিশ শতকের বাংলা সাময়িকপত্র*, স্বপন বসু।)

'পত্রিকার পাঠকদের কথা মাথায় রেখে একই সম্পাদক যে বিভিন্ন পত্রিকায় ভিন্ন ভিন্ন ভাষারীতি প্রয়োগ করতেন তা শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত তিনটি পত্রিকা সমদর্শী (১৮৭৪), সমালোচক (১৮৭৮) ও সখ্য-র (১৮৮৫) গদ্যরীতিকে পাশাপাশি রেখে বিচার করলেই বোঝা যাবে। উনিশ শতকে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলিতে গদ্যকেন্দ্রিক কত যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। গুরুগম্ভীর গদ্যে গভীর তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি একেবারে আটপৌরে ভাষায় গ্রাম বংলার মানুষের দুঃখের কথা তুলে ধরা হয়েছে। নীলকরের অত্যাচারের রোমহর্ষক বিবরণের পাশেই স্থান পেয়েছে সুরাপান বা বাল্যবিবাহের অপকারিতা। এমনকি একই ধরনের বিষয়ের আলোচনায় বিভিন্ন স্তরের পাঠকের মুখ চেয়ে ভিন্ন ধরনের গদ্য ব্যবহারের নমুনাও এইসব পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বা বঙ্গদর্শন-এর পাশাপাশি 'বামাবোধিনী পত্রিকা'-য় প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক লেখাগুলিতে চোখ বোলালে দেখা যাবে, ছোট ছোট বাক্যে বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলিকে কীভাবে মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন সম্পাদক। তিনটি পত্রিকার বিজ্ঞান আলোচনার ভাষার দিকে তাকালেই বোঝা যাবে তা সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মানুষের গ্রহণযোগ্যতার কথা খেয়াল রেখেই রচিত।'

'প্রকাশকালে বামাবোধিনী পত্রিকা বলেছিল 'বামাগণের বোধ সুলভ বামাবোধিনীর বিষয় যত কোমল ও সরল ভাষায় লেখা যায়, আমরা তাহার চেষ্টার ত্রুটি করিব না।' একথা সম্পাদক মনে রেখেছিলেন। তিনি জানতেন, সহজ করে না লিখলে স্বল্পশিক্ষিত বাঙালি মেয়েদের পক্ষে তা বুঝে ওঠা সম্ভব হবে না। মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা ও গ্রহণ ক্ষমতার দিকে নজর রেখে ভাষা ব্যবহারের পথপ্রদর্শক উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকাগুলি।'

৪.৪ সারাংশ

বাংলা গদ্য চর্চায় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, প্রশাসনিক উদ্যোগ, ব্যক্তিগত উদ্যোগ এসবের আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও সাময়িক পত্রপত্রিকার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সংক্ষেপে এখানে বিভিন্ন পত্রিকার আলোচনা করা হয়েছে।

৪.৫ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১. বাংলা সংবাদপত্র-সাময়িকপত্রে সাধুগদ্যের চর্চার প্রথম পর্বে যে প্রকৃতি ফুটে উঠেছে তার পরিচয় দিন।

২. বাংলা সংবাদপত্র-সাময়িকপত্রে চলিতগদ্যের সূচনা কখন ঘটেছিল। তার রূপরীতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

৩. বাংলা গদ্যে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ভূমিকা কতখানি, ব্যাখ্যা করুন।

৫. বাংলা চলিত গদ্যে রঙ্গব্যঙ্গের পত্র-পত্রিকার অবদান নিজের ভাষায় গুছিয়ে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. প্রথম কোন পত্রিকায় যথাযথ বিরামচিহ্নের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়?

২. 'আলালের ঘরের দুলাল' লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে কারা ছিলেন?

৩. 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে কারা ছিলেন?

৪. বাংলায় প্রথম পাঞ্চজাতীয় পত্রিকা প্রকাশের কৃতিত্ব কার? পত্রিকাটির নাম কী?

৫. শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত তিনটি পত্রিকার নাম লিখুন।

৬. গোপাল ভাঁড় নামক ব্যঙ্গ পত্রিকাটির সম্পাদকের নাম কী?

৭. শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত 'মাসিক পত্রিকা'-র সম্পাদকের নাম লিখুন।

৮. 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক নাম ও প্রকাশকাল জানাও।

৯. 'হুতোম' পত্রিকাটির চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য কী ছিল? পত্রিকাটির সম্পাদকের নাম লিখুন।

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র—স্বপন বসু

বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা—ভূদেব চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মডিউল : ২

বাংলা কাব্যে আধুনিকতা

একক ৫ ❑ বাংলা কাব্যে আধুনিকতা

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ বাংলা কাব্যে আধুনিকতা সঞ্চার ও স্বরূপ

৫.৪ সারাংশ

৫.৫ অনুশীলনী

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ উদ্দেশ্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর বাঙালির সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্যের এক ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল। আমরা আগেই দেখেছি, বাংলা সাহিত্য ছিল মূলত পদ্য-নির্ভর গদ্যের সাহিত্য রচনার প্রচলন ছিল না। পাশ্চাত্য প্রভাবে সমস্ত কিছুর সঙ্গে সাহিত্যের নতুনত্বের সুর বেজেছিল। সেই নতুনত্বের সূচনায় কারা ছিলেন অগ্রদূত হিসেবে-শিক্ষার্থীদের সে সব জানানোর জন্য এই উদ্যোগ।

৫.২ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার প্রভাব দেখা দিতে থাকে। বিভিন্ন নব-আলোকিত কবিদের কথা—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রভৃতি কবিগণ আধুনিকতার আলো নিয়ে এলেন। সংক্ষেপে তার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এই পর্যায়ে।

৮.৩ বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সঞ্চার ও স্বরূপ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যে দিকটি প্রধানত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তা হলো গদ্যচর্চা। পূর্ববর্তী প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রায় পুরোটাই ছিল কাব্যনির্ভর। যদিও দলিল-দস্তাবেজ বা ব্যকিতগত চিঠিপত্রের সূত্রে কিছু গদ্য নিদর্শন সেই যুগেও মেলে। কিন্তু ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার সূত্রে এবং বাংলায় মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় গদ্যচর্চা

যখন নবজায়মান আঙ্গিক হিসেবে বিকাশলাভ করতে লাগলো, কাব্যচর্চা স্বভাবতই কিছুটা একপেশে হয়ে পড়ে। পলাশির যুদ্ধ (১৭৫৭ খ্রি.) ও বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন শুরুর পর উনিশ শতকের সূচনা থেকেই বাঙালির মননে কিছু লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দৃষ্ট হতে থাকে। সংস্কৃত, আরবি ও ফারসির পাশাপাশি নতুন প্রভুর ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষাশিক্ষা এই পরিবর্তনকেই সূচিত করে। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা শিক্ষিত বাঙালির ভাবজগৎকে একধাক্কায় অনেকটা পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়। বাঙালি চেতনায় পরিলক্ষিত হতে থাকে এক সদর্থক সংঘাত, পুরাতনের সঙ্গে নতুন ভাবনার নিরন্তর সংঘর্ষ। প্রথাগত মূল্যবোধ, ভাবনা ও বিশ্বাস ক্রমশ প্রশ্নের মুখে পড়তে থাকে, তৈরি হয় তর্কের অবকাশ। বাঙালির এই পাশ্চাত্য ধারায় তর্কপ্রিয় হয়ে উঠবার চাহিদা মেটাতে গদ্যরীতিই ছিল প্রধান হাতিয়ার। উইলিয়ম কেরি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতবর্গের নিরীক্ষামূলক গদ্যচর্চা, রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তিপ্রবণ গদ্য কিংবা ঈশ্বর গুপ্তের অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিকতার গদ্য বাংলা ভাষার আধুনিক রূপটিকে ক্রমে গড়েপিটে নিচ্ছিল। অন্যদিকে ভারতচন্দ্র পরবর্তী কাব্যচর্চা অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকেই কবিগান, তরজা, আখড়াই-হাফ আখড়াইতে নিবিষ্ট হতে থাকে। উনিশ শতকেও এই ধারা বহমান ছিল, এমনকি মঙ্গলকাব্য ও শাক্ত কবিতার চর্চাও থেমে থাকেনি। প্রাক্-ঔপনিবেশিক এই দেবনির্ভর, ধর্মীয় গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সাহিত্যপ্রবাহ নতুন চিন্তাচেতনার নিরিখে কিঞ্চিৎ স্থূল ও পরিগণিত হতো সময় সময়। ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলন, ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত ‘এলিট’ বাঙালির কাব্যরুচি এক স্পষ্ট বাঁকবদলের প্রতীক্ষায় ছিল স্বভাবতই। উনিশ শতকীয় আধুনিকতার রূপটিও এই সূত্রে একবার বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। পাশ্চাত্য শিক্ষা বাঙালির একটা বড়ো অংশের মানসিকতায় বেশ খানিক পরিবর্তন সাধন করেছিল। ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে পরিচিত তাঁদের ভাবনাচিন্তার পরিসরকে সম্প্রসারিত করেছিল অনেকাংশে। এর ফলে,

প্রথমত, এযাবৎ প্রচলিত মূল্যবোধ ও অভ্যাসগুলি প্রশ্নের মুখে পড়তে থাকে। নতুনকে নিঃসংশয় গ্রহণ অথবা আজন্মলালিত বিশ্বাসকে সম্পূর্ণত বর্জন, কোনোটাই এইসময় পুরোপুরি সম্ভব ছিল না। এজন্যই উনিশ শতক বাঙালির জীবনে এক তীব্র দোলাচলের শতক। এই দোলাচল সদর্থক, প্রশ্নাতুর।

দ্বিতীয়ত, নব্যচিন্তার স্রোতে একটি জাতি ক্রমশ মানসিকভাবে আরো পরিণত হয়ে উঠতে থাকে। বাঙালির বিশ্বজনীন হয়ে ওঠার সেই সূত্রপাত। উনি৷ শতকীয় আধুনিকতাই আমাদের ভাববার ভঙ্গিকে সীমিত চৌহদ্দির বাইরে মুক্তি দিতে চেয়েছিল।

তৃতীয়ত, নিজের ঐতিহ্যকে গোঁড়াভাবে আঁকড়ে থাকায় নয়, সচেতন মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনর্বিবেচনাই এই শতককে স্বতন্ত্র করে। সংস্কারপ্রচেষ্টায় রাজা রামমোহন রায়, বাংলা গদ্যসাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কাব্যধারায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই সচেতনতার গুরুত্বপূর্ণ কাণ্ডারী ছিলেন। এমন শিক্ষিত, সচেতন, আত্মমর্যাদা ও স্বাজাত্যবোধসম্পন্ন বাঙালির সঙ্গে রক্ষণশীল পুরাতনপন্থীদের পদে পদে সংঘাত চিল অনিবার্য, আর অনেকাংশেই সেই

সংঘাত পাশ্চাত্য প্রভাবিত। কাব্যরীতি ও কাব্যভাষা যেহেতু এহেন সংঘাতের ফলশ্রুতি এড়িয়ে যেতে পারে না, তাই তার আবেদনেও রুচিগত বাঁকবদলের ইঙ্গিত ছিল স্পষ্ট। ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে আধুনিকতার লকটুকু আমরা পেয়েছিলাম, ক্রমপরিস্ফুটনের অপেক্ষায় তাই উনিশ শতকে এসে পড়ে। গদ্যরীতির ক্রমবিকাশের সমান্তরালে বাংলা কাব্যধারায় আধুনিকতার উন্মেষ পরিলক্ষিত হয়। কবিওয়ালাদের জীবনী সংগ্রহ যাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সেই 'সম্বাদ প্রভাকর' পতিরকার সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত, পরবর্তীকালের সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের গবেষণায়, স্বীকৃত হন বাংলা কাব্যকবিতার ইতিহাসে আধুনিক ও পূর্ববর্তী যুগের সংযোগসাধনকারী হিসেবে।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন বাংলার সামাজিক ইতিহাসে চিরস্থায়ী গুরুত্বের দাবিদার। পলাশির যুদ্ধের কিছু আগে থেকেই ইউরোপীয় বিভিন্ন বণিকদল বাংলার নানান জায়গায় কুঠি স্থাপন করে ব্যবসা বাণিজ্য চালাচ্ছিল। ১৭৫৭-য় লর্ড ক্লাইভের বাহিনীর কাছে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লার পরাজয় ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর-রাজনৈতিক এই পালাবদলই প্রাচীন প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় বদল ঘটাতে যথেষ্ট ছিল। ভাঙাগড়ার এমন সন্ধিকালে প্রাগাধুনিক ভাবনা ও উনিশ শতকীয় আধুনিকতা—এই দুইয়েরই কিছু কিছু লক্ষণ প্রকাশিত। ঈশ্বর গুপ্ত যেন সেই দোলাচলকেই কাব্যশরীরে ধারণ করেছিলেন, বা করতে চেয়েছিলেন। বাংলা কাব্যকবিতাার ধারা কখনোই সম্পূর্ণ মুছে না গেলেও ভারতচন্দ্র পরবর্তী সময়ে মেধার একরকম খরা তাতে দেখা গেছিল। রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুগরুচির পরিবর্তন যেমন এরজন্য দায়ী, তেমনি নবগঠিত গদ্য আঙ্গিক কাব্যসাহিত্যের চাহিদাকে করেছিল সীমায়িত। সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা আরো বলেন, আদর্শের সংগ্রামের এই সময়ে, জীর্ণ-পুরাতন যখন ক্রমে নতুন আদর্শের কাছে পরাভূত হচ্ছিল, সেই পরিস্থিতিতে জনমানসে গদ্যসাহিত্যের অনুকূল কঠোর উদ্যম ও উদ্দীপনা যতোটা ছিল, কাব্যরচনার উপযোগী প্রশান্তি ততোখানি ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তর কাব্যচর্চাও অনেকাংশে তাঁর সাংবাদিকতার একধরণের পরিপূরক হিসেবে বিচার্য হতে পারে। ঈশ্বর গুপ্ত এই ক্রান্তিকালে এমন এক আশ্চর্য প্রতিভা হিসেবে রয়ে যান, যাঁর সঙ্গে আগের ও পরের কারুরই পুরোপুরি মিল পাওয়া যায় না। অথচ ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ বা কবিওয়ালারদের ক্রমক্ষীয়মান ঐতিহ্য যেভাবে তাঁর রচনায় বর্তমান ছিল, তেমনি আত্মসচেতন আধুনিকের অনেকগুলি ভঙ্গিও তাঁর কাব্যে আমরা পাই, যে কারণে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম পর্যায়ে তাঁর অবধারিত প্রভাব এড়াতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বা দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্যগুরু হয়ে ওঠেন গুপ্তকবি। কিন্তু কোনোভাবেই রঙ্গলাল বা হেমচন্দ্র পুরোপুরি ঈশ্বর গুপ্ত নন, ঈশ্বর গুপ্তকেও ভারতচন্দ্রের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার সুযোগ নেই। এখানেই বাংলা কাব্যচর্চার ইতিহাসে জটিল এক অধ্যায়ের সূচনা হয়। আধুনিকতার ছোঁয়া ক্রমশ লাগতে থাকে কাব্যকবিতার বহুধাবিস্তৃত ক্ষেত্রে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রধান ও প্রায় একমাত্র অবলম্বন ছিল দেবনির্ভরতা। ঊনবিংশ শতকের আধুনিকতার মূল ভিত্তিই হলো মানবিক জিজ্ঞাসার সূত্রপাত। তা যে শুধু পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর নির্ভরশীল ছিল, এমনটা কখনোই নয়, আসলে এটি একটি

মানসিকতা। ভারতচন্দ্রের কাব্য কিংবা কবিওয়ালাদের গানের দেবকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুরও অন্তঃস্থলে আদতে এই মানবিক কৌতূহলেরই যুগোপযোগী ইঙ্গিতটুকু ছিল। ঈশ্বর গুপ্তর হাতে বা বহু বিচিত্র পথে প্রবাহিত হয়। রঙ্গলাল-মধুসূদনে ঘোষিতভাবে এই প্রবণতা স্ফূতিলাভ করে। বাংলা কাব্য এইসময় থেকেই তার পূর্ববর্তী গেয় রূপ বর্জন করতে প্রয়াসী হয়। প্রাচীন চর্যাগীতি বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাগের উল্লেখ অপ্রতুল নয়। পদাবলী সাহিত্য, বৈষ্ণব বা শাক্ত, মূলত গীত হতো। মঙ্গলকাব্যের পয়ার-ত্রিপদীতে লেখা পাঁচালির ঢং মুখ্যত সবাক উপস্থাপন নির্ভর ছিল। পুথিনির্ভর বাংলা কাব্যের এই ধারা বৃহৎ অংশের কাছে ছিল পাঠার অতিরিক্ত, প্রধানত শ্রাব্য মাধ্যমেই উপস্থাপিত। ঈশ্বর গুপ্তর কবিতায় কয়েকটি ক্ষেত্রে এই রাগ ও তালের উল্লেখ যেমন মেলে, তেমনি অনেক কবিতাই এমন আঙ্গিকবর্জিত। রঙ্গলাল, মধুসূদন থেকে এই ধারা প্রায় সম্পূর্ণত পরিত্যক্ত হলো, কাব্য মুদ্রণযন্ত্রের আনুকূল্য পেয়ে হয়ে উঠলো ব্যক্তিক পরিসরে পাঠের উপযোগী। আঙ্গিকের এই পরিবর্তন বিষয়গত বিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। গদ্যরীতির সঙ্গে সমান্তরালে কাব্যচর্চাকে বাঁচতে হচ্ছে তখন, উপনিবেশিত মানসিকতায় দানা বাঁধছে স্বাজাত্যবোধ ও জাতীয়তাবাদ। আখ্যানধর্মিতা কাব্যের মূল ধারাকে শাসন করছে উনিশ শতকের প্রায় পুরোটাই, কিন্তু আন্তঃস্বভাবে তাও মধ্যযুগীয় আখ্যানমূলক কাব্যধারার থেকে পৃথক।

৫.৪ সারাংশ

পাশ্চাত্য প্রভাবিত নবজাগরিত এই আধুনিকতার একটি দিক যেমন ঐতিহ্য সচেতনতা, আরেকটি অংশ তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ। প্রাগাধুনিক যুগের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চায় একজন শিক্ষিত ও দক্ষ কবি একটি গোষ্ঠীর ভাবনা তথা চাহিদাকেই প্রতিফলিত করতেন। কিন্তু ক্রমশ একজন ব্যক্তিমানবের স্বাতন্ত্র্যের দিকগুলি যখন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে থাকলো, কাব্যবোধ ও তার প্রত্যক্ষ রূপায়ণে এসে পড়লো সেই 'ইন্ডিভিজুয়াল'-এর ছায়া। সাময়িক অনুভূতিকে চিরন্তন করে তুলতে চাওয়া গীতিকবিতা আসতে তখনও একটু দেরি আছে, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত পরবর্তী 'মহাকাব্যের যুগ' বা 'আখ্যানকাব্যের যুগ'-ও একটু নিবিড় বিশ্লেষণে আদতে জাতিগত আশ্লেষকে প্রকাশ করা সত্ত্বেও ভীষণভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ দ্বারা পরিচালিত। রঙ্গলালের কাব্যে তাই রাজপুত নারীর আত্মবলিদানের গৌরবগাথা নির্মোহ দূরত্ব বজায় রেখে বর্ণিত মাত্র হয় না, মাইকেলের প্রত্যক্ষ পক্ষপাত থাকে রাবণের ট্র্যাজেডির দিকে। প্রাগাধুনিক বাংলাতেও কবির ব্যক্তি কুশলতার ছাপ একেকটি কাব্যকে পুনর্বিশ্লেষণের সুযোগ দেয় বারবার, কিন্তু সেই কবিস্বভাবের দক্ষতা এমন তীব্র ও প্রকৃত অর্থে আধুনিক ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক বোধের দ্বারা কোনোভাবেই পরিচালিত নয়। ঈশ্বর গুপ্ত থেকেই ব্যক্তি কবির এই 'হয়ে ওঠা', বাংলা কাব্যের আঙিনায় প্রকৃত আধুনিকতার উন্মেষ।

৫.৫ অনুশীলনী

১। বাংলা কাব্যের আধুনিকতার সূচনা কখন হয়? তার প্রেক্ষাপটের পরিচয় দিয়ে আধুনিকতার লক্ষণগুলি আলোচনা করুন।

২। প্রাগাধুনিক কাব্যের সঙ্গে আধুনিক কাব্যের পার্থক্য বিচার করুন।

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)* : সুকুমার সেন

২। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত* : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় খণ্ড)* : ভূদেব চৌধুরী

৪। *ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে* : সিরাজুল ইসলাম

৫। *বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা*—গোপাল হালদার (২য় খণ্ড)

একক ৬ ❑ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ প্রস্তাবনা

৬.৩ কবিকৃতি : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৬.৪ সারাংশ

৬.৫ অনুশীলনী

৬.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৬.১ উদ্দেশ্য

বাংলা কাব্যের আলোচনায় যে কবিদের রচনায় আধুনিকতা সূচিত হয়, তাদের পরিচয় জানা দরকার বাংলা কাব্যের বিকাশ বা অগ্রগতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য। সেই উদ্দেশ্যে এই এককের উপস্থাপনা।

৬.২ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এদেশে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে জনসমাজে যে ব্যাপক পরিবর্তনের সূত্রপাত হয় তার পরিচয় ঈস্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায় লক্ষ করা যায়। তারপর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’-এ নবীন যুগের দৃপ্ত ঘোষণা। সেই আলোচনাই এই এককে করা হয়েছে।

৬.৩ কবিকৃতি : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৯৫৯)

'No renowned poet appeared in Bengal in the first half of the present century, and Iswar Chandra was the reigning king of the literary world in his day.'—(*Literature of Bengal* / Ramesh Chandra Datta)

বাংলা কাব্যেতিহাসের আধুনিক পর্যায়ের এই আদিপর্ব বস্তুতপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর একক সাধনায় পুষ্ট। পেশা ও স্বভাবে মুখ্যত সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্তর কবিস্বভাব নানান কারণে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ব্যক্তিজীবনের কয়েকটি অভিজ্ঞতা কবিজীবনে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছিল। ঈশ্বর গুপ্তর ভাবশিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব’ নামে তাঁর কাব্যসংকলনের ভূমিকায় কবির জীবনের

দুটি বিশেষ ঘটনার দিকে নির্দেশ করেছেন। দশ বছর বয়সে ঈশ্বর মাতৃহারা হন। তাঁর পিতা হরিনারায়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। পিতার এহেন আচরণ বালক ঈশ্বর মানতে পারেননি। বিমাতার সংসার ছেড়ে তিনি জোড়াসাঁকোয় মামার বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। কিন্তু সেখানেও অনাদর, অবহেলা এবং তাঁর দারিদ্র্যজনিত কষ্টের পাশে অন্যদের ঐশ্বর্য তাঁকে পীড়িত করে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'খাঁটি মা'-এর স্থলে 'মেকি মা'র উপস্থিতি তাঁর সমস্ত সত্তাকে বিচলিত করেছিল। আর এই প্রভাব ছিল চিরস্থায়ী। পনেরো বছর বয়েসে পিতার আগ্রহে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু ঈশ্বরের তাতে মত ছিল না। কৌলীন্য ও অর্থবলে তাঁর শ্বশুর পিতাকে কার্যত খরিদ করে নেন। ক্রুদ্ধ ঈশ্বর গুপ্ত স্ত্রীর সঙ্গে কখনও বাক্যালাপ অবদি করেননি। সহধর্মিনীর সাহচর্য তাঁর প্রাপ্তির তালিকায় ছিল না। চারপাশের পরিবেশের প্রতি এক তীব্র নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, যা তাঁর কবিস্বভাবকে চালিত করেছিল, এই দুই ঘটনায় তার মূল নিহিত। বঙ্কিম লিখেছেন, এই ট্র্যাজেডিতেই "ঈশ্বরচন্দ্রের পাশুপত অস্ত্র সংগ্রহ হইল, সন্দেহ নাই। তিনি বুঝিলেন, এ সংসার মেকি চলিবার ঠাঁই। মেকির পক্ষ হইয়া না চলিলে এখানে জুতা খাইতে হয়। ইহার পর যখন তাঁহার লেখনী হইতে অজস্র তীব্র জ্বালা-বিশিটে বক্রোক্তি সকল নির্গত হইল, তখন পৃথিবীর অনেক রকম মেকি তাঁহার নিকট জুতা খাইল। কবিকে মারিলে, কবি মার তুলিয়া রাখেন।" তাঁর সারা কাব্যজীবনই বস্তুতপক্ষে, তাঁর বিচারবুদ্ধিতে, নানাবিধ 'মেকি'র বিপক্ষে সোচ্চার, অনেকক্ষেত্রে অসহায় স্ববিরোধী লড়াই। বঙ্কিম বারংবার ঈশ্বর গুপ্তর বাল্যশিক্ষার অভাবের জন্য খেদ করেছেন। প্রতিভা তাঁর ছিল কিন্তু তাকে ঠিক পথে সুশৃঙ্খল পরিচালনার দক্ষতা পুরোপুরি ছিল না। বঙ্কিমকথিত খাঁটির প্রতি এই আকর্ষণই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিপ্রতিভার মূল চালিকাশক্তি। কৈশোরে আখড়াই, পাঁচালির দলে গুপ্তকবি গান বাঁধতেন। স্বভাবকবিত্বই তাঁর জোরের জায়গা ছিল। গবেষকদের সাক্ষ্য অনুযায়ী প্রায় পঞ্চাশ হাজার কবিতা তিনি রচনা করেছিলেন। এবং এই বিপুল সংখ্যক রচনার অনেকটাই তাঁর সাংবাদিকতার সূত্রে রচিত। তাঁর অনেক কবিতাই তাই সমসাময়িক ঘটনার আধারে তৈরি। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর একটি কবিতা সন ১২৫৫ সালে 'শরদের আগমনে লোকের অবস্থা বর্ণন আশুতোষ দেবের মৃত্যু ইত্যাদি, রাধাকান্ত দেবের জেলে যাওয়া। নানান ঘটনা এই কবিতায় বর্ণিত। বা হিন্দু কলেজে খ্রিস্টান ছাত্র ভর্তির ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা 'হিন্দুকলেজ' কবিতাটি। কাব্য আঙ্গিকে এগুলি আসলে সাংবাদিক তথ্য পরিবেশনই। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে এই ঘরানা তাঁরই তৈরি। এ প্রসঙ্গেই আসে তাঁর কবিতায় বস্তুতান্ত্রিকতার প্রসঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়নে, "ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist।" 'পাটা', 'এন্ডাওয়ালা তপস্যা মাচ', 'বেগুন' কিংবা 'আনারস' প্রভৃতি কবিতায় যেভাবে অতি সাধারণ ও দৈনন্দিন বিষয়কে তিনি কাব্যের নান্দনিকতার কোটায় এনে ফেলেছেন, তাতে তাঁর বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতি না মানার কারণ নেই। রচনার ডিটেলিংয়ের প্রসঙ্গ যদি ধরতে হয়, তবে 'পৌষপার্ব্বণ' কিংবা 'মাহেশের স্নানযাত্রা" জাতীয় উৎসবকেন্দ্রিক কবিতাগুলির প্রসঙ্গ আসতে পারে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলে অংশগ্রহণ করেন, এমন একটি বাঙালি উৎসবের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি যখন লেখেন,

"হাড়ি মুচি যুগি জোলা কত বা সেকের পোলা,
জাঁকোঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে।
ঠেলাঠেলি চুলোচুলি, কাঁকে কাঁকে ঝুলোঝুলি
লোকারণ্য জলে আর স্থলে।।
স্থলে উঠে দেকি চেয়ে, কত মন্দ কত মেয়ে,
পথ ছেয়ে গান গেয়ে যায়।
আগে পাছে পাকাপাকি, আঁকাআঁকি তাকাতাকি,
ঝাঁকাঝাঁকি স্থান নাহি পায়।।"

তখন এই বিশদে বর্ণনা কবিকঙ্কণের কাব্যের 'গুজরাট নগর পত্তন' মনে পড়ায়। কবিওয়ালাদের সঙ্গ এবং পুরাতনের 'খাঁটি' অনুবর্তনে তিনি মুকুন্দ-ভারতচন্দ্রের মতো শিল্পীর উত্তরসূরি ছিলেন। ভাবনায় ও আদর্শে সনাতনী মূল্যবোধকে তিনি অস্বীকার করতে চাননি কখনও। তাঁর মধ্যে দিয়েই বেঁচেছিল ইংরিজির স্পর্শমুক্ত 'খঁটি' বাঙালির কাব্য। আবার তাঁর কাব্যের বিষয় বৈচিত্র্য আর ব্যক্তিজীবনে 'তত্ত্ববোধিনী', 'নীতিতরঙ্গিনী' সভার প্রভাব পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশের পথকে করেছিল প্রসারিত। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তিনিই প্রথম অকিঞ্চিৎকর বিষয়বস্তুকে কাব্যের বিষয় করে তুলতে পেরেছিলেন। খণ্ড কবিতার জগতে এই বিষয় বৈচিত্র্য তাঁর অবদান। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর পর্যবেক্ষণে, "জীবনের প্রতিটি বিষয় ও উপাদানকে বিচ্ছিন্ন, একক, স্বতন্ত্র মূল্যে খুঁটিয়ে দেখেছেন ঈশ্বর গুপ্ত। এই অন্য-নিরপেক্ষ, স্বাতন্ত্র্যময় অনুপুঙ্খতায় তাঁর আধুনিক দৃষ্টির পরিচয়।" এই 'স্বতন্ত্র মূল্যে'র প্রসঙ্গটিই একটু বিস্তারিত করতে গুপ্ত কবির 'এন্ডাওয়ালা তপস্যা মাচ' কবিতাটির কিয়দংশ উল্লেখ করা প্রয়োজন। তোপসে মাছের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লেখেন,

"কষিত কনককান্তি, কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপ দাড়ি, তপস্বির প্রায়।।
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে।।"

এই 'তপস্বির প্রায়' রূপকল্পর সূত্রেই একটি মোক্ষম তুলনা টানেন কবি,

"সব ঠাঁই আদর, অমান্য নাই কভু।

শুদ্ধসত্ত্ব ঠিক যেন, খড়দার প্রভু।।"—চৈতন্যপার্ষদ নিত্যানন্দ ও খড়দহের অনুষঙ্গ এমন এক আন্তর্বয়নমূলক সম্পর্কের দিক টেনে আনে, নিরামিষভোজী বৈষ্ণবদের সঙ্গে বিপ্রতীপতায় তোপসে

মাছের এই বর্ণনা স্বতন্ত্রভাবেই উপভোগ্য হয়ে ওঠে। 'বেগুণ' কবিতায় উপমা কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়,

"শাদা কাল নানারূপ ত্রিভঙ্গ সুঠাম।
দোলায় দুলিছে যেন কৃষ্ণ-বলরাম।।"

এই জাতীয় উপমা প্রদান যেমন কবিগান-টপ্পা বা মঙ্গলকাব্যের ধাঁচকে মনে পড়ায়, কাব্য বিষয়ের এই অনুপুঙ্খতা ও ব্যপ্তিতে তেমনই আধুনিক মানসের ছোঁয়া লাগে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধুয়ায়, নাটুরে ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়।" আঙ্গিকে তিনি পুরাতনপন্থার অনুবর্তনপ্রয়াসী, আধুনিকতার ছোঁয়া তাঁর বিষয়বৈচিত্র্যে।

সমসাময়িকতাকে কাব্যরূপে সংরক্ষণ প্রয়াস তাঁর মতো করে এর আগে কেউ ভাবেননি। এই সমসাময়িকতা প্রসঙ্গেগই এসে পড়ে তাঁর Satire-এর দিকটি। পাশ্চাত্য আলোকপ্রাপ্তির সুবাদে যুবক বুদ্ধিজীবীরা যখন দেশীয় শাস্ত্রকে নতুনভাবে পাঠ করতে চান, শিষ্য অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পর্কে তেমনই এক প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ত লেখেন,

"নিরামিষ আহারেতে ঠেকেছেন শিখে।
ঘুরিতেছে মাথামুণ্ডু লিখে।।
কোথা তার 'বাহ্যবস্তু' মানব-প্রকৃতি।
এখন ঘটেছে তার বিষম বিকৃতি।।"

'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামে অক্ষয় দত্তর বইটির নিরামিষ ভোজন প্রসঙ্গে এই ব্যঙ্গ। শ্রীরামপুরের মার্শম্যান সাহেবকে নিয়ে 'বাবাজান বুড়াশিবের স্তোত্র' কবিতায় তিনি লেখেন,

"শ্রীধাম শ্রীরামপুর, কৈলাস শিখর।
বিশ্বমাঝে অপরূপ, দৃশ্য মনোহর।।
কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত, তুমি বুড়া শিব।
তথায় বিরাজ করি, ত্বরিতেছ জীব।।
শুভ্রদেহ ভূতনাথ, ভোলা মহেশ্বর।
গঙ্গার তরঙ্গ তব, মাথার উপর।।"

এই রীতি, আগেই বলেছি, সংবাদ পরিবেশনেরই এক সম্প্রসারিত ধরণ, ব্যঙ্গই যেখানে মুখ্য। 'ছদ্ম মিশনারি'দের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে তাঁর রচনা,

"হেদো বনে কেদো বাঘ, রাঙ্গামুখ যার।
বাপ বাপ বুক ফাটে, নাম শুনে তার।।
বাগ করা বাঘ আছে, হাত দিয়া শিরে।

ধরিয়া ধর্মের গলা, নখে ফ্যালে চিরে।।
ছেলে কোলে ছেলেধরা, শুনিয়াছি কানে।
এখন হইল বোদ, বিশেষ প্রমাণে।।”

কিংবা, ইংরেজ সম্পাদক সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন,

“বাহিরেতে ধোপদস্ত, ধপ ধপ শাদা।
ভিতরেতে ঘিন ঘিন পাঁকভরা কাদা।।”

যে ‘মেকি’র বিপক্ষে তাঁর কাব্যের আদর্শায়িত যাত্রা, তেমন ইংরেজিয়ানার নকলনবিশি ও তৎসঞ্জাত প্রজন্মদূরত্ব নিয়ে তিনি লেখেন,

“ভূতের সংসারে এই হয়েছে অদ্ভুত।
বুড়া পূজে ভূতনাথ, ছোঁড়া পুজে ভূত।।
পিতা দেয় গলে সূত্র, পুত্র ফ্যালে কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী, ব্যাটা দেয় পেটে।।”

স্পষ্টতই ইয়ংবেঙ্গলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হিন্দু যুবার গোমাংস ভক্ষণ ভর্ৎসৃত হয়। এই কাব্যভঙ্গি আজকের বিচারে পুরাতন, সেইদিনের নিরিখেও খুব সমাদৃত সবক্ষেত্রে নয়, কিন্তু এ এক জ্যান্ত ধারাবিবরণী। বাঙালিত্বের পক্ষে তাঁর কলম ধরা, দেশীয় রীতি রেওয়াজ তাঁর ভাবনায় আদৃত, কিন্তু তাদের সংজ্ঞা বড্ড একটেরে।

তাঁর অস্ত্র এই স্যাটায়ারই পরিমিতিবোধের অভাবে কীরকম পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে, তারও জলজ্যান্ত নমুনা পাই। ঈশ্বর গুপ্তর কাব্যকৃতির যে বিষয়ানুগ বিন্যাস বঙ্কিম করতে চেয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ‘যুদ্ধবিষয়ক কবিতা’। বঙ্কিম তাঁর ভূমিকায় বলেছেন বটে, “ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই।” এই মতামত সর্বান্তকরণে সমর্থন করা যায় না। সমসাময়িক যুদ্ধবিষয়ক কবিতা, যেমন ‘শিখ যুদ্ধে ইংরেজের জয়’, ‘দিল্লীর যুদ্ধ’, ‘কানপুরের জয়’ প্রভৃতি কবিতায় গুপ্তকবি ইংরেজ শক্তির প্রশংসা করার পাশাপাশি দেশীয় যোদ্ধাদের তীব্র ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেও পিছপা হননা। সিপাহী বিদ্রোহ প্রসঙ্গে নানা সাহেবকে নিয়ে তিনি লেখেন,

“নানা পাপে পটু নানা নাকি গুণে না, না।
অধর্মের অন্ধকারে হইয়াছে কাণা।।
ভাল-দোষে ভাল তুমি ঘটালে প্রমাদ।
আগেতে দেখেছ ঘুঘু, শেষে দেখ ফাঁদ।”

সিপাহী বিদ্রোহ বা নানা সাহেবের এ তো কোনো সদর্থক নিরপেক্ষ সমালোচনা নয়। কবির পক্ষপাত থাকতেই পারে, আধুনিকতার অন্যতম শর্তও সেটা, কিন্তু ‘কানপুরের জয়’ কবিতায় তিনি যখন ঝাঁসির রাণীর চরিত্র হননে উদ্যত হন, তখন তা নিছক সমসাময়িকতার পক্ষপাতমূলক ধারাভাষ্য বা সমালোচনা

মাত্র থাকে না, আধুনিক যুগরুচির নিরিখে বেশ গোলমেলেও হয়ে ওঠে—

"হ্যাদে কি শুনি বাণী ঝান্সির রাণী
ঠোঁটকাটা কাকী।।
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে সাজিয়াছে নাকি?
নানা তার ঘরের ঢেঁকি
নানা তার ঘরের ঢেঁকি মগী খেঁকী
গোয়ালের দলে।
এতদিনে ধনে জনে যাবে রসাতলে।।"

বঙ্কিমের মতে, "অশ্লীলতা তাঁহার কাব্যের এক প্রধান দোষ।" আর এই 'দোষ'-এর জন্য তিনি দায়ী করেছেন যুগরুচি, দেশ-কাল-পাত্রকে। যমক, অনুপ্রাসের প্রতি ঈশ্বর গুপ্তর অতিশয় আগ্রহ তাঁর কাব্যরীতিকে করেছিল সীমায়িত, আর যুগপ্রভাবের এক তীব্র দোলাচল ধারণ করেছিল তাঁর কাব্যশরীর। যে কবি 'দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া' বলতে পারেন স্বজাতিগর্বে, তিনিই 'দুর্ভিক্ষ' কবিতায় মহারাণি ভিক্টোরিয়াকে 'মা' সম্বোধন করে প্রার্থনা জানান। তিনি চেয়েছেন, বাঙালি ইংরেজের অনুকরণমোহ ত্যাগ করুক। বাঙালি নারী বিবিয়ানার মুখে পদাঘাত করুন, আবার 'উড়ুক ব্রিটিশ ধ্বজা সমুদয় স্থলে।' ভিক্টোরিয়ার কাছে প্রার্থনার ছত্রে ছত্রে লুকিয়ে থাকা ব্যঙ্গকে যদিওবা আধুনিক পাঠক পড়ে নিতে পারেন, কিন্তু সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্তর স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের বিষয়ে অকুণ্ঠ সমর্থনের পাশেই কবি ঈশ্বর গুপ্তর একই বিষয় নিয়ে নির্জলা বিদ্রূপকে সন্ধিকালের দ্বন্দ্ব ব্যতীত কীই বা ভাবা চলে। ব্রিটিশ শাসনের ভালোমন্দ ও সমাজে নারীর অবস্থান বিষয়ে এই দ্বন্দ্ব আসলে সেকালের আপামর বাঙালি বুদ্ধিজীবীর, ঈশ্বর গুপ্তও ব্যতিক্রম নন। বরং যুগের দ্বান্দ্বিকতা তাঁর মধ্যে দিয়েই বোঝা যায় ভালো। 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী শিক্ষার বিরোধিতা করে লেখা প্রবন্ধের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে ঈশ্বর গুপ্ত 'স্ত্রীবিদ্যা ও চন্দ্রিকা' নামে দীর্ঘ সপাট সম্পাদকীয় লেখেন। অথচ, ভবানীচরণের মতো যুক্তিপারম্পর্যেই বেথুন সাহেবকে দায়ী করে 'দুর্ভিক্ষ' কবিতায় বলেন—

"যত ছুঁড়ীগুলো, তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন এ.বি. শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে।।
এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে,
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে?
সব কাঁটা চামচে ধোরবে শেষে,
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে?"

কালের প্রভাবেই এই দ্বৈততা তাঁর ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। বঙ্কিমবাবুর সাক্ষ্য অনুযায়ী, "স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে কেবল ব্যঙ্গের পাত্র।" নারীবিদ্বেষ তাঁর কাব্যে অলভ্য নয়। আর তার মূল, শুরুতেই বলা হয়েছে, জীবন অভিজ্ঞতায়। আবার প্রভাকরের পাতা ওল্টালে এই মত পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য মনে হবে না। কোনো তকমায় তাঁকে সরলীকরণবশে চিহ্নিত করা মুশকিল। আসলে ঈশ্বর গুপ্তকে মূল্যায়ন করতে গেলে আজও আমাদের সমালোচনার সীমিত চৌহদ্দির বাইরে দাঁড়াতে হয়। আজকের বিচারে তাঁকে সহজেই নারীবিদ্বেষী বলে বর্জন করতে গেলেই মনে পড়ে, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ছদ্মতা ও ধান্ধাবাজির বিপক্ষেও তিনি মুখর ছিলেন তাঁর কবিতায়। এই দিশাহীন স্ববিরোধই তাঁকে জটিল করে তোলে।

রমেশচন্দ্র দত্তর যে ইংরেজি উদ্ধৃতি দিয়ে এই অংশের আলোচনা শুরু হয়েছিল, সেখানে দেখা যায়, গুপ্তকবির একটি যুগন্ধব রূপ, একটা গোটা যুগের একক প্রতিনিধিত্ব তিনি দাবি করতে পারেন। সেই একই প্রবন্ধে রমেশবাবু বলতে বাধ্য হন, "The poetry is not of a very high order." মেকিত্ব, ছদ্মতা, বিদেশি সংস্কৃতির অন্দ আনুগত্য তাঁর কাছে বারংবার আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু সেখান থেকে উত্তরণের কোনো দিশা তিনি দেখিয়ে যেতে পারেননি। তাঁর বিকল্প সবসময় সমর্থনযোগ্য নয়। বিষ্ণু দে তাঁর প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে আমাদের সতর্ক করেন, যে বিকল্প বা সমাধান সেইসময় ইতিহাসের কাছেই সেভাবে স্পষ্ট ছিল না, একজন স্বভাবকবির কাছে তা আশা করা বাড়াবাড়ি। তিনি বলেন, "গত শতাব্দীর (উনিশ শতক) কন্টকিত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই ঐতিহ্য রক্ষায় এক দিকপাল।" আমরা বুঝতে পারি, এক প্রকার 'ঐতিহাসিক বিনয়' প্রয়োজন তাঁর কাব্যমূল্যকে সময় ও ঐতিহাসিকতার নিরিখে বিচার করতে। সেকালের শিক্ষিত, সচেতন, সূক্ষ্ম নাগরিক রুচি তাঁর কাব্যকৃতিতে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করেননি, সেই অভাব দূর হয়েছিল রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিত্রনী উপাখ্যান' কাব্যে। ঈশ্বর গুপ্ত ক্রমক্ষীয়মান প্রাচীনত্ব ও বাড়তে থাকা প্রগতিশীল মনোভাবের এক দ্বিধাতুর কাব্যকর্মী হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকেন। বঙ্কিমী বয়ানেই তাঁর সম্পর্কে আলোচনায় ইতি টানা যায়, "মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালার কবি। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালীর কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই।" সত্যিই বাঙালি "বৃত্রসংহার পরিত্যাগ করিয়া পৌষপার্ব্বণ" চাননি। কিন্তু ঐতিহ্যকে ফিরে পড়তে চাইলে ঈশ্বর গুপ্তকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭ খ্রি. - ১৮৮৭ খ্রি.)

ঈশ্বর গুপ্তর ঐতিহ্যানুসারী ও পুরাতনপন্থী আঙ্গিক নাগরিক রুচির সাধ পুরোপুরি মেটাতে পারেনি। তাঁর ভাবশিষ্য হিসেবেই আবির্ভাব রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। গুপ্তকবির আপাত চটুলতা পেরিয়ে তাঁর কাব্যে বাঙালি খুঁজে পেয়েছিলেন কাঙ্ক্ষিত গভীরতা। যুগসন্ধির সেই দোলাচলে রঙ্গলালই প্রথম তাঁর কাব্যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছিলেন। স্বাজাত্যবোধ, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রথম

রঙ্গলালের কাব্যেই স্পষ্টতা পায়, পরিচ্ছন্ন এক গড়ন ফুটে ওঠে বাংলা কাব্যের। তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান, ঐতিহাসিক বোধকে কাব্যে সঞ্চারিত করা। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ঐতিহাসিক কাব্য বা গাথাকাব্য রচনা করেন। তাঁর প্রধান চারটি কাব্যের প্রত্যেকটিই ঐতিহাসিক ঘটনা ও জনশ্রুতি অবলম্বনে রচিত। পৌরাণিকতা থেকে সরে আসার বিষয়টি নিয়ে স্বয়ং কবির কৈফিয়ৎ আমরা শুনে নিতে পারি তাঁর প্রথম জনপ্রিয় কাব্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৯ খ্রি.)-এর ভূমিকা থেকে—

"বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্ম্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদগুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমন্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, সুধীত্ব এবং সাহিকতাগুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা-প্রতিপাদ্য পদ্যপাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি-প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বনপূর্ব্বক রচিত করিলাম।" এই স্বীকারোক্তি স্পষ্ট বোঝায়, স্বদেশপ্রেম ও জাত্যাভিমানই ছিল রঙ্গপালের কাব্যের মুখ্য চালিকাশক্তি। পূর্ববর্তী গ্রাম্যতাদোষ পরিহার করতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। আর সেজন্যই পাঠকের সামনে মহৎ আদর্শ তুলে ধরার একটা তাগিদ তাঁর কাব্যে দেখতে পাই।

জেমস টডের 'Annals and Antiquities of Rajastan' গ্রন্থে বর্ণিত রাজপুত জাতির বীরগাথা থেকে তিনি 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর বিষয় আহরণ করেছিলেন। উনিশ শতকের শুরুতে নাগরিক বাঙালির চেতনায় যে নতুন মূল্যবোধ ক্রমশ বিস্তারলাভ করছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এই কাব্য বিচার্য। পদ্মিনী তথা রাজপুত হিন্দু কুলবধূর সতীত্ব আদর্শ, পারিবারিক মূল্যবোদ, আত্মাহূতির সাহস-সবটাই আসলে একটা জাতিগত আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে। নব্য জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় ক্রমশ যখন বাঙলার মানুষ অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন, তাঁদের কাছে এই গৌরবগাথা অন্য তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়। মহাকাব্যিক বিস্তারের নিরিখে 'পদ্মিনী উপাখ্যান'সহ মধুসূদন-হেমচন্দ্রের সব কাব্যই সমালোচকদের বিরুদ্ধতা সহ্য করেছে। কারণ আলঙ্কারিক বিচারে যাকে আমরা মহাকাব্য বলে জানি, তাতে প্রধান ভূমিকা নেয় বীররস। এই সকল বাংলা আখ্যানকাব্যে মহাকাব্যিক পরিকল্পনা থাকলেও অন্তঃস্থলে তা বাঙালির পারিবারিকতা ও জীবনাদর্শের কাহিনী হয়ে ওঠে। সেজন্যই ভীমসিংহের শৌর্যের চেয়ে পদ্মিনীর সাহস বেশি গুরুত্ব পায় এই কাব্যে। অন্তঃপুর ছেড়ে নারীর ক্রমশ বদলে যেতে চাওয়া অবস্থান এই সূত্রে ভাবনায় আসে। উনিশ শতকের নারীভাবনা তখনও সম্পূর্ণ দানা বাঁধেনি, কিন্তু সমাজ ও পরিবারে মেয়েদের ভূমিকা বিষয়ে সব চিন্তকই কমবেশি ভাবছেন। বিদ্যাসাগর ক্রমশ স্বমহিমায় আসছেন, আর পদ্মিনীর আত্মবলিদান জাতিগত বলিষ্ঠতার নজির হয়ে উঠছে। এই কাব্যে আলাউদ্দিন খিলজি ও ভীমসিংহের যুদ্ধের চেয়ে ভীমসিংহ উদ্ধারের অংশ বেশি জীবন্ত। পতি উদ্ধারের নিমিত্ত পদ্মিনী যখন সমরসাজে সজ্জিত হয়ে কারাগারের দিকে যাত্রা করছেন, সেইসময়ের বর্ণনার কিছুটা দেখে নেওয়া যাক,

"এখানে পদ্মিনী সতী অন্তরে বিচারি
ধরিলেক সামরিক বেশ মনোহারী।।

দুই স্কন্ধে প্রলম্বিত যুগ্ম শরাসন।
কটিতটে খর করবাল সুশোভন।।
...হইল অপূর্ব্ব শোভা কি কব বিশেষ।
যেন জগদ্ধাত্রী দেবী সমরে প্রবেশ।।”

স্বভাবতই এই অংশ 'মেঘনাদবধ কাব্য'র তৃতীয় সর্গে প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশের ছবি মনে পড়ায়। পয়ারের এই গতানুগতিকতায় প্রবহমানতার জাদুস্পর্শ না থাকলেও এই বর্ণনা মাইকেল পূর্ববর্তী। আর 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যধারা ব্যতীত বাংলা কাব্যে নারীর এহেন উদ্যোগ এর আগে খুব চোখে পড়েনি। এই উপাখ্যানে রাজপুত নারীর জোহরব্রত কোনো মহাকাব্যিক নির্মোহ বর্ণনামাত্রয় পর্যবসিত না হয়ে ভীষণ পক্ষপাতমূলক একটি ন্যারেটিভে পরিণত হয়েছে তৎকালীন যুগচাহিদার ফলে। আত্মবলিদানের আকাঙ্ক্ষা তখন সর্বত্র, সাম্প্রতিক সিপাহী বিদ্রোহের রেশ তখনও কাটেনি। ভারতীয় হিন্দুর প্রাচীন বীরগাথা থেকে কাহিনী নিয়ে রঙ্গলাল আসলে উসকে দিতে চাইলেন সমসাময়িক অস্মিতাকে, পদ্মিনী হয়ে উঠলেন এক মহতী আদর্শের রূপায়ণ। উপনিবেশিত চেতনায় স্বাধীনতার প্রতি দুর্মর আকাঙ্ক্ষাই প্রতিধ্বনিত ভীমসিংহের আহ্বানে—

“সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে
বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে
দেশের উদ্ধার।।”

'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' শুনিয়েছিল সেই বহুপ্রতীক্ষিত ওজস্বী ধ্বনিঝংকার, যার অপেক্ষায় ছিলেন বাঙলার পাঠক। কিন্তু ছন্দের একঘেয়েমি ও শ্লথতা এই কাব্যের, তথা সামগ্রিকভাবে রঙ্গলালের কাব্যপ্রকৃতিরই এক প্রধান অন্তরায়। ছন্দ ও অন্যান্য প্রাকরণিক নিরীক্ষার জন্য যে দক্ষতা প্রয়োজন ছিল, রঙ্গলালের তা আয়ত্ত হয়নি, বাংলা কাব্যকে সেজন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল মধুসূদন অবধি। বস্তুতপক্ষে, রঙ্গলালের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কর্ম্মদেবী' (১৮৬২ খ্রি.) প্রকাশিত হয় মধুসূদনের আবির্ভাবের পর। মধুসূদনের ছাপ আলঙ্কারিক বিন্যাসে কিছু দৃষ্ট হলেও রঙ্গলালের সামগ্রিক কাব্যপরিক্রমা মাইকেলের প্রভাবমুক্ত। এই কাব্যের বিষয়ও রাজপুত আখ্যান থেকে গৃহীত। নর-নারীর প্রণয়মহিমা ও নারীর আত্মবলিদান তথা সতীত্ব সচেতনতা এখানে আরো পরিণত ভঙ্গিতে চিত্রায়িত। প্রথম দুই কাব্যেই নারীকে কাব্যবিষয়ের মধ্যস্থলে নিয়ে আসাটা রঙ্গলালের মনে রাখার মতো কৃতিত্ব। সেইসঙ্গে লক্ষ্যণীয়, 'আদর্শ নারী' গঠনর উনিশ শতকীয় প্রকল্পটির অংশীদার হওয়ার তৎপরতাও। প্রাণয়ীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শোকার্তা কর্মদেবী সহমরণে যাওয়ার আগে তাঁর ভাইকে অনুরোধ করেন, 'কুলকবিবর' যেন 'সতীত্বের সংগীত আখ্যানে ভাই/গান যেন দাসীর চরিত।' রঙ্গলাল (বা মধুসূদনও) সহমরণকে নিশ্চয় সমর্থন করেননি, আসলে জয়গান গাইতে চেয়েছেন সতীত্বের। একসূত্রে বেঁধে লিখতে চেয়েছেন 'সার্থক সমষ্টিজীবন

কাব্য'। জাতি হিসেবে বাঙালির দুর্বলতাও ঠারেঠোরে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এসব রচনায়। এই দুই ভঙ্গিতে রঙ্গলাল ঈশ্বর গুপ্তর উত্তরাধিকার বহন করেন। উপরন্তু তাঁর পরিশীলিত কাব্যবোধ ও আধুনিকতর সমাজসচেতনতা তাঁকে এ বিষয়ে স্বভাবতই খানিক এগিয়েও রাখে।

তৃতীয় কাব্য 'শূরসুন্দরী'ও (১৮৬৮ খ্রি.) রাজপুত নারীর বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী। অনুবর্তনমূলক এই কাব্য বুঝিয়ে দে, রঙ্গলালের কাব্যপরিক্রমায় বিশেষ কোনো বিবর্তন বা উত্তরণের হদিশ খুব পাওয়া যায় না। তুলনায় শেষ কাব্য 'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৭৯ খ্রি.) উড়িষ্যার লোককথা ও কিংবদন্তীর সঙ্গে দৈব মহিমাকে যুক্ত করে লেখার ফলে বেশ কিছুটা ভিন্ন গোত্রের। 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর ভূমিকায় কবি পৌরাণিক অলৌকিকতানির্ভর কাহিনীসমূহ যে 'অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের শ্রদ্ধার্হ' নয়, তেমন এক উপলব্ধির কথা জানিয়েছিলেন। বছর বিশেক পরে এই কাব্য যখন লেখেন, তখন মধুসূদন-হেমচন্দ্রর অলৌকিক প্রতিভায় পৌরাণিকতা এক নতুন মোচড়ে পুনর্বিশ্লিষ্ট হয়েছে। 'কাঞ্চীকাবেরী'তেও দেখতে পাই উড়িষ্যারাজ পুরুষোত্তমের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেন জগন্নাথ ও বলরাম। আর প্রতিপক্ষ কাঞ্চীরাজের পক্ষাবলম্বন করেন গণেশ। এভাবে একটি শিকড়সঞ্চারী ঐতিহ্যকেই নিজের মতো করে ফিরে পড়তে চেয়েছিলেন রঙ্গলাল। রসজ্ঞ পাঠকের বিচারে 'কাঞ্চীকাবেরী' বিষয়বৈচিত্র্য ও গঠনগত নিপুণতায় জনপ্রিয়তম 'পদ্মিনী উপাখ্যান'কে ছাপিয়ে যায়।

কালিদাসের অমরকাব্য 'কুমারসম্ভব'-এর আংশিক অনুবাদ করেছিলেন রঙ্গলাল (প্রকাশকাল ১৮৭২)। 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধরঙ্গলালের এক অমর কীর্তি। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের আদিপর্বে বীটন পঠিত এই প্রবন্ধ আসলে এক খোলা মনের পাঠকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করায়। যিনি পাশ্চাত্য কাব্যাদর্শের শ্রেয়বোধ দিয়ে উদ্বুদ্ধ হতে চান, কিন্তু বিস্মৃত হন না নিজের ঐতিহ্য, নিজের ঐশ্বর্য। আবহমানের বাংলা সাহিত্য তাঁর কাছে পরম শ্লাঘার বিষয়। তিনি সেই সমৃদ্ধ সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করে তোলার পক্ষপাতী, আর সেটা ইউরোপীয় সাহিত্যরুচির স্পর্শ ছাড়া সম্ভব নয়, এ কথা তিনি জানেন। এও জানেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে এই আদানপ্রদান স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখতেই, বিসর্জন দিতে নয়। রঙ্গলালের কবিস্বভাবের অন্তরালে ছিল একটা দৃঢ় প্রত্যয়ী বোধ, এক অবিচলিত স্থিতি। ঈশ্বর গুপ্তর দিশাহীনতার পর এই প্রাজ্ঞ জীবনবোধের স্পর্শ প্রয়োজন ছিল। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, "তিনি জাতিত্বধর্মী বাংলাকাব্যের, বাংলার 'national poetry'র সচেতন পথিকৃৎ।" এই সচেতনতার ফলেই, তিনি প্রথম, অমৃতলাল বসুর ভাষায়, "নব্যবঙ্গের হৃদয়ক্ষেত্র উদ্দীপনার রসে সিঞ্চিত করিয়া দেশহিতৈষণার বীজ বপন করিয়াছিলেন।"

৬.৪ সারাংশ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা কাব্যে আধুনিকতার অগ্রদূত হিসাবে যাঁদের নাম করতে হয়, তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বর গুপ্ত হিসাবে চিহ্নিত

হলেন। তিনি নিজে যে কবিতা লেখেন সেখানে লক্ষ করা যায় আধুনিকতা। দেবদেবীকে তুচ্ছ করে মানুষের কথাই তিনি কাব্যকবিতায় আনলেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করে স্বাদেশিকতার প্রকাশ ঘটালেন, দেবদেবীকে দূরে সরিয়ে রেখে।

৬.৫ অনুশীলনী

১। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে যুগসন্ধির কবি বলা যায় কিনা বিচার করুন।

২। ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার পরিচয় দিন।

৩। জাতীয়তাবাদের সূচনা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'—আলোচনা করুন।

৬.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য়)* : সুকুমার সেন

২। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত* : অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা* (২য় খণ্ড) : ভূদেব চৌধুরী

৪। *বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা*—গোপাল হালদার (দ্বিতীয় খণ্ড)

একক ৭ ❑ মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ প্রস্তাবনা

৭.৩ কবিকৃতি : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন

৭.৪ কবিকৃতি : মধুসূদন দত্ত

৭.৫ সারাংশ

৭.৭ অনুশীলনী

৭.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৭.১ উদ্দেশ্য

বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সূচনার পর বাংলা কাব্যের জগতে জ্যোতিষ্কের মত উজ্জ্বল কবি হলেন মধুসূদন দত্ত। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করে ও মহাকাব্য রচনা করে বাংলার কাব্যজগতকে এক বিশেষ মাত্রায় পৌঁছে দিলো। এই এককে শিক্ষার্থীদের তাঁর সম্পর্কে সচেতন করাই উদ্দেশ্য।

৭.২ প্রস্তাবনা

বাংলা কাব্যের জগতে অসামান্য ও অনন্য হলেন মধুসূদন দত্ত। বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার ও বাংলায় মহাকাব্য রচনার দুঃসাহস দেখালেন তিনিই। সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এই এককে।

৭.৩ কবিকৃতি : মধুসূদন দত্ত

খেউড়, তরজা, আখড়াই-হাফ আখড়াইয় শাসিত বিকল্প সাংস্কৃতিক পরিসর যখন ক্রমশ নব্যশিক্ষিত 'এলিট' বাঙালির কাছে 'স্থূল রুচি'র নামান্তর হয়ে উঠছে, পাঠক মনন সেইসময় উদগ্রীব ছিল বৈদেশিক সংস্কৃতির সম্যক মিশেলে এমন এক ভারতীয়ত্বের ছোঁয়া পেতে, যা পরিশীলিত ভাবনার সমার্থক হবে। বঙ্গদেশের কাব্যচর্চার জগতে মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব কেবল আকস্মিকই নয়, যুগান্তকারী, বৈপ্লবিক। তাঁর কাব্যরচার মূল সময়পর্ব মাত্র তিন বছরের মধ্যে সীমায়িত। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০ খ্রি.)

দিয়ে যে যাত্রার সূচনা, মাত্র চারটি কাব্যে ধূমকেতুর মতো বাংলা কাব্যভাষা, রীতি ও ছন্দের খোলনলচে বদলে দিয়েছিলেন তিনি। সাগরদাঁড়ির অভিজাত দত্ত পরিবারের সন্তান মধুসূদন হিন্দু কলেজের ছাত্রদ্যাতেই স্বপ্ন দেখেছিলেন মহাকবি হবার। বন্ধু গৌরদাস বসাকের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, সেই বয়েসেই মধুর সাগরপারের বিলেত যাবার বাসনা ও ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনার স্পৃহা ঠিক কী পরিমাণ আগ্রাসী ছিল। গ্রীক মহাকাব্যসহ ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রতিটি ধারা বিষয়ে অত্যধিক সচেতন মধুসূদন যৌবনের প্রারম্ভে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে পিতার বিরাগভাজন হন। বেশ কিছুদিনের মাদ্রাজ প্রবাস, বিদেশিনীর সঙ্গে প্রণয়-পরিণয় ওঘর ভাঙা, পুনরায় আরেক বিদেশিনীর পাণিগ্রহণ, ইংরেজি কাব্য রচনা করে তার ব্যর্থতা অনুধাবন—মাইকেলের ব্যক্তিক জীবন তাঁর কাব্যের চেয়ে কম নাটকীয় নয়। আর এসবেরই পরোক্ষ প্রভাব কাব্যচর্চায় পড়েছিল। মহাকবি কালিদাস, ভাস, ভবভূতির আভিজাত্য যেভাবে তাঁর রচনায় ছায়া ফেলেছে, কৃত্তিবাস-কাশীরাম-ভারতচন্দ্র তাঁকে প্রভাবিত করেছেন নানাভাবে, তেমনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের দিকপালরা অনবরত আত্মীকৃত হয়েছেন তাঁর কাব্যকৃতিতে। পয়ার-ত্রিপদীর শৃঙ্খলাবদ্ধ চলনকে মাইকেল স্বতোৎসারিত ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসেবে ভেবেছিলেন। আর সেজন্যই বাংলা সাহিত্য অন্ত্যমিলের বাধকতা থেকে অমিত্রাক্ষরের প্রবহমানতায় মুক্তি খুঁজলো। ১৮৬০-এ প্রকাশিত 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' মধুসূদনের প্রতিনিধিস্থানীয় কাব্য নয় অবশ্যই, কিন্তু সুন্দ-উপসুন্দের গল্প ও বিষ্ণুর মোহিনী মূর্তিধারণের আখ্যান অবলম্বন ক'রে রচিত এই কাব্যে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। এই কাব্য বসতুত নতুন ছন্দস্পন্দের নিরীক্ষাকেই সামনে আনে। ভারতীয় হিন্দু পুরাণের আজম অনুরাগী মাইকেল পুরাণ সম্পর্কে লিখেছিলেন, "It is full of poetry. A fellow with an inventive head, can manufacture the most beautiful things out of it." সুন্দ-উপসুন্দের মনোহারিণী তিলোত্তমাকে নিয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও মৃত্যু—এই বিষয়টুকু নিয়ে যে একটি পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্য রচিত হতে পারে না, এ কথা তিনি ভালোভাবেই জানতেন। আর তাই এই আখ্যানকাব্য মহাকাব্যিক সংহতি ও নির্মোহতা লাভ করেনি। নবআহরিত ছন্দের ভারবহন ক্ষমতা যাচাই করতেও তিনি চেয়েছিলেন। এই কাব্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এর খণ্ডচিত্রগুলি। তাদের সমাহারে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' পাঠক সমাদর লাভ করে। পাশ্চাত্য রচনারীতির প্রভাব এতে দুর্লভ নয়, আর এই প্রাচ্য-প্রতীচ্য ভাবধারার সার্থক সম্মিলন বাংলা কাব্যের ইতিহাসে আধুনিকতার পথ প্রশস্ত করলো। মাইকেল পেলেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত মহাকাব্যটি রচনার প্রাথমিক আধার, যা বদলে দেবে বাংলা তথা ভারতীয় কাব্য সাহিত্যের দিশা।

'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১ খ্রি.) বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের আখ্যান থেকে তার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছিল। ভারতীয় জনমানসে পরম শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামচন্দ্র এই কাব্যে সম্পূর্ণ বিপরীত ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত। রীতিমতো কৌশলী, খল, সুবিধাবাদী এক চরিত্র হিসেবে 'ভিখারী রাঘব' সীতা উদ্ধারের অছিলায় আক্রমণ করেন রাবণের স্বর্ণলঙ্কা, আর দশানন মহাবলী রাবণ এই কাব্যে দেশপ্রেমিক, সৎ ও মহৎ এক যোদ্ধা হিসেবে দেখা দেন, যাঁর ট্র্যাজেডি এই কাব্যের সম্পদ। দশানন পুত্র বাসববিজয়ী

'ইন্দ্রজিৎ' মেঘনাদকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে কৌশলে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা—এই কাব্যের মুখ্য বিষয়। এরই আয়োজন ও এই মর্মান্তিক ঘৃণ্য হত্যা পরবর্তী ঘটনাসমূহ নয় সর্গে বিস্তৃত বিপুলায়তন মহাকাব্য জুড়ে বর্ণিত। জাতীয় ভাবধারার সম্পূর্ণ উলটো পথে হেঁটে মাইকেল যেভাবে 'অধম রাম'কে দেখালেন, তাতে এই কাব্য যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাবে, এটাই স্বাভাবিক। যাঁরা 'মেঘনাদবধ কাব্য'র গঠনকৌশল, শব্দচয়নের মুন্সীয়ানা, ছন্দের অসামান্যতা নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেননি, তাঁদেরও অনেকেরই এই উপস্থাপনভঙ্গি নিয়ে আপত্তি ছিল। কিন্তু এই কাব্য আসলে রামকথার এক বিনির্মাণ। মহাকাব্যের রাম চরিত্রটি যে সমালোচনার উর্ধ্বে আসলে নয়, বরং মধ্যযুগের সমগ্র ভারতীয় সাহিত্য জুড়েই যে এই চরিত্রের একরৈখিক বিচারের একটি সমান্তরাল উল্টোস্রোতও ছিল, তা আমরা বাংলায় চন্দ্রাবতী বা হিন্দিতে তুলসীদাসের কাব্য থেকে আঁচ করতে পারি। মধুসূদদন তারই একটি ছাঁচভাঙা রূপায়ণ ঘটালেন। আসলে রঘুপতি রামের চরিত্রে কালিমালেপন নয়, মহাকাব্যিক একটি চরিত্রকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা 'মেঘনাদবধ কাব্য'। আধুনিক মানস, ভালো-মন্দের সরলীকৃত বিভাজনে কোনো বিষয়কে দেখার যে পুরনো অভ্যেস, তা থেকে ক্রমে সরে আসছিল। আর সেজন্যই মূল মহাকাব্য যে প্রশ্নগুলির সম্ভাবনা অঙ্কুরে রাখা ছিল, একটি হত্যাকে কেন্দ্র করে সেই প্রশ্নগুলোই আমাদের সামনে আনতে চাইলেন আধুনিক এক মহাকবি।

দেশজ পুরাণ-মহাকাব্যের শিকড়কে পুনরায় নতুন আলোতে দেখবার চাহিদা আধুনিক শিক্ষার একটি জরুরি দিক। মধুসূদন বারংবার ভারতীয় ঐতিহ্যকে বিভিন্ন কোণ থেকে আলো ফেলে পড়তে ও পড়াতে চেয়েছিলেন। দশানন রাবণ ও ইন্দ্রজিতের ভূখণ্ড রক্ষার প্রাণপণ সংগ্রাম উপনিবেশিত ভারতভূমির স্বাধীনতাকামনার নিরিখেও পঠিত হয়েছিল। দেশদ্রোহী বিভীষণের সঙ্গে মেঘনাদের কথোপকথন ধর্ম-অধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, নৈতিক-অনৈতিকের সেইসব প্রশ্নই আমাদের সামনে তুলে ধরে, যা সমসময়ের স্বদেশপ্রীতির বিচারে সত্য, আর নব্যশিক্ষিত আধুনিক মনের পুরাতনপন্থী মূল্যবোধের অনড়তাকে প্রতিপ্রশ্ন করবার অভ্যেসের নিরিখে জীবন্ত।

'মেঘনাদবধ কাব্য' শুরুই হয় এমন এক ঘটনা দিয়ে, যার অস্তিত্ব বাল্মীকি রামায়ণে নেই। রাবণ-চিত্রাঙ্গদার পুত্র বীরবাহু, 'অমরবৃন্দ যার ভুজবলে কাতর' রামের হাতে যুদ্ধে নিহত হন, আর বিধ্বস্ত-শোকাতুর রাবণ যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। মহাকাব্যিক রীতি মেনে 'অমৃতভাষিণী' দেবী সরস্বতী ও 'মধুকরী কল্পনা'র বন্দনা করে কথক শুরু করেন এই কাব্য। বঙ্গকাব্যের পাঠক সবিস্ময় প্রত্যক্ষ করেন, এ যাবৎ অনাস্বাদিত এক মন্দ্রগম্ভীর নিবেদন—"কোন বীরবরে বরি সেনাপতিপদে/পাঠাইলা রণে পুন রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি।"

প্রথম সর্গের শেষেই ভাই বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ অবগত হয়ে মেঘনাদ প্রমোদ উদ্যান ত্যাগ করে এসে পৌঁছোন পিতার সমীপে। রাবণকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত করে তিনি রণসাজে সজ্জিত হতে চান। রাবণের পরামর্শ মেনে মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করতে উদ্যোগী হন, তাঁর ইষ্টদেব বৈশ্বানর অগ্নির

বরপ্রাপ্ত হয়ে তিনি বধ করবেন রাম-লক্ষ্মণকে। এইভাবে কর্তব্যের খাতিরে প্রমোদ-উদযাপন ছেড়ে যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতিই সেইসময়ের যুগগত চাহিদা। মধুসূদনের কৃতিত্ব এখানেই, যে তিনি এই ঔপনিবেশিক চেতনাকে তাঁর কাব্যে খুব সুচারুভাবে সঞ্চারিত করেন। মোটা দাগের দেশপ্রেমের আবেগজর্জর কাব্যের সমসাময়িক আবেদনমাত্রে নয়, 'মেঘনাদবধ কাব্য'র প্রাসঙ্গিকতা চিরন্তন হয়ে থাকে তার গভীর ট্র্যাজেডিতে। পরাজয় আসন্ন ও নিশ্চিত জেনেও আত্মবলিদানে পিছপা না হওয়া দেশপ্রেমিকের পৌরুষ ঝলকে ওঠে যখন রাবণ বলেন—"অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি।"

এভাবেই দেবকুলের ষড়যন্ত্র, প্রমীলার বীরাঙ্গনা মূর্তি, সীতার অসহায়তা—একই ছন্দের আধারে রচিত হলেও ছন্দস্পন্দে তা সর্গ থেকে সর্গে, বিষয় থেকে বিষয়ে আলাদা। দায়িত্বপালনের তাগিদে ও 'জন্মভূমি রক্ষাহেতু' সেনাপতিপদ গ্রহণের পর সমগ্র লঙ্কা যখন অভিনন্দিত করেন মেঘনাদকে, প্রথম সর্গের অন্তিমের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি জুড়ে গাথা সেই দৃশ্যে পাওয়া যায় অভাবনীয় এক জাঁকজমক, বাংলা সাহিত্যের পরিসরে যার তুলনা তার আগে সম্ভবত নেই—

"গুণি-গণ শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র-কেশরী,
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদো
ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃ-পতি
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি।
আকাশদুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ।...
বাজিল রাক্ষস বাদ্য, নাদিল রাক্ষস,—
পূরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।"

বীরবাহুর মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করে দশানন রাবণ যখন স্বগতোক্তির সুরে বলেন, "যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার/প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে/সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে/জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?/যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে!"—এই প্রতিক্রিয়া সেইসময়ের এক সামূহিক চেতনাকে প্রতিফলিত করে। প্রমীলার পেলবতার সঙ্গেই বীরাঙ্গনাবেশ ধারণ ও "রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী/আমি কি ডরাই সখি, ভিখারি রাঘবে"-র ন্যায় দৃপ্ত ঘোষণায় প্রকৃতপক্ষে সেই কাঙ্ক্ষিত পুরুষকারের জয়ধ্বনিই শ্রুত হয়, ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদী চেতনায় যারা আবাহন ছিল স্বাভাবিক। একইসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পাঠকবর্গ এমন এক উচ্চরুচির তারে বেঁধে নিলেন তাঁদের পঠন-অভিজ্ঞতাকে, আখড়াই-খেউড় শাসিত সেইসময়ে যার প্রয়োজন ছিল প্রশ্নাতীত। 'প্রমীলার পরাক্রম' দর্শাতে কবি যখন তাঁর বামাদলের রণোন্মত্ত অগ্রগতি বর্ণনা করেন, চিত্রধর্মিতা ও আলঙ্কারিক দক্ষতা বাংলা ভাষার ব্যবহারিক ব্যাপ্তিকে অনেকদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে দেয়—

"যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশ দিশ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জো শুনিলা চমকি
কোদন্ড-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া দড়বড়ি,
হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝনঝনি!"

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদ ও বিভীষণের কথোপকথন ধর্মাধর্মের ভেদগুলিকে কাব্যিক মোড়কে উন্মোচন করে, আর মাইকেলের সবচেয়ে বড় সহায় তাঁর ভাষা, তাঁর অনবদ্য উপমা চয়ন—"স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থানুর ললাটে/পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি ধুলায়?"—এই উচ্চারণে কেবল আলঙ্কারিক চাতুর্য নয়, সুষমা রয়েছে। রয়েছে অনবদ্য পরিমিতিবোধ। কিন্তু মহাকবির নির্মোহতা-নিরপেক্ষতা মাইকেলের অনায়ত্ত ছিল। আয়ত্ত করা তাঁর কবিস্বভাবের অনুকূলও ছিল না। তাই এক আধুনিক মনন-উপযোগী ব্যাখ্যায় তিনি পিছিয়ে থাকেননি, রামায়ণকে পড়ার ও তার মধ্যে লুকোনো সম্ভাবনাগুলির গিট খুলবার চেষ্টাতেই এই আখ্যানকাব্য সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের আধুনিক যুগকে অনেকটা পরিণত করেছিল।

এই নবব্যাখ্যার সূত্রেই আসে, বিশেষজ্ঞদের মতে মাইকেলের সবচেয়ে পরিণত কাব্য 'বীরাঙ্গনা কাব্য'র (১৮৬২ খ্রি.) প্রসঙ্গ। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'ও বাংলার বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ। উনিশ শতকীয় চিন্তাবিদদের একটা বড়ো অংশ সমাজ ও পারিবারিক পরিসরে নারীর অবস্থান নিয়ে জরুরি আলোচনা করে গেছেন। এই দুই কাব্যই সেই ধারায় গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ব্রজাঙ্গনার সাঙ্গীতিক সুষমার চেয়ে বীরাঙ্গনার বহুমাত্রিকতা এই প্রবাহে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পৌরাণিক ছদ্মবেশে এই পত্রকাব্য রচিত। রোমক কবি ওভিদের 'এপিস্তুলাই হেরইদুম'-এর আঙ্গিকটি মাইকেল গ্রহণ করেন। এগারোজন পৌরাণিক-মহাকাব্যিক নারী তাঁদের স্বমী বা প্রেমিকাকে কাল্পনিক পত্র লেখেন এই কাব্যে, যাদের মূল আসলে নিহিত ভারতীয় পুরাণেই। আর এই সব পত্রে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নারীর, নারীত্বের কিছু মৌলিক ও চিরন্তন প্রশ্ন। শকুন্তলা, কেকয়ী, তারা, জনা, দ্রৌপদী প্রমুখের বয়ানে কবি আসলে সেই প্রশ্নগুলিই তুলে ধরেন, যা সমসাময়িক অন্তঃপুরের ক্রমবিবর্তমান নারীপ্রশ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত। এই কাব্যে কেকয়ী স্বামী ও রাজা দশরথকে তাঁর প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অভিযোগে 'পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি' সম্বোধনে অভিহিত করেন। বৃহপতিপত্নী তারা পুত্রপ্রতিম শিষ্য সোমদেবকে দুঃসাহসী পত্রে শরীরী আহ্বান জানান যাবতীয় কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলে—"কলঙ্কী শশাঙ্ক তোমা বলে সর্ব্বজনে/কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে/তারানাথ; নাহি কাজ বৃথা কুলমনে।" দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর পত্নীত্ব লাভ করলেও তিনি কায়-মন-বাক্যে বরণ করেছিলেন কেবল অর্জুনকে। এই চয়নের অধিকার গুরুত্বপূর্ণ। আর স্বয়ম্ভর সভায় উদ্ধত ক্ষত্রিয়কুলকে শিক্ষা দিতে অগ্রসর ব্রাহ্মণবেশী ধনঞ্জয় যে কথাগুলি সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীকে বলেন, সেই শব্দগুলিই উনিশ শতকের ক্রমবিবর্তমান দাম্পত্যের ধারণাটির নিরিখে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে—

"আসন্নকালে সে সুকথাগুলি
জপিয়া মরিব দেব, মহামন্ত্রজ্ঞানে।
কহিলে সম্বোধি মোরে সুমধুর স্বরে;
'আশারূপে মোর পাশে দাঁড়াও, রূপসি।
দ্বিগুণ বাড়িবে বল চন্দ্রমুখ হেরি
চন্দ্রমুখি! যতক্ষণ ফণীন্দ্রের দেহে
থাকে প্রাণ, কার সাধ্য হরে শিরোমণি?"

—নারী-পুরুষের এই পারস্পরিকতা ও নির্ভরতার দিকটি উক্ত শতকের নবজায়মান ভাবধারার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। পত্রকাব্যের অব্যবহৃত আঙ্গিকে, প্রাচ্য ভাবধারা ও বিশ্বাসকে সঙ্গী করে সমসাময়িক মূল্যবোধের অনড়তাকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের বহিরাঙ্গিক পরিগ্রহণে এবং অসামান্য সংহতিতে এই কাব্য বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে অতুলনীয় এক চিরকালীন সম্পদ। এতো বহুস্তরীয় একটি কাব্যের মাধ্যমেই মধুসূদনের কাব্যজীবনের মূল পর্যায়টি সমাপ্তি লাভ করে। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' শিরোনামে মুখ্যত তাঁর সনেটগুচ্ছ কৃত্তিবাস, কাশীরাম, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, হুতোম প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের নক্ষত্রদের পাশাপাশি কালিদাস প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের দিকপালদের সম্পর্কেও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। ইউরোপীয় সাহিত্যের মহাকবিরা প্রণতি লাভ করেছেন এইসব সনেটে। অষ্টক-ষটকের আপাত একরৈখিক চলনকে জাদুবলে মাইকেল বারবার ব্যবহার করেছেন বৈচিত্র্যসাধনে। আর এই সনেটগুচ্ছ কিংবা 'বঙ্গভূমির প্রতি', 'আত্মবিলাপ' ইত্যাদি টুকরো কবিতায় জোরালো হয়েছে ব্যক্তিক অনুভূতির স্পর্শ পাওয়া গীতিকবিতার সুর। বাংলার প্রথম সার্থক গীতিকাব্য বিহারীলাল রচনা করলেও মাইকেল তার পথ তৈরি করেছিলেন বললে ভুল হয় না। এই ক্ষণজন্মা মহাকবি বাংলা কাব্যক্ষেত্রকে এতোটাই সমৃদ্ধ করেছিলেন অতি অল্প সময়ে, যে বঙ্কিম তাঁকে 'জাতীয় কবি' আখ্যা দিতে দ্বিধান্বিত হননি—"সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও। তাহাতে নাম লেখ 'শ্রীমধুসূদন'।" স্বভাবতই, মহাকালের কষ্টিপাথরে সসম্মান উত্তীর্ণ সেই-'মধুচক্র'র সুধা গৌড়জন অদ্যাবধি পান করে তৃপ্ত।

৭.৪ কবিকৃতি আলোচনা : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা কাব্যকবিতার জগতে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু জাতীয়তার বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছিলেন, একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়। মাইকেলের চেয়ে প্রতিভায় উন হলেও জনপ্রিয়তার বিচারে সেইসময় তিনি নেহাত পিছিয়ে ছিলেন না। যে দক্ষতায় মাইকেল একটি যুগের সূচনা করেছিলেন, হেমচন্দ্র সেই যুগেরই সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। মহাকাব্য-আখ্যানকাব্যর এই যুগে হেমচন্দ্রর সাহিত্যকীর্তিতে

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের যুগোপযোগী মেলবন্ধন নব্যশিক্ষিত বাঙালি মানসকে পরিতৃপ্তি দিয়েছিল। এই মিশেল মাইকেলের কাব্যে অনেক সূক্ষ্ম ও সঙ্গত ছিল, কিন্তু তাঁর বিদ্রোহী কবিস্বভাব সবসময় প্রথাগত ধারণায় আস্থাশীল পাঠককে অপার আলঙ্কারিক ঐশ্বর্য দিয়েও তৃপ্ত করতে পারেনি। হেমচন্দ্র তাঁদের কাছে স্বভাবতই অনেক কাছের কবি ছিলেন। মহাকাব্য ছাড়াও খণ্ডকাব্য, ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা রচনাতেও পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিলেন তিনি।

হেমচন্দ্রর প্রথম কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিনী' (১৮৬১ খ্রি.) বন্ধু শ্রীশচন্দ্র ঘোষের আত্মহত্যার প্রতিক্রিয়ায় রচিত হয়েছিল। পিতৃকুলের সঙ্গে নব্যভাবাদর্শে দীক্ষিত যুবক শ্রীশচন্দ্রর আদর্শনৈতিক সংঘাত তাঁকে আত্মবিনাশের পথে ঠেলে দেয়। তেইশ বছরের সংবেদনশীল কবিমনে এই ঘটনার প্রভাবে আমরা একটি অপরিণত কাব্য পাই। কাব্যের নায়ক নরসখা, দেশের ও দশের চিন্তায় সারাক্ষণ মগ্ন থাকেন। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তিনি দেশের ক্রম অধঃগতিকে ঠেকাতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। নরসখার এই মর্মান্তিক পরিণতিতে তাঁর পিতা-মাতা ও স্ত্রী, এমনকি প্রিয়বন্ধু কমলও প্রাণত্যাগ করেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একে তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'য় বলেছেন, "পাইকারি হারে ট্র্যাজেডি"। 'চিন্তাতরঙ্গিণী' সাঁতরে পার হতে না পেরে এই পরিণতি সকলের। বোঝাই যায়, এই কাব্যের বিষয়বস্তু, আজকের নিরিখে, অতীব হাস্যকর। আর মধুসূদনের তিলোত্তমা-মেঘনাদবধ প্রকাশিত হওয়ার পরও কী কারণে হেমচন্দ্র পুরাতনী পয়ার-ত্রিপদীর আশ্রয়েই রইলেন' তার ব্যাখ্যা মেলে কাব্যের ভূমিকায় নবীন সাহিত্যিকের একটি স্বীকারক্তিতে, "কবিতাকেশরী রায়গুণাকরের পর কবিতা রচনা করিয়া যশঃলাভ করা অসাধ্য। স্পষ্ট বোধা যায়, মাইকেলের কবিখ্যাতি দিকবিদিক তোলপাড় করলেও হেমচন্দ্র তখনও সমসাময়িকতা থেকে কিঞ্চিৎ দূরেই ছিলেন।

'বীরবাহু কাব্য' (১৮৬৪ খ্রি.) একটি প্রোপাগাণ্ডিস্ট কাব্য। ভারতবর্ষ যুগে যুগে যেভাবে বহিরাগত শত্রুর হাতে নিপীড়িত হয়েছে, তার কারণ হিসেবে কবি দায়ী করেন হিন্দুজাতির পারস্পরিক ভেদাভেদকে। মুসলিম আগ্রাসন, মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়া, এইসব ইসলামি অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে জঙ্গী জাতীয়তাবাদের স্টাইলে এই কাব্য লিখিত। নায়ক বীরবাহু নামের এক রাজপুত্র। তিনি, এমনকি ঔরঙ্গজেবকেও হত্যা করে দিল্লীর অধীশ্বর হন। বোঝাই যাচ্ছে, এই কাব্যের সঙ্গে ইতিহাসের তথ্যের দূরদূরান্তেও কোনো সমীপ্য নেই। কবিও "উপাখ্যানটি আদ্যন্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাসমূলক নহে।" বলে ভূমিকায় কৈফিয়ৎ দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু এই বিচিত্র আখ্যান এমন কৈফিয়তের পরেও আদ্যন্ত অনৈতিহাসিক, এমনকি কল্পনা হিসেবেও খুবই নিচু মানের প্রতিভাত হয়। আজকের যুগের বিচারে তো এই কাব্য ভয়াবহরকম বিরক্তিকর। কিন্তু, পাঠপ্রতিক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে একটু বোঝার চেষ্টা করলে ধরতে পারবো, মাইকেল কাব্যরচনায় অসামান্যতা দেখালেও প্রত্যক্ষত কোনো স্বদেশপ্রীতির কাব্য রচনা করেননি। 'মেঘনাদবধ কাব্য' যতোই রাবণের দেশপ্রেমকে উপনিবেশিত ভারতের রূপক হিসেবে পাঠ করতে প্রেরণা দিক,

'বীরাঙ্গনা কাব্য' যতোই সমসাময়িক অন্তঃপুরেরই কথা বলুক, সেই গভীরতর ব্যাখ্যার চেয়ে অনেক সহজ ছিল 'বীরবাহু কাব্য'র সরাসরি জাতীয়তাবোধোদ্দীপক ভঙ্গি। যে অলীক স্বপ্ন আর সামূহিক আকাঙ্ক্ষা এস যুগকে চালিত করছিল, 'বীরবাহু কাব্য' তার খুব অক্ষম প্রতিনিধি। যে কারণে 'শরৎ-সরোজিনী' বা 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' জনপ্রিয় হয়েছিল বঙ্গরঙ্গমঞ্চে, সেই একই কারণে 'বীরবাহু কাব্য'র পাঠপ্রতিক্রিয়ার ইতিহাস আমাদের কাছে জরুরি।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বাধিক চর্চিত কীর্তি স্বভাবতই 'বৃত্রসংহার কাব্য' (প্রথম খণ্ড-১৮৭৫ খ্রি., দ্বিতীয় খণ্ড-১৮৭৭ খ্রি.)। ইতিমধ্যে তাঁর কবিমানস অনেক পরিণত, আর ভঙ্গি সংহতি হয়ে উঠেছে। ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রাসুর বধের পৌরাণিক আখ্যান এর বিষয়বস্তু। কিন্তু এই কাব্যের ছত্রে ছত্রে সমসাময়িক দেশপ্রেম ও আত্মবলিদানের ছায়াপাত স্বভাবতই ঘটেছিল। 'মেঘনাদবধ কাব্য'য় যে তাতকতার ছায়া বড্ড ক্ষীণ, আর ক্ষীণ বলেই সেই কাব্য চিরন্তনতার স্বাদ বহনে সমর্থ, 'বৃত্রসংহার-এ সেই ছায়া তুলনায় দীর্ঘ। কিন্তু সা স্বত্ত্বেও এই কাব্য জাতীয়তার মন্ত্র শোনাতেই কেবল নামেনি, এর আলঙ্কারিক আবেদন সেই তাৎক্ষণিকতাকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছে, একথা আজ নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। মাইকেলের মৃত্যুর পর যেকারণে বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকে সেই স্থলাভিষিক্ত করতে দ্বিধা করেননি, "বঙ্গকবি-সিংহাসন শূন্য হয় নাই। এ দুঃখ সাগরে সেইটি বাঙালির সৌভাগ্য নক্ষত্র। মধুসূদনের ভেরি নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক।" এই উক্তি 'বৃত্রসংহার কাব্য' প্রকাশের দু'বছর পূর্বে করা; বোঝা যায়, হেমচন্দ্রের কবিপ্রতিভার উপর বঙ্কিমের আস্থা ছিল। অসুররাজ বৃত্র মহাদেবের প্রসাদে পুষ্ট হয়ে স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। উপরন্তু পত্নী ঐন্দ্রিলার প্ররোচনায় পুত্র রুদ্রপীড়কে দিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী শচীকে হরণ করান। এই অনৈতিক কান্ডে ক্রুদ্ধ দেবাদিদেব তাঁর আনুকূল্য প্রত্যাহার করলে আত্মত্যাগী ঋষি দধিচীর অস্থিনির্মিত বজ্র দিয়ে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে হত্যা করেন। নিঃসন্দেহে মহাকাব্যিক বিশালতা ও ওজস্বিতার উপযোগী কাহিনী নির্বাচন করলেও চরিত্রসৃষ্টির গভীরতা ও ছন্দ প্রয়োগের দক্ষতার অভাবে এই কাব্য 'খাঁটি মহাকাব্য' হয়ে উঠতে পারেনি বলে বিশেষজ্ঞরা মত ব্যক্ত করেন। এই কাব্যের চরিত্রচিত্রণে 'মেঘনাদবধ কাব্য'র ছায়াপাত লক্ষ্য করেন কেউ কেউ। কিন্তু ছন্দব্যবহারের ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র নিরীক্ষামূলক অবস্থান নেন। তিনি মাইকেলের পর অমিত্রাক্ষরের ক্রমাগত ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই এই কাব্যে খুব সচেতনভাবে ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায়। অমিত্রাক্ষর ছন্দও এতে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু তাকে কাঙ্ক্ষিত প্রবহমানতায় তিনি সবসময় মুক্তি দিতে পারেননি। পয়ার প্রভৃতি অন্যান্য ছন্দও স্থানবিশেষে লাগসই হলেও সামগ্রিক বিচারে মহাকাব্যিক বিশালতাকে ধারণ করতে সমর্থ হয়নি। কিন্তু এই গীতল পেলবতাই বেশ কিছু অংশে এতোই মনোরম ছিল, যে রবীন্দ্রনাথ প্রথমদিকের সমালোচনায় 'বৃত্রসংহার কাব্য' কে মাইকেলের মহাকাব্যের চেয়ে উন্নত বলেন। সাহিত্যের আদি ইতিহাসকার রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাদের জানান, হেমবাবু মাইকেল প্রণীত 'মেঘনাদবধ কাব্য'র টীকা রচনা করেছিলেন। তখনই সম্ভবত এই জাতীয় মহাকাব্য রচনার তাগিদ অনুভব করেন। এই সটীক সংস্করণের ভূমিকায় হেমচন্দ্র অগ্রজ কবির সাহিত্যপ্রতিভা স্বীকার করে

নিয়েও কিছু স্থানে রচনাগত কয়েকটি ত্রুটির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। যার মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো, রাম-রাবণ বিষয়ে হিন্দু পৌরাণিক সংস্কারের যে বিপ্রতীপ ধাঁচ মধুসূদন তাঁর কাব্যে এনেছিলেন, সেটির বিরোধিতা। হেমচন্দ্রের মতে, এই বিষয়টি জাতীয় ভাবের পরিপন্থী, আর সেজন্যই যাবতীয় অসামান্যতা ও অভিনবত্ব সত্ত্বেও এই কাব্য 'জাতীয় কাব্য' হয়ে উঠতে পারেনি। সেজন্যই বস্তুত হেমচন্দ্রের মহাকাব্য অসামান্যতা ও অভিনবত্ব সত্ত্বেও এই কাব্য 'জাতীয় কাব্য' হয়ে উঠতে পারেনি। সেজন্যই বস্তুত হেমচন্দ্রের মহাকাব্য রচনায় অগ্রসর হওয়া। আর মাইকেলের কাব্যের চরিত্রসমূহ এতে ছায়াপাত করলেও মেঘনাদবধ-এর চরিত্রগুলির জটিলতা ও ব্যাপ্তি হেমচন্দ্রে নেই। তুলনায় এর চরিত্রচিত্রণ অনেকটাই একরৈখিক। তবে জাতীয় ভাবোদ্দীপনের আদর্শগত দিক থেকে এই কাব্য সেইসময় সাড়া জাগিয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে কাব্যের কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। বৃত্রাসুর কর্তৃক পরাস্ত হতোদাম দেবকুলকে উজ্জীবিত করতে সেনাপতি স্কন্দ বলেন—

> "ধিক দেব! ঘৃণাশূন্য অক্ষুব্ধ হৃদয়ে
> এতদিন আছ এই অন্ধতম পুরে,
> দেবত্ব, ঐশ্বর্য, ক্ষুধা স্বর্গ তেয়াগিয়া
> দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজলি।।"

এই অংশ স্পষ্টতই নব্যজাতীয়তার বোধে উদ্দীপিত বঙ্গমানসের প্রতিফলন। নবজাগ্রত স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রেমের প্রতিধ্বনিই অগ্নিদেবের কণ্ঠে—"প্রকাশি অমরবীর্য, সমরের স্রোতে

> ভাসিব অনন্তকাল, দনুজ-সংগ্রামে
> দেবরক্ত যতদিন না হইবে শেষ!"

দধিচীর মহান আত্মত্যাগ আসলে আত্মবলিদানে উন্মুখ উপনিবেশিত মানসেরই পরিচায়ক। তাই বিষণ্ণ আশ্রমবাসীকে নিজের প্রাণত্যাগের মর্ম বোঝাতে উচ্চারিত ঋষিবাক্য নিছক শৈল্পিকতার পরিমাপকে বিচার্য হয়ে থাকে না আর—

> "জগৎ-কলাণ-হেতু নরের সৃজন,
> নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম পালনে,
> নিঃস্বার্থ শিক্ষার পথ এ জগতী-তলে।"

—এভাবেই ন্যাশনালিজম ও হিউম্যানিজমের মিশেলে কাব্যটি সমসময়ের আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। এই কাব্যের, সেইসময়, এমনকি 'মেঘনাদবধ কাব্য'কেও জনপ্রিয়তায় ছাপিয়ে যাওয়ায় আশ্চর্যের কিছু নেই। চরিত্রচিত্রণে হেমচন্দ্র পুরুষ অপেক্ষা নারীচরিত্র সৃজনে অধিক দক্ষতার পরিচয় দেন। ইন্দ্রাণী শচী, বৃত্রাসুর পত্নী ঐন্দ্রিলা এবং রুদ্রপীড়ের স্ত্রী ইন্দুবালা—এই মহাকাব্যের প্রধান তিন নারীচরিত্র। এঁদের মানবীয় দ্বন্দ্বের রূপায়ণে তো বটেই, রতি বা চপলার মতো গৌর চরিত্রের আচরণ প্রকাশেও কবির যত্ন

চোখে পড়ার মতো। সবমিলিয়ে ভাষাগত ত্রুটি বিচ্যুতি এবং ছান্দিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও 'বৃত্রসংহার কাব্য' হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অবদান।

'ছায়াময়ী' নামের একটি খণ্ড কাব্য রচনা করেন হেমচন্দ্র। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র আভাস পাওয়া যায় তাতে। কিন্তু বাঙালি পাঠকের কথা চিন্তা করে তিনি এই কাব্যে খ্রিষ্টীয় পুরাণকে হুবহু অনুসরণ করেননি। 'দশমহাবিদ্যা' কাব্যের আধার ভারতীয় পুরাণ হলেও এতে ক্রমবিকাশবাদের মতো জটিল পাশ্চাত্য তত্ত্বের মিশেল ঘটানোর চেষ্টা করায় কাব্যটি অসঙ্গতিদোষে দুষ্ট হয়েছে। তবে এই কাব্যদ্বয়েও তাঁর কবিপ্রতিভার কিছু পরিচয় স্থানবিশেষে মেলে। তাঁর 'কবিতাবলী'র দুই খণ্ড অনেকসময় বাংলা গীতিকবিতার সুদর যেমন বাজিয়ে যায়, তেমনি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনায় হেমচন্দ্রর বিশেষ ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য করি। তাঁর এই উপেক্ষিত দিকটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই পর্যায়ের আলোচনায় ইতি টানবো। বাঙালিজাতির দ্বিচারিতা ও কর্মোদ্যমের দৈন্য নির্দেশ করে 'দাঁতভাঙা' কাব্য'র এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন,

"বাঙালি অপূর্ব জাতি বিষম বুকের ছাতি
সাহসে সংবাদপত্র লেখে;
মল্লভূমি মুদ্রালয় একাকী অকুতোভয়
কল্পনায় কত যুদ্ধ দেখে।
ঘরে যদি শিশু কাঁদে সম্পাদক ঘোরনাদে
ছুটে গিয়া কার্ণিসে দাঁড়ায়,
বগলে কাগজ আঁটি কলম ঢাকের কাঠী
বর্গী এলো বলিয়া চেঁচায়।"

সাবলীল এই ব্যঙ্গ কোনোভাবেই অপরিশীলিত নয়। ঈশ্বর গুপ্ত যে পরিমিতিবোধের পরিচয় সবসময় দিতে পারেননি, হেমচন্দ্র তা আয়ত্ত করেছেন। এভাবেই সজীব ছিল বঙ্গকাব্যের ধারা। কবি থেকে কবিতে তা বিচিত্র ব্যপ্তিতে উজ্জ্বল।

মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

সমসময়ের বাকি কবিদের মতোই নবীনচন্দ্র সেনের কবিস্বভাবের মুখ্য প্রেরণা ছিল স্বদেশচেতনা, স্বধর্মপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি। কিন্তু তা কোনো অর্থেই সংকীর্ণ ও উগ্র না হওয়ায় উনিশ শতকীয় বিশ্বমানবতার আদর্শের সঙ্গে তার কিছুমাত্র বিরোধ ছিল না। "একাধারে জাতীয়তার পুরোধা ও বিশ্বমানবতার উদগাতা" নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যগাথায় বাঙালি পাঠক পেয়েছিলেন ধর্মসমন্বয় ও বিশ্বমৈত্রীর এক অপূর্বকথিত ছবি, জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক ধাক্কা খানিক কাটিয়ে ওঠার পর যে গভীরতর বোধের অপেক্ষা ছিল। তাঁর ত্রয়ী মহাকাব্য যেভাবে কৃষ্ণচরিত্রের পুনর্মূল্যায়ন, তেমনি কাব্যরচনার প্রথম অধ্যায়ে পৌরাণিক বিষয়বৈচিত্র্যের

কাছে হাত না পেতে তিনি ফিরে যেতে চেয়েছেন অনতিদূরের ইতিহাসে। রঙ্গলাল ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছিলেন, মধুসূদনের কাব্য প্রত্যক্ষত ঐতিহাসিক ঘটনানির্ভর না হলেও তাতে ছিল ঐতিহাসিকতার বোধ। কিন্তু নবীনচন্দ্র তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫ খ্রি.) কাব্যে বাংলা তথা ভারতের সেই ঔপনিবেশিক ইতিহাসের আদিতে ফিরলেন, যেখান থেকে একটি যুগের সূত্রপাত। সমসাময়িক ভাবজগতের দ্বন্দ্ব আসলে যে যুদ্ধের ফসল। সিপাহী বিদ্রোহেরও বছর বিশেক বাদে এই সমরগাথা বাংলার যুদ্ধ সংস্কৃতি আর 'বিশ্বাসঘাতকতা'র ইতিহাসকে ফিরে পড়বার চেষ্টা। পলাশির যুদ্ধ তখনও সুদূর অতীত নয়, তার মূল্যায়ন তখনও সেই অর্থে শুরুই হয়নি। এমতাবস্থায় একটি ঘটনাপ্রধান কাব্যের বিষয় হিসেবে এই দিকটি বেছে নেওয়া, প্রণিধানযোগ্য। এর মুখ্য ভরকেন্দ্র এক তীব্র ষড়যন্ত্রের ট্র্যাজেডি, স্বাধীনতারক্ষার্থে আত্মবলিদানের আদর্শের উপর যা প্রতিষ্ঠিত। 'পলাশীর যুদ্ধ' অন্য কোনো প্রদেশের বীরগাথা নয়, বলতে চেয়েছিল ঘরের কথা। যে ঘটনা ঐতিহাসিকভাবে সারা ভারতের মোড় ঘুরিয়ে দিলেও ভৌগোলিক ও মানসিক পরিসরে যা বাংলার। প্রকাশনাত্রেই এই কাব্য তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করে, এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রও এর প্রশংসা করে লেখেন, 'পলাশীর যুদ্ধ' বাংলার এক প্রধান কাব্য, 'next, if at all, to Meghnad'। নবীনচন্দ্রের বিরুদ্ধে, এই কাব্য রচনার জন্য, রাজদ্রোহের অভিযোগ অবধি তোলা হয়। পরবর্তীতে অযাচিতভাবে বাংলার 'ন্যাশনাল হিরো' সিরাজদ্দৌল্লার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন এই কাব্য স্বভাবতই নয়, কিন্তু সিরাজ চরিত্রটি নবীন সেন বেশ নির্মোহ ভঙ্গিতে দোষ-গুণের সমন্বয়ে তৈরি করেছিলেন। জগৎ শেঠের বয়ানে বাঙালির চরিত্রগত ঐক্যের অভাব বোঝাতে কবি যখন বলেন—

"স্বর্গ-মর্ত্য করে যদি স্থান-বিনিময়,
তথাপি বাঙালি নাহি হবে একমত;
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জয়।
কার্যকালে খোঁজে সব নিজ নিজ পথ।"

তখন তা নিছক ব্যঙ্গ বা বাস্তবের প্রতিফলন মাত্র নয়, কবিচিত্তের ক্ষোভেরও নজির হয়ে ওঠে, আত্মমূল্যায়ন যার ভিত্তি। মোহনলালের বিলাপ আসলে তাঁর ত্রয়ী মহাকাব্যের পূর্বাভাস—

"নিতান্ত কি দিনমণি! ডুবিলে এবার!
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোকসিন্ধু জলে?
যাও তবে! যাও দেব! কি বলিব আর?
ফিরিও না পুনঃ বঙ্গ-উদয়-অচলে।।
কি কাজ বল না আহা ফিরিয়া আবার?
ভারতে আলোক কিছু নাহি প্রয়োজন।
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ।

কালি পূর্ব্বাশার দ্বার খুলিবে যখন,
ভারত নবীন দৃশ্য করিবে দর্শন।”

—এই ‘নবীন দৃশ্য’ বস্তুত নবযুগের সমার্থক। যে যুগ যুগপৎ উপনিবেশিত ও আলোকপ্রাপ্ত। আর সেই নবজাগরিত যুগের রীতি মেনেই নবীনচন্দ্র সেন তাঁর মহাকাব্য পরিকল্পনায় ভারতীয় পুরাণ-মহাকাব্যের এক আইকনিক চরিত্রকে কেন্দ্রে রাখলেন। উনিশ শতকের আধুনিকতার একটি লক্ষ্যণীয় চরিত্র বৈশিষ্ট্য, শিকড়কে ফিরে দেখার চেষ্টা। পুরাণ-মহাকাব্যের ব্যাখ্যায় যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন মধুসূদন, স্মৃতি-সংহিতার পুনর্ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাস্তবোচিত সমাধানের পথে যেভাবে হেঁটেছিলেন বিদ্যাসাগর, সেই একই প্রবণতা নবীন সেনের কাব্যেও। ‘পলাশীর যুদ্ধ’ যেখানে জাতিগত অনৈক্যের কথা বলে, ‘রৈবতক’ (১৮৮৭ খ্রি.), ‘কুরুক্ষেত্র’ (১৮৯৩ খ্রি.) ও ‘প্রভাস’ (১৮৯৬ খ্রি.) সেখানে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের মহাকাব্য। সংহতির স্বপ্নই এই তিন কাব্যে শ্রীকৃষ্ণকে অখণ্ড ভারতের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হিসেবে রূপায়িত করে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতিনিধি হিসেবে দুর্বাসার সঙ্গে তাঁর যে বিরোধ, তা নবীন সেনের নিজস্ব ব্যাখ্যা। আর এই প্রেক্ষিত যতোখানি মৌলিক, ভাগবগ পরিসরের নিরিখে তা ততোটাই বিশাল। নবীন সেনের কাব্য পরিকল্পনার ঐশ্বর্য তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো।

নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের পরিকল্পনায় খেয়াল করেছিলেন খণ্ডিত, বিপর্যস্ত ভারতের বিপ্রতীপে এক অখণ্ড ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের প্রয়াস। আর সেজন্যই এই ত্রয়ী মহাকাব্যে কৃষ্ণের জীবনের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা অনুসরণে তিনি তিন খণ্ডে সেই ভারতের কথা বলেন, যার আত্মা স্বয়ং বাসুদেব, বাহুবল ধনঞ্জয় অর্জুন আর জ্ঞানশক্তি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। ‘রৈবতক’-এর ভূমিকার কয়েকটি কথায় তিনি এই প্রকল্পের আঁতের কথাটি বলেছেন—

“মহাভারতের পাঠ সমাপন করিয়া দেখিলাম, ভারতের বিগত বিপ্লবাবলীর তরঙ্গলেখা এখনও সেই শৈল-উপত্যকার সে শেখরমালার অঙ্কে অঙ্কে অঙ্কিত রহিয়াছে। দেখিলাম, তাহার সাদুদেশে, সেই দৃশ্য ভাষাতীত—ভগবান বাসুদেব ঐশিক প্রতিভায় গগন পরিব্যাপ্ত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং অঙ্গলিনির্দেশ করিয়া পতিত ভারতবাসীর—পতিত মানবজাতির উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। দেখিলাম, পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম।” নবীনচন্দ্রের বিশ্বাসের উত্তাপ বহন করছে এই বাক্যগুলি। কেবলমাত্র ‘পতিত ভারতবাসীর’ মাত্র নয়, ‘পতিত মানবজাতির’ উদ্ধারের পথ শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক জীবন ও বাণীর মধ্যে নিহিত, এই তাঁর বিশ্বাস। তাই এই কাব্যে এক স্বপ্নময় অখণ্ড সংহতির আকাঙ্ক্ষা স্বয়ং নায়কের উক্তিতে মূর্ত—

“হে মাতা ভারতভূমি! সৃজিলা বিধাতা
মহারাজ্য-উপযোগী করিয়া তোমায়
তুষার-কীরিট-শীর্ষ বিরাট মুরতি
অভ্রভেদী হিমাচল বসিয়া শিয়রে,

প্রসারিত ভুজদ্বয় করি সম্মিলিত
পদতলে কুমারীতে ভীষণ মুষ্টিতে
আপনি ভারতবর্ষ করেন রক্ষণ।
ভীষণ ভুজাগ্রদ্বয়—মহেন্দ্র মলয়,—
তুচ্ছ মানবের কথা, সমুদ্র আপনি
না পারি লঙ্ঘিতে বলে মানি পরাজয়,
দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকাররূপে শোভিছে কেমন
ভারতের পদতল করি প্রক্ষালন।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যচয় করি সম্মিলিত
এই শৈল-প্রাচীরের মধ্যে পুণ্যভূমে
এক মহারাজ্য প্রভু, হয় না স্থাপিত,—
এক রাজ্য, এক জাতি, এক সিংহাসন?"

বেদব্যাসের সঙ্গে এই কথোপকথন দৃশ্যেই উন্মোচিত 'স্বপ্নলব্ধ' সেই ভারতবর্ষের ছবি—"ব্যাসের অনন্ত জ্ঞান, ভুজঃ অর্জুনের/তোমার সেবায় মাতঃ। হলে নিয়োজিত/কোন্ কার্য নাহি পারে হইতে সাধিত?" এই কৃষ্ণ নরোত্তম গুণাবলীর সমাহার হলেও এঁর মানবোচিত আকুতি ও সুখ-দুঃখের বোধ বাঙালিমানসকে অভিভূত করেছিল। যে রসায়ন রাবণের বিলাপে দেখা গেছিল 'মেঘনাদবধ'-এ, সেই আবেদনই নবীন সেনের কাব্যের আবেগপরিধি সম্প্রসারিত করেছে। তাঁর শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্মমতের উদগাতা তা সার্বভৌম ও উদার। কবিস্বভাবের সহজিয়া প্রেরণাতেই তিনি এই ভাবাদর্শগত সমন্বয়সাধনের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তাই তাঁকে কৃষ্ণের ঐশী মহিমার চেয়ে মানবিকতার দিকটিই বারবার বেশি আকর্ষণ করেছে। 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের সমাপ্তিতে অবসন্ন, ক্ষুব্ধচিত্ত সমর পরিকল্পক বলে ওঠেন—

"মানবের উষ্ণ রক্ত বিনা মানবের পাপ,
মানবের শোক বিনা মানবের পরিতাপ,
না হয় মোচন যদি, মানবের মুক্তিপথ
রক্ত-সিন্ধুগর্ভে যদি, শ্মশানে দাবাগ্নিবৎ;
একই নির্ঘাতে নাথ! একই নিমিষে হায়,
কৃষ্ণের শোণিতে কেন ভাসালে না এ ধরায়?
একই শ্মশানমাত্র করি নাথ! প্রজ্বলিত,
কৃষ্ণের হৃদয় কেন করিলে না সমর্পিত?"

—এই অসহায়তা এক মহাযুদ্ধের নেপথ্যনায়কের, কর্তব্যবোধের দ্বারা যিনি পরিচালিত। একাধারে এই দার্ঢ্য আর অনুতাপের সংবেনশীল মিশেলেই তৈরি হতে পারে ভারতের আত্মা, এমনটাই মহাকবি

নবীনচন্দ্র সেনের উপলব্ধি। সেজন্যই 'প্রভাস' নামক অন্তিখম খণ্ডে যদুবংশকে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখেও কৃষ্ণ শান্ত, স্থির। সন্তানহারা, ভ্রাতৃহারা মহানায়ক কীভাবে মহাভারত প্রতিষ্ঠার অন্তে তাঁর নরনারায়ণ লীলা সংবরণ করেন, তার অনবদ্য চিত্র আঁকেন নবীন সেন, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ঔদ্ধত্য শেষাবধি দুর্বাসার বিশ্বরূপ দর্শন ও প্রায়শ্চিত্যের মাধ্যমে স্তিমিত হয়।

এই বিপুলায়তন মহাকাব্যত্রয় ছিল নবীনচন্দ্রের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব ভাবনার এক সম্মিলন প্রয়াস, যে স্পিরিচুয়ালিটি আর মেটিরিয়ালিস্টিক আদর্শের মেলবন্ধনে জাগরিত হবে নবভারত। নবীন সেন 'গীতা'র বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। খৃটে ও বুদ্ধের জীবনভিত্তিক রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। এসবই আসলে তাঁর এই মহাকাব্যিক বৃত্তের আওতাতেই পড়ে। শ্রীচৈতন্যের নাম-সংকীর্তনের ভক্তিতন্ময়তায় 'প্রভাস' আবেগাপ্লুত হয়েছে। মহাকবির নির্মোহতা, নিরপেক্ষতা বা দূরত্ব এতে ছিল না। কালনৌচিত্য দোষ 'প্রভাস'-এর এক বড়ো সমস্যা, এমনটা বিশেষজ্ঞদের মত। স্থানবিশেষে লঘুভাবের অবতারণা, ছন্দে বৈচিত্র্যের অভাব কিংবা 'ধর্ম' সংস্থাপনে অতিরিক্ত সচেতন আগ্রহ তাঁর মহাকাব্যকে কাঙ্ক্ষিত উচ্চতা স্পর্শ করতে বাধা দিয়েছে। তথাপি নবীন সেনই সম্ভবত প্রথম ভারতীয় কবি, যিনি উনবিংশ শতকে এক প্রাদেশিকতাবর্জিত ঐক্যবদ্ধ ভারতের কথা কাব্যে তুলে আনতে চেয়েছিলেন।

নবীনবাবুর প্রথম কাব্য 'অবকাশরঞ্জিনী' (প্রথম ভাগ-১৮৭১ খ্রি.) কাহিনীকাব্য বা মহাকাব্যের পূর্বে প্রকাশিত গীতিকবিতা সংগ্রহ। এর নামকরণে কবি এটিকে 'খণ্ডকাব্য' আখ্যা দিয়েছিলেন। এটির দ্বিতীয় ভাগ ১৮৭৮-এ প্রকাশ পায়। মহাকাব্যের যুগ হিসেবেই রঙ্গলাল ও হেম-মধু-নবীনের কাব্যকৃতি মূলত অভিহিত হলেও, গীতিকবিতার সুরটি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল মাইকেলের চতুর্দশপদী কবিতাগুলি থেকেই। যে তীক্ষ্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এই নবজাগরিত যুগমানসকে পরিচালিত করছিল, তার জেরে স্বভাবতই মহাকাব্য রচনার উপযোগী নির্মোহতা রচয়িতার পক্ষে সবসময় বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। মহাকাব্য রচনার পরিস্থিতি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। আর বাংলা গীতিকবিতার সমান্তরাল ধারায় ক্রমশ উঠে আসতে থাকেন এক ক্ষণজন্মা কবি, বিহারীলাল চক্রবর্তী। 'ভোরের পাখী' হিসেবে তিনিই শুনিয়েছিলেন এক নতুন কাব্য আঙ্গিকের সুর, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাঁকে দিয়েছিলেন সাহিত্যগুরুর সম্মান।

৭.৫ সারাংশ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মধুসূদনের অনুসরণ করে অনেকে মহাকাব্য রচনায় হাত দেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন। তাঁদের রচনা মধুসূদনে সমতুল্য নয়। মধুসূদনের প্রতিভা তাঁদের ছিল না। এইভাবেই মহাকাব্যের ধারা ক্রমশ মিলিয়ে যেতে থাকে।

৭.৬ অনুশীলনী

১। মেঘনাদবধ কাব্যের অনুসরণে যাঁরা কাব্যরচনায় হাত দেন তাদের কাব্যরচনার পরিচয় দিন।

২। বাংলার মহাকাব্যের ধারা স্তিমিত হয়ে গেল কেন তা লিখুন।

৩। মহাকাব্য রচনায় হেমচন্দ্রের দক্ষতার পরিচয় দিন।

৪। নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যের পরিচয় দিন।

৭.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য়)* : সুকুমার সেন

২। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত* : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য়)* : ভূদেব চৌধুরী

৪। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় খণ্ড)* : ভূদেব চৌধুরী

৫। *ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন* : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মডার্ণ বুক এজেন্সি

৬। *বাংলা সাহিত্যের কথা (১ম ও ২য় খণ্ড)* : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৭। *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য* : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

একক ৮ ❑ বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও কামিনী রায়

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ প্রস্তাবনা

৮.৩ কবিকৃতি : বিহারীলাল চক্রবর্তী

৮.৪ কবিকৃতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮.৫ কবিকৃতি : গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়

৮.৬ সারাংশ

৮.৭ অনুশীলনী

৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ উদ্দেশ্য

বাংলা কাব্যজগতে যখন মহাকাব্য লেখার প্রচলন দেখা দিয়েছে তখনই অন্য একটি ধারার দেখা পাওয়া যায়—গীতিকাব্যের ধারা। মহাকাব্য স্তিমিত হতে হতে যখন নির্বাচিত হল, তখনই পাশে থাকা গীতিকাব্যের ধারা সামনে এল—যা বাংলার স্বাভাবিক ধারা। এই রচনাবলীর চিরন্তন ধারাটির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এই এককের উদ্দেশ্য।

৮.২ প্রস্তাবনা

বাংলা মহাকাব্যের ধারার পাশাপাশি গীতিকাব্যের ধারাও চলছিল, যা বাংলার স্বাভাবিক প্রবণতা। সেই সময় বাংলায় গীতিকাব্য রচনায় সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। যদিও মধুসূদন পাশ্চাত্য ভাবধারার গীতিকবিতার লেখক। বিহারীলালের কবিতাতেই প্রথম আধুনিক গীতি কবির সুর শোনা গেল। রবীন্দ্রনাথ তাই বিহারীলালকে ‘ভোরের পাখী’ বলেছেন। রবীন্দ্রনাথও সেই ধারার অনুসারী। বর্তমান এককে বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য আলোচনা হয়েছে। উনিশ শতকের মহিলারাও নবজীবনের হাওয়ায় আন্দোলিত হয়ে যে কাব্যরচনা করেন, তার পরিচয়ও তুলে ধরা হয়েছে।

৮.৩ কবিকৃতি : বিহারীলাল চক্রবর্তী

"এসেছিলে শুধু গায়িতে প্রভাতী,
না ফুটিতে ঊষা, না পোহাতে রাতি,—

আঁধারে আলোকে, প্রেমে মোহে গাঁথি
কুহরিল ধীরে ধীরে;
ঘুমঘোরে প্রাণী, ভাবি স্বপ্ন-বাণী
ঘুমাইল প্রাণী, ভাবি স্বপ্ন-বাণী
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে।"

(বিহারীলালের স্মৃতি তর্পণে অনুগামী কবি অক্ষয়কুমার বড়াল)

উনিশ শতকীয় নবজাগরণ পর্বে যে ক'জন কবির লেখনী নব্য শিক্ষিত বঙ্গমানসের স্বাদেশিকতার চাহিদা, স্বজাতিপ্রীতি, নবভারতের আকাঙ্ক্ষার দিকগুলি প্রতিফলিত করেছিল, কবি হিসেবে বিহারীলাল তাঁদের চেয়ে স্বতন্ত্র এক শ্রেণীতে পড়েন। এই শতকে বিহারীলালের আবির্ভাব খানিক আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতই। বাংলা সাহিত্যের প্রাগাধুনিক পর্বে কবিতা মূলত গেয় ছিল। ফলে চর্যা, পদাবলী সাহিত্যের মতো খরড কবিতা আক্ষরিক অর্থেই ছিল গীতিকবিতা। আধুনিক কাব্যধারার সূত্রপাতে ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল-মাইকেলের হাতে খণ্ড কবিতার বর্তমান রূপ নির্মাণ শুরু হয়। কিন্তু মধুসূদন ও অন্যান্যদের প্রতিভা মুখ্যত ছিল মহাকাব্যিক বিশালতার উপযুক্ত। বাংলা কাব্যজগতে সুরহীন গীতিধর্মিতার সঞ্চার প্রথম ঘটে বিহারীলালের মাধ্যমে। মধুসূদনের মতো ক্ষুরধার বিদ্রোহী বিশ্লেষণী শক্তি, হেমচন্দ্রের তূর্যনাদ কিংবা নবীন সেনের ত্রিলোকব্যাপী পরিকল্পনার সমান্তরালে তিনি বাংলা গীতিকবিতার আধুনিক রূপের প্রথম সার্থক নির্মাতা হিসেবে স্বীকৃত। রবীন্দ্রাথের মূল্যায়ন এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, "বিহারীলাল তখনকার ইংরাজীভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় নৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন।" স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সহ এই পর্যায়ের তিন বিশিষ্ট গীতিকবি, অক্ষয় বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গুণমুগ্ধ। 'ভোরের পাখি' হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিহিত করেছিলেন, কারণ তিনি মহাকাব্যিক যুগেই গীতিকবিতার সাময়িক অথচ শাশ্বত সেই সুরের সাধনা করতে চান, যে সুর পুরোপুরি মহাকাব্যিক ঐশ্বর্যের তথা কর্মতৎপর দিবাভাগের উপযোগী নয়, আবার গীতিময়তায় সান্ধ্য সংরাগ সম্পূর্ণ যাকে বাগ মানাতে পারে না। এই যুগ সময় হিসেবে ভোরের মতো। প্রথম কলকাকলিতে তিনি সারাদিন গুরুর ডাক দিয়ে গিয়েছিলেন, দিনাতিপাতের দায়িত্ব পরের কবিদের ছিল। ঐ ডাকটুকু নূতন, বাঙালি পাঠক আখ্যানকাব্য-খণ্ডকাব্যের বিবৃতিমূলক দুর্বার গতির পাশে ক্ষণিকের এই থমকে দাঁড়ানোর অপেক্ষায় ছিলেন। মহাকবির নির্মোহতাই কেবল নয়, পাঠকেরও অপেক্ষা তখন ছিল গীতিকবির ব্যক্তিক স্পর্শের। বিহারীলাল সেই ধারার উদগাতা।

গীতিকবিতা ক্ষণিকের ব্যক্তিক অনুভূতিকে চিরন্তনতার স্পর্শ দেয়। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে গীতিকবিতা নামে স্বতন্ত্র কোনো শ্রেণি না থাকলেও, সংস্কৃত সাহিত্যে গীতিকবিতাধর্মী রচনার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ। মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' বা সেই কাব্য অবলম্বনে রচিত অজস্র দূতকাব্য, জয়দেবের গীতগোবিন্দ ক্ষেত্রবিশেষে সেই ধরণের রচনার নিদর্শন। বাংলার মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বৈষ্ণব পদাবলীর নাম অনায়াসেই শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতাবলীর তালিকায় এসে যায়। বিহারীলাল-পূর্ব ঔপনিবেশিক সাহিত্যের পর্যায়েও মাইকেলের চতুর্দশপদী কবিতার বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার নমুনা। হেমচন্দ্রের 'অশোক তরু', 'যমুনা-তটে'র মতো 'কবিতাবলী'র কবিতা বা নবীন সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী'র কথাও এ প্রসঙ্গে মনে পড়া স্বাভাবিক। ইংরেজি Lyric শব্দের বাংলা রূপান্তর গীতিকবিতা। Lyre নামক তারযন্ত্রের সহযোগিতায় যে কবিতারূপ গীত হতো, তাকেই লিরিক বলা হয়। কিন্তু বাংলা গীতিকবিতার সঙ্গে সুরের সেই অর্থে কোনো সম্পর্ক নেই। ভাবগত বিচারে এক আত্মমগ্ন গীতধর্মী আবেশ বা প্রচ্ছন্ন সাঙ্গীতিক লক্ষণ এতে থাকে, বঙ্কিমের ভাষায়, যা কবির 'আত্মগত ভবোচ্ছ্বাস'। পরিমিত বা সংক্ষিপ্ত আয়তনের সেই কবিতাই গীতিকবিতা। কবির আত্মগত ভাবতন্ময়তারই যা বহিঃপ্রকাশ। বাংলা সাহিত্যে ক্রমপরিণত এই আঙ্গিকের নবীনতম রূপকার বিহারীলাল। তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য 'নিসর্গ সন্দর্শন' (১৮৭০ খ্রি.)। সাতটি সর্গে বিন্যস্ত এই কাব্যগ্রন্থ বিহারীলল সম্পাদিত 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মূলত প্রকৃতিচেতনাভিত্তিক এই কাব্য জড় পৃথিবীর নানান সৌন্দর্য্য নিয়ে ভাবিত। "সমুদ্র-দর্শন, নভোমন্ডল, ঝটিকাসম্ভোগ'সহ প্রকৃতির নানান রূপ তিনি চিত্রায়িত করেছেন। জড় প্রকৃতির মধ্যেও মাঝেমাঝে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেছেন কবি। দেশ-কাল-ঔপনিবেশিকতা গাঢ় কোনো ছাপ না ফেললেও যুগচেতনাকে পুরোপুরি অস্বীকার তো কোনো কবিই করতে পারেন না। বিহারীলালও তাই এই কাব্যে 'সমুদ্রদর্শন' কবিতায় যখন লেকেন, "এ দেশেতে রঘুবীর বেঁচে নেই আর/তাঁর তেজোলক্ষ্মী তাঁর সঙ্গে তিরোহিতা।/কপট অনায়াসে এসে রাক্ষস দুর্ব্বার/হরিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা-সীতা।"—বোঝা যায়, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বড়ো ছোঁয়াচে। কিন্তু নিসর্গকে তিনি তখনও আত্মীকৃত করতে পারেননি। বারবার তার রহস্যময় কেন্দ্রে পৌঁছে বিহারীলাল আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন তার মর্মকথা।

ওই একই বছরে প্রকাশিত 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্য কবির পত্নী সরলাদেবী ও পূর্ণচন্দ্র, বিজয় আর কৈলাস—এই তিন নিকট বন্ধুর প্রয়াণের অভিঘাতে রচিত। পুরাতনপন্থী রচনারীতি অবলম্বনে লেখা এই কাব্য বিশেষজ্ঞদের মতে, যথেষ্ট শিল্পগুণসম্পন্ন নয়। বেশিরভাগ অংশ বিবৃতিমূলক। শোককাব্য হিসেবে এই রচনা পথপ্রদর্শক হতে পারতো, কিন্তু সেজন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে গিরীন্দ্রমোহিনী, রবীন্দ্রনাথ অবধি। ১৮৭০ কবির কাব্যজীবনে বহুপ্রসূ বছর। উপরোক্ত দুটি কাব্য ছাড়াও এই বছরেই প্রকাশিত হয় 'প্রেমপ্রবাহিনী'। বিহারীলালের রচনাশক্তি কিঞ্চিৎ উঁকি দিয়ে যায় এই কাব্যে, কিন্তু তাঁর 'বঙ্গসুন্দরী' প্রথম পরিণত পূর্ণাঙ্গ কাব্য, যেখানে কবি আয়ত্ত করলেন তাঁর স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গি।

"অয়ি ফুলময়ী প্রেমময়ী সতী,
সুকুমারী নারী, ত্রিলোক-শোভা,
মানস-কমল-কানন-ভারতী
জগজন-মন-নয়ন-লোভা।"

—এভাবেই এই কাব্যে নারী তথা গৃহবধূর নানান রূপ অঙ্কিত। এই নারীবন্দনাই পরবর্তীতে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্নিহিত প্রেরণা হয়ে ওঠে। নারীর রোমান্টিক রূপের যে অবতারণা তিনি এখানে করেছেন, তাই পূর্ণ বিকাশ লাভ করবে পরবর্তী দুটি কাব্যগ্রন্থে, যাদের দৌলতে বিহারীলাল বাংলা কাব্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসনের অধিকারী।

'বঙ্গসুন্দরী'কে বলা চলে 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯ খ্রি.) ও 'সাধের আসন' (১৮৮৯ খ্রি.) কাব্যদ্বয়ের পূর্বাভাস। "মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতী বিরহ, যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল সঙ্গীত রচনা করি।"—কবির এই কৈফিয়ৎ গুরুত্বপূর্ণ। দেবী সরস্বতীর সঙ্গে কবিমনের নিয়ত সংলাপ। সেই কথোপকথন বিরহ-মিলনের নানা সুমিষ্ট দোলাচলে ভরপুর। আর এই কাব্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন ধারার সূচনাবিন্দু। বাল্মীকির কবিত্বলাভের বহুশ্রুত আখ্যান এতে বর্ণিত। নিষাদ কর্তৃক ক্রৌঞ্চমিথুন হত্যার শোকে বাল্মীকি যেভাবে সরস্বতীর প্রসাদে কবি হয়ে উঠেছিলেন, একালের কবিরও প্রার্থিত সেই সারদার সহায়তা। ভাগ্যদেবীর সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন কবির মানসপ্রতিমা। তাঁর নিজের ভাষায়, "মানসমরালী মম আনন্দরূপিনী"। 'চির আনন্দময়ী বিষাদিনী' সারদা আসলে বিহারীলালের কাছে কেবল পরা-অপরা বিদ্যার সঙ্গে প্রেমরসের লুকোচুরিতে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে বাংলা কাব্যক্ষেত্রে অভিনব।

"তোমারে হৃদয়ে রাখি—
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দু-ই ভাল লাগে,
গিরিমালা, কুঞ্জবন,
গৃহ, নাট-নিকেতন,
যখন যেখানে যাই, যাও আগে আগে।"

—এই প্রকাশভঙ্গিতে স্পষ্ট, বিশ্বচরাচরের সকল রহস্য, সৃষ্টি ও ধ্বংস, ব্যাধি ও মুক্তি—সর্বত্র কবির আনন্দ। আর তার মূলে আরাধ্যার প্রতি প্রেমময় অর্পণ। ফলত তাঁর বিরহে নিখিল বিশ্ব অপার শূন্য—

"হে সারদে, দাও দেখা!
বাঁচিতে না পারি একা
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয়;
কি বলেছি অভিমানে
শুনো না শুনো না কানে,
বেদন দিও না প্রাণে ব্যথার সময়।"

রামপ্রসাদ-কমলাকান্তর মাতৃভাবে দেবীকে বন্দনা করার যে ধারা, ভক্তিসাহিত্যের পরতে পরতে দেবীর উপর মানবতা আরোপের যে ঐতিহ্য, মহাশক্তির বিপুলতা বিস্মৃত না হয়েও তাঁকে ঘরের করে তোলার যে আকুতি বাংলা সাহিত্যে অমিল নয়, পূর্বসুরী সেসবের সঙ্গেও এই প্রকাশের পার্থক্য বোঝা যায়। এই মান-অভিমানের আলোছায়া আধুনিক। আর কবির ভাবনায় 'কায়াহীন মহাছায়া বিশ্ববিমোহিনী মায়া' এই অপরাশক্তিও তাঁর কাব্যলক্ষ্মী, 'হৃদয়প্রতিমা'। 'সারদামঙ্গল' কাব্যের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। 'সাধের আসন' সারদা' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী অকালপ্রয়াতা কাদম্বরী দেবী তাঁর প্রিয় কবিকে একটি আসনেমঙ্গল'-এরই কয়েকটি ছত্র লিখে পাঠান। তারই প্রতিক্রিয়ায় কবি লেখেন 'সারদামঙ্গল'-এর পরিপূরক কাব্যটি। দশ সংর্গের এই কাব্যে কবির উপলব্ধি, সৃষ্টির রহস্যময়তাই আদতে সকল সৌন্দর্য্যের মর্মবস্তু। বিহারীলাল ভারতীয় সাধন-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। তাই তাঁর রচনায় 'মিস্টিক' বা মরমিয়া দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া কঠিন নয়। 'সাধের আসন'-এ তিনি যখন স্বীকার করেন,

"ধেয়াই কাহারে, দেবি! নিজে আমি জানিনে।
কবি-গুরু বাল্মীকির ধ্যানধনে চিনিনে।
মধুর মাধুরী বালা,
কি উদার করে খেলা।
অতি অপরূপ রূপ।
কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারিনে।"

—আমরা সেই প্রকাশভঙ্গিতেও পাই রহস্যবৃত এক ধরণ। কিন্তু এতে মিস্টিকতার ছোঁয়ামাত্র কেবল, কবির আধুনিক মনন স্পষ্টতা খুঁজতে দেরি করে না—

"প্রত্যক্ষ বিরাজমান
সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান,
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা;
কবির যোগীর ধ্যান,
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ,
মানব-মনের তুমি উদার সুষমা।"

—মর্ত্যপৃথিবীর প্রেমকে সর্বানন্দের উৎসস্বরূপ বর্ণনা করার এই রীতি বিহারীলালের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে সেভাবে দেখা যায়নি। আর রবীন্দ্রনাথ এই মর্ত্যপ্রেমেরই সার্থক উত্তরসূরী। আর একটি নিদর্শন দিয়ে এই আলোচনার রূপটি স্পষ্ট করা প্রয়োজন—

"তোমার পবিত্র কায়া,
প্রাণেতে পড়েছে ছায়া,

মনেতে জন্মেছে মায়া, ভালবেসে সুখী হই।
ভালবাসি নারীনরে,
ভালবাসি চরাচরে,
ভালবাসি আপনারে, মনের আনন্দে রই।"

এক প্রাজ্ঞ সমালোচকের উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—"বস্তুত এখান থেকেই বাংলা গীতিকাব্যের ধারাটি পথের সন্ধান পেল এবং শতাব্দীকাল এই ছিল বাংলা কাব্যের মূল গতিপথ।" অক্ষয় বড়াল, দ্বিজেন্দ্রনাথ, দেবেন সেন সেই পথের পথিক। আর সেই পথই আরো মসৃণ হলো রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী প্রতিভাবলে।

৮.৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৮৪১)

সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি সম্ভাব্য ক্ষেত্রেই নিজ অপার্থিব প্রতিভার সাক্ষর রাখলেও পৃথিবীব্যাপী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান পরিচয় তিনি কবি। তাঁর জীবনের প্রথম নিশ্চিত রচনাটি কবিতা আঙ্গিককে ভর করে তৈরি হয়েছিল, জীবনেরর উপান্তে যে রচনা দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবন শেষ, সেটিও ঘটনাচক্রে একটি কবিতা। এই বিষয়টি নিছক সমাপতন নয়, এর গভীরে তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি বিদ্যমান। বারো বছর বয়স থেকে আশি বছর বয়স অবধি এক বিপুল কালখণ্ড জুড়ে তিনি যত কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন, তার ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করে রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা সেগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। আমরা এই কাব্য পর্যায়গুলির একটি প্রয়োজনীয় রূপরেখা মাত্র দেবার চেষ্টা করবো।

সূচনা বা প্রস্তুতি পর্বে বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁর পারিবারিক সাহিত্য চর্চার পরিসরে সমৃদ্ধ হন। ঠাকুরবাড়ির অবদান বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনেকখানি। চোদ্দ বছর বয়েসে প্রথম রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত যে কবিতা প্রকাশিত হয়, 'হিন্দুমেলার উপহার' শীর্ষক সেই রচনা যুগগত চাহিদার প্রতিফলন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরাগী কবির রচনায় অগ্রজপ্রতিমের ছাপ চিল স্পষ্ট। এর আগেও কয়েকটি অনামা রচনাকে রবীন্দ্রনাথের বলে চিহ্নিত করেছেন কেউ কেউ। এই প্রস্তুতি পর্বে বীররসাত্মক কাব্য 'পৃথ্বীরাজ পরাজয় বা গাথাকাব্য 'বনফুল' কিংবা 'ভগ্নহৃদয়' সমসাময়িক জাতীয়তাবাদী উন্মাদনাকে যেভাবে ধারণ করে, তেমনি প্রাথমিকভাবে বিহারীলাল অনুগামী কবির রোমান্টিক আবেগের প্রকাশও এতে দেখা যায়। এই পর্যায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা সংকলন ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'শৈশব সঙ্গীত'। এই কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতাই পূর্বের রচনা, তাই কালের বিচারে এটি পরবর্তী পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থের পরে প্রকাশিত হলেও বিদ্বোৎজন একে প্রাথমিক সূচনার পর্বের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বয়সকালে স্বয়ং কবি এর কবিতাবলীকে পাশ্চাত্য প্রভাবিত অপরিণত রচনা বলে অভিহিত করলেও এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাঁর পরবর্তী কাব্যজীবনের সূচনাবিন্দু। গবেষক ও পাঠককুল তাই এইসব কবিতার মাহাত্ম্য অস্বীকার করতে পারেন না।

পরবর্তী পর্যায়ে কবিচেতনা বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিকাশলাভে সমর্থ হয়। ১৮৮২-তে প্রকাশিত 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকেই রবীন্দ্রকাব্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পাখা মেলতে থাকে। রোমান্টিক কল্পনাবিলাস থেকে বাস্তবের মাটিতে নেমে আসার প্রয়াস এতে পাওয়া যায়। কবিমানস নিজেকে ভাঙতে উদ্যোগী এই কাব্যে। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের বক্তব্য—"সন্ধ্যাসঙ্গীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমার বটে।" সেই সময়ের কাব্যরুচির নিরিখে এর ছন্দ যে অন্যরকম ছিল, তাও কবি উপলব্ধি করেছিলেন। বয়সোচিত অস্পষ্টতা ও কবিজীবনের প্রাথমিক দ্বন্দ্বগুলি থেকে নিষ্কৃতি না পাওয়ায় এক বিষণ্ণতার পরিমন্ডল পুরো কাব্যটিকে ঘিরে ছিল। 'বাংলার শেলী' অভিধাটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সময় থেকেই জুড়ে যায়। 'প্রভাতসঙ্গীত' (১৮৮৩ খ্রি.)-এ সেই বিষণ্ণতা পরবর্তী মুক্তির আস্বাদই লক্ষ্যণীয়। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', যা কিনা রবীন্দ্র কাব্যপবিক্রমায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বাঁকবদলকারী কবিতা হিসেবে স্বীকৃত, তার কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধার করে এই প্রসঙ্গটি স্পষ্ট করার চেষ্টা করা যায়—

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।"

—এই সাবলীল উচ্চারণ এক গভীর আত্মোপলব্ধির পরিণাম। জগতের আনন্দময় রূপের উপলব্ধি, নিজের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বলোকের সঙ্গে যোগস্থাপনের প্রয়াসই এই কাব্যের মর্মকথা। "আমি ঢালিব করুণাধারা/আমি ভাঙিব পাষাণ কারা/আকুল পাগল পারা।"—নিছক অন্তঃসারশূন্য রোমান্টিক ভাবালুতা নয়, রবীন্দ্রচেতনার সামগ্রিক বিকাশের খুব জরুরি সূচনামুহূর্ত। কবির রচনায় সেই আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট—"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,/জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।" 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়ানোর এহেন প্রচেষ্টা বাংলা কাব্যে এর আগে সেভাবে দেখা যায়নি। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-এ মাইকেল বৈষ্ণবীয় ভাবধারার এক অনবদ্য সুললিত পরিগ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪ খ্রি.) ব্রজবুলির ধ্বনিঝংকারে আরো পরিণত ও বহুমাত্রিক এক কাব্যিক শ্রদ্ধার্ঘ্য, যেখানে বাংলার প্রাণের সম্পদ মৈথিলি-ব্রজবুলির কাঠামোয় নতুন করে রচিত হলো। এই পর্যায়ের আরো দুইটি কাব্যগ্রন্থ 'ছবি ও গান' (১৮৮৪ খ্রি.) ও 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬ খ্রি.) জগতের সৌন্দর্য্যের প্রতি কবিমনের সংরাগ প্রতিফলিত করে। দ্বিতীয়টির বহু কবিতায় নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুজনিত শোকের প্রতিফলন ঘটেছে। মানবমনের গভীর অন্তঃস্থলে ক্রমে প্রবেশের চেষ্টা করছেন কবি। 'কড়ি ও কোমল'-এর 'প্রাণ' কবিতায় যেভাবে তিনি ঘোষণা করেন, 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে/মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'—তাতে তাঁর বহুচর্চিত মর্ত্যপ্রীতির ছোঁয়া। পাশাপাশি এই কাব্যগ্রন্থেরই 'চুম্বন' কবিতায় যখন বলেন,

"ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে,
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা,
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে,
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।"

—ব্যক্তিক অনুরাগ মানবহৃদয়ের গহীনতার খোঁজে রত হয় তখন। আচার্য্য সুকুমার সেনের মতে, "নিরবলেপ স্বচ্ছ দৃষ্টিই 'কড়ি ও কোমল'-এর রহস্য।" শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমোঘ পর্যবেক্ষণ, উন্মেষপর্বের "এই কবিতা গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের কৈশোরকল্পনা যে ধীরে ধীরে উহার প্রাথমিক অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতার কুহেলিকাজাল কাটাইয়া নিজ স্বরূপ আবিষ্কার, দীপ্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।" শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এই পর্যায়কে 'সংশয়ময় আত্মজিজ্ঞাসা' বলে অভিহিত করেছেন।

পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্রমনন এক স্পষ্ট ও পরিরত প্রত্যয়ী জীবনবোধে উপনীত হয়েছে। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে যেমন তিনি সমাজ-সংসারের জাতীয়তাবাদী উন্মাদনার বাস্তবতাকে অস্বীকার করেননি, তেমনি প্রেমপূর্ণ রোমান্টিক ভাবধারায় এই পর্যায়ের কবিতাগুলি নিষিক্ত। 'নিষ্ফল কামনা', 'সুরদাসের প্রার্থনা' যেভাবে সেই রোমান্টিক কবিমনের সাক্ষাৎ দেয়, তেমনি রচিত হয়েছে 'দুরন্ত আশা'র মতো উত্তাল কবিতাও। 'তৈলঢালা স্নিগ্ধ তনু/নিদ্রারসে ভরা' বাঙালির প্রতি কটাক্ষ ঈশ্বর গুপ্ত বা হেমচন্দ্রের ধারা মনে করায়। কিন্তু এই আত্মসমালোচনা আসলে এক দায়বদ্ধতারই নজির। 'গুরু গোবিন্দ' ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার অনুষঙ্গে কবিতায় নিয়ে আসে।

"নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগুপিছু।
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ—
নাই তার কাছে জীবন মরণ,
নাই নাই আর কিছু।"

এহেন তূর্যনাদের পাশেই এই একই কাব্যের 'মেঘদূত' ভারতীয় প্রেমচেতনার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা, বীণাধ্বনি যেন—

"কত কাল ধ'রে
কত সঙ্গীহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে,
সৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ততারাশশী
আষাঢ়সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি উচ্চারণ

নিমগ্ন করেছে নিজ বিজনবেদন।
সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি-সম
তব কাব্য হতে।”—

‘মানসী’ প্রকৃতপ্রস্তাবে ‘সীমা ও অসীমের আসলে দ্বৈতলীলা’। ‘অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ’—রবীন্দ্রমানসের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয়ী চেতনার সূচনা এই কাব্যে।

‘সোনার তরী’র (১৮৯৪ খ্রি.) নামকবিতায় কৃষক, তরণী, চালক ও বর্ষার স্বর্ণশস্যের রূপকে মহাকালের কাঠগড়ায় শিল্প ও শিল্পীর মূল্যমান নির্ধারণের বিষয়টি প্রকাশিত। এই কাব্যগ্রন্থের ‘বসুন্ধরা’, ‘সমুদ্রের প্রতি’ বা ‘যেতে নাহি দিব’ মর্ত্যপৃথিবীর ধুলোমাখা দিনাতিপাতের প্রতি কবিমনের অপরিসীম স্নেহের প্রতিফলন। মিত্রাক্ষর পয়ার ও মহাপয়ারের অসামান্য চলন এইসব কবিতাকে দিয়েছে কাঙ্ক্ষিত ঔদার্য্য। যে সংরাগ ‘ছিন্নপত্রাবলীর ছত্রে’ ছত্রে প্রকাশিত, তারই প্রতিচ্ছবি এই দীর্ঘ কবিতাগুলি।—

“আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে;
শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম তার, বোবার ইঙ্গিতভাষা-হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয় অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতেত যে রক্ত বহে সেও যেন ওই ভাষা জানে—
আর কিছু শেখে নাই।”—

ধরিত্রী, তথা আদি মাতৃকার সঙ্গে এই আত্মীয়তার যোগ তাঁর শিল্পসাধনার সকল ধারাকেই নিয়ন্ত্রণ করেছে। কাব্যজীবনে তার সূত্রপাত এই দীর্ঘ কবিতাগুলির মাধ্যমে। ‘হিং টিং ছট’-এর মতো কৌতুকরসের কবিতাও ‘সোনার তরীর বৈচিত্র্যসাধন করে। মঙ্গলকাব্যের দরণ অনুসরণ করে কাশীদাসী পয়ারের ছাঁদে লেখা কবিতাটি পাণ্ডিত্যের ফাঁপা গরিমাকে ব্যঙ্গ করেছে। আবার ‘বসুন্ধরা’র শান্ত-স্তিমিত আবেদনের পাশে ‘ঝুলন’-এর মতো আত্মোপলব্ধির উদ্দামতাও একই কাব্যে ঠাঁই পায়।—

“বধূরে আমার পেয়েছি আবার—
ভরেছে কোল।
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে
প্রলয়বোল।
বক্ষশোণিতে উঠেছে আবার
কী হিল্লোল!
ভিতরে বাহিরে জাগিছে আমার
কী কল্লোল।

উড়ে কুন্তল, উড়ে অঞ্চল,
উড়ে বনমালা বায়ুচঞ্চল
বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিণী
মত্তবোল।
দে দোল দোল।"

'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'সিন্ধুপারে' বা 'এবার ফিরাও মোরে' মর্ত্যপৃথিবীর রম্যযাপনের প্রতি কবির পক্ষপাত ব্যক্ত করে। রবীন্দ্রকাব্যধারার সবচেয়ে রহস্যময় কেন্দ্রবিন্দু 'জীবনদেবতা'র ধারণাটি 'চিত্রা' থেকেই বিকাশলাভ করেছে। 'সোনার তরী'র শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় যে সুন্দরীর দেখা কবি পেয়েছিলেন, যাঁর সঙ্গে এক অনির্দেশ্য যাত্রায় পাড়ি, তাঁকেই পরিপূর্ণ করতে চাওয়া 'চিত্রা'য়। পরবর্তী 'চৈতালি'ও এই ধারারই সংযোজন। 'মানসী' কবিতার প্রথম দুই পঙক্তি—

"শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী,
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে।"—

এই পারস্পরিকতা যথার্থ আধুনিকতাসম্মত। আর 'চিত্রা' ও 'চৈতালি' বাংলা কাব্যে নারী বিষয়ক ভাবনার ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় সংযোজন। এর কবিতাগুলি বাণীমূলক বা প্রোপাগান্ডাধর্মী নয়, ফলে তা সমসাময়িকতার সীমা ছাড়িয়ে চিরন্তন আবেদনে অমলিন।

রবীন্দ্রকাব্য-পরিক্রমার পরবর্তী পর্বও কবির আত্মানুসন্ধান ও পুরাতন ভারত-সংস্কৃতির প্রতি তীব্র আকর্ষণের এক পর্যায়। প্রাচীন ভারতের ঔপনিষদিক দর্শন, মানবতার চিরন্তন মাহাত্ম্যের মধ্যে তিনি সন্ধান করেন ত্যাগ ও কল্যাণের শক্তি। পাশ্চাত্যের যন্ত্রসভ্যতাশাসিত তথাকথিত আধুনিকতার বিপ্রতীপ মেরুতে এই ভাবনার অবস্থিতি। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তিনটি কাব্যগ্রন্থ এই অন্তর্লীন ঐক্যের সূত্রে যেভাবে গ্রথিত, তেমনি বিষয় ও ভাবের বৈচিত্র্যে তাদের মধ্যে বিস্তর ফারাকও লক্ষ্যণীয়। 'কথা ও কাহিনী' কাব্যের 'কথা' অংশ মুখ্যত ঐতিহাসিক ঘটনা ও কিংবদন্তী নির্ভর। আর কাহিনী অংশ কল্পনাপ্রসূত। কাহিনীধর্মিতা যার প্রধান গুণ। এই ধাঁচের কবিতা আগে-পরের পর্বগুলিতেও পাওয়া যায়, ফলে বোঝা যায় কাহিনীমূলক কবিতার প্রতি কবির একটি নিরীক্ষাধর্মী পক্ষপাত ছিল। 'কথা'র দেবতার গ্রাস'-এর মর্মান্তিক পরিণতি যেমন পাঠক আনুকূল্য পেয়েছে তার বিষয়গত আবেদনেই, তেমনি 'কাহিনী'র 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' প্রভৃতি নাট্যরসসমৃদ্ধ দীর্ঘ কবিতা মহাকাব্যের নব মূল্যায়ন ও উক্তি-প্রত্যুক্তির আঙ্গিকে কাব্যক্ষেত্রে গভীরতর বোধ সঞ্চারণে সমর্থ। 'ভাষা ও ছন্দ'-র মতো কবিতায় বাল্মীকির কবিত্বলাভ সুমধুর ও ভাবোপযোগী ভাষাবুননে জীবন্ত হয়ে ওঠে। "সেই সত্য যা রচিবে তুমি,/ঘটে যা তা সব সত্য নহে।/কবি, তব মনোভূমি/রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"—এ তো কেবল কাব্যিক

প্রকাশমাত্র নয়, ভাব ও ভঙ্গির সুদক্ষ সমন্বয় বাঙলার পাঠকের সামনে খুলে যাচ্ছিল এক নবদিগন্ত, বঙ্গজন ক্রমশ উপলব্ধি করছিলেন পাঠক হিসেবেও পরিণত, দীক্ষিত হবার প্রয়োজন। ‘কল্পনা’ও এভাবেই বৈচিত্রসাধনে তৎপর ছিল। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, ছন্দস্পন্দে কবিতা থেকে কবিতায় বক্তব্য ও বিষয়ের নিরিখে পার্থক্য সূচিত না হলে প্রাকরণিক ঔৎকর্ষসাধন সম্ভব হবে না। ফলে, ‘মদনভস্মের পর’ কবিতায় যেমন দেখি,

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী—
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।"—

এই শৈল্পিক হাহাকার, তেমনি একই কাব্যগ্রন্থ ধারণ করেছে ‘স্বপ্ন’ কবিতায় সুদূর এক স্বপ্নপুরী উজ্জয়িনী নগরীর স্বপ্নিল দিনগুলি রাতগুলির গল্প—"দূরে বহুদূরে/স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে/খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে/মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।" এই রোমান্টিক আবেশ যেমন সত্য, তার প্রকাশভঙ্গিময় পঙক্তিতে পঙক্তিতে ভাবের বিস্তার যেমন সেই রোমান্টিকতার উপযোগী, তেমনি যখন ‘সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া’, সেই ‘দুঃসময়’-এও দুর্মর আশায় ‘তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, /এখনি, অন্দ, বন্ধ কোরো না পাখা।’—‘কল্পনা’রই অংশ। নিছক কল্পনাবিলাস নয়, এই কাব্যগ্রন্থ বাংলা ভাষার বহনক্ষমতার এক অসাধারণ নিদর্শন।

"আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা—
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।"

—‘বর্ষামঙ্গল’-এ ভাষার আলঙ্কারিক দিকগুলির কী চমৎকার প্রয়োগ। পরিমিতিবোধের যাথার্থ্যে তা আরোপিত নয়। এই বছরের তৃতীয় কাব্য ‘ক্ষণিকা’ আবার আশ্চর্য এক কাব্য, কবি হালকা চালে গভীর কথা বলতে চান সেখানে। ছন্দের আপাত সহজ চলন, বক্তব্যের ‘ক্ষরিকত্ব’ এই কাব্যের শাশ্বত হয়ে ওঠায় সহায়ক হয়েছে, অন্তরায় নয়। ‘ক্ষণিকা’ যেন একটু বিরাম, ভারী আলোচনার ফাঁকে পরিশীলিত লঘুতা।—"মনেরে আজ কহো যে,/ভালো মন্দ যাহাই আসুক/সত্যেরে লও সহজে।"—জীবনের সঙ্গে এই সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত ‘বোঝাপড়া’র পাশাপাশি এই কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতাই কাব্যতত্ত্ব-শিল্পতত্ত্বের গূঢ়-গভীর কথা নিতান্ত খেলাচ্ছলে বলে যায়। ‘ক্ষতিপূরণ’ কবিতাটিই যেমন—

"আমি নাবব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে—
ঠেকল কখন্ তোমার কাঁকন—
কিঙ্কিনিতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।"

এই পর্যায়টি বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যমন্ডিত। 'কথা ও কাহিনী'র আখ্যানধর্মিতা, 'কল্পনা'র উদাত্ত আশাবাদ, 'ক্ষণিকা'র আপাত লঘু চলনের পাশেই রয়েছে 'নৈবেদ্য'র সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ কবিতাগুলি। এই কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতা যেন এক একটি স্তোত্র। সবাজাত্যবোধ-স্বদেশপ্রেম-পুরুষকার এর মূল মন্ত্র, কিন্তু তা কোনো অর্থেই সংকীর্ণ নয়, জাতীয়তাবাদী উগ্রতায় তা কলুষিত নয়।

"এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার..."

—এই উচ্চারণ যেন এক স্বগত পরআর্থনা। অপরকে ছোট, হীন প্রতিপন্ন করে নিজেকে বাড়িয়ে তোলার নয়, যথার্থ আত্মিক ও বৌদ্ধিক উন্নতি সাধনই এই কবিতাবলীর মর্মবস্তু। একটি জাতির নিজ উৎকর্ষের প্রতি সামূহিক আকাঙ্ক্ষাই যেন মন্ত্রগম্ভীর রূপ পরিগ্রহ করেছে এই কাব্যে।

এই কাব্যের পরবর্তী অংশে কবি স্ত্রী মৃণালিনী দেবী ও পুত্র-কন্যার মৃত্যুর মর্মন্তুদ অভিঘাতে লিখেছেন 'স্মরণ', 'শিশু' ও 'উৎসর্গ'। 'স্মরণ' বাংলা কাব্যজগতের এক অবিস্মরণীয় শোকগাথা। ব্যক্তিক দুখবোধের সর্বজনীন রূপ দেখতে পাই। অথচ শোকের সীমায়িত পরিসর ছেড়ে এই কাব্যে শোকের এক গভীর উদযাপন। ব্যক্তিক সীমা অতিক্রম করেছে বলেই তা ভাবোচ্ছ্বাসে পরিণত হয়নি। কাঙ্ক্ষিত নিভৃতি তাতে বিদ্যমান। একান্তে পড়ার ভীষণভাবে উপযোগী এই কাব্য—

"আমার জীবনে তুমি বাঁচো, ওগো বাঁচো—
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচো।
যেন আমি বুঝি মনে

অতিশয় সংগোপনে
তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ।
আমারি জীবনে তুমি বাঁচো, ওগো বাঁচো।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যকৃতির পরবর্তী পর্যায়ের নাম দেওয়া চলে 'গীতাঞ্জলি পর্ব'। 'গীতাঞ্জলি' (১৯১১ খ্রি.), গীতিমাল্য (১৯১৪ খ্রি.) ও গীতালি (১৯১৫ খ্রি.)—এই তিন গীতধর্মী কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যাবে রাবীন্দ্রিক অধ্যাতমচেতনার নিবিড় পরিচয়। 'গীতাঞ্জলি'ই সম্ভবত কবিকে এনে দেয় বিশ্বজনীন পরিচিতি। এর ইংরেজি অনুবাদ 'Song Offerings'-এর জন্যই ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে কবি নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন। এই তি কাব্যগ্রন্থে যে অধ্যাত্মবোধের দেখা মেলে, তা কিন্তু প্রথাগত কোনো ধর্মীয় সংকীর্ণতার প্রতিফলন নয়। কবির জীবনদেবতাই এর কেন্দ্রে, তাই তাঁর চালিকাশক্তি। মনুষ্যধর্মের পরিপূর্ণ বিকাশ ও বিশ্বের হৃদয়তন্ত্রীতে নিয়ত বাজতে থাকা সুরের সঙ্গে ব্যক্তিমনের যোগ এই ভাবনার প্রধান দিক।

"অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে।
জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভর করো হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।"—

এই সুগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ আলোচ্য পর্বের মূল সুর। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বলাকা' থেকে কবিমনের আরেক বাঁকবদল চোখে পড়ে। আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের অনুমানে তিনি উপলব্ধি করেছেন, যুগান্তর কড়া নাড়ছে মহাকালের দোরে। মুক্তকের ছকভাঙা ছন্দে কবি আহ্বান করলেন, নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব আশ্রয় ছেড়ে ঝড়-ঝঞ্ঝাময় প্রতিকূল সমুদ্রে পাড়ি দেবার। 'সবুজের অভিযান' তেমনই সর্বনেশে দুঃসাহসী তারুণ্যের জয়গান গায়। 'ঝড়ের খেয়া' শুনিয়ে যায় সেই 'চরৈবেতি' মন্ত্র—

"ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি
ডাকিছে কান্ডারী,
এসেছে আদেশ—

বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,"—'পুরনো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা'র দিন শেষ। জীর্ণ পুরাতনকে ছেড়ে, সঞ্চয়ের নিরাপত্তা ভেঙে সমস্যাসংকুল বাস্তবতায় অপরিচিতের আহ্বানে ঝাঁপ দিতে হবে, এই গতিময়তা 'বলাকা'কে অনন্যতা দান করেছে। 'বলাকা'র 'ছবি', 'শাজাহান' প্রভৃতি কবিতায় এই যাত্রারই ভিন্নরূপ প্রকাশিত। ফরাসি দার্শনিক বের্গসঁর গতিবাদ রবীন্দ্রমননকে কিঞ্চিৎ প্রভাবিত করেছিল এই সময়, এমনটা অনেকেই মনে করেন। 'পলাতকা' (১৯১৮ খ্রি.) ও 'লিপিকা' (১৯২২ খ্রি.)র রচনাগুলি পেরিয়ে এই পর্বের শেষ অংশে যখন রবীন্দ্রকবিতা উপনীত হলো, তখন তাতে

এক আত্মগত গোধূলির ছোঁয়া। 'পূরবী' (১৯২৫ খ্রি.) কাব্যগ্রন্থের স্নিগ্ধতা সেই অনাস্বাদিতপূর্ব শান্তির আকর। "বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিনীর বীণ" আসল রবিমনের তদগত এক অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ, যেখানে এসে স্তিমিত হতে চেয়েছে যাবতীয় প্রাকরণিক কৃৎকৌশল, উদ্যোগ, সৃজনী অস্থিরতা। 'লিপিকা'র কথা আলাদা করে বলতে হয়, কারণ এই গ্রন্থে কবিতার ভাষা ও ভঙ্গির নবনিরীক্ষায় কবি খুঁজতে চেয়েছেন জীবন আনন্দ। গদ্যকবিতার এক পূর্বাভাস যেন এটি।

গদ্য আঙ্গিকে রচিত কবিতা, যাতে ছন্দের চেনা স্পন্দ থাকে না, থাকে না পংক্তি বিভাজনের শৃঙ্খলাবদ্ধ বাধকতা, তারই পরিপূর্ণ প্রয়োগ পরের পর্যায়টিতে, যাকে বিশেষজ্ঞরা 'পুনশ্চ পর্ব' নামে অভিহিত করেছেন। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের প্রভৃতি গদ্যকবিতায় দৈনন্দিনের তুচ্ছ 'বাঁশি', 'ক্যামেলিয়া' 'সাধারণ মেয়ে'র মতো বিশ্বমানবতার জয়গান গাওয়া কবিতায় 'শিশুতীর্থ' সাধারণ মানুষকেই পাওয়া গেল নতুন চেহারায়। রবীন্দ্রনাথ ষড়যন্ত্র ও বর্বরতার উল্টোদিকে বসাতে চেয়েছেন চিরজীবিত আদর্শকে—"জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।" যাঁরা রবীন্দ্রকাব্যের বাস্তবতাবর্জিত রূপ নিয়ে মুখর ছিলেন, তাঁরা এই পর্যায়টিকে খতিয়ে দেখতে চাননি। ভিড়ের মধ্যে একাকার হয়ে যাওয়া বৈশিষ্ট্যহীন মানুষের প্রতি সহমর্মিতা 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট' বা 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থে ছায়াপাত করেছে। 'পত্রপুট'-এর 'পৃথিবী' নামক দীর্ঘ কবিতাটি প্রৌঢ় কবির শ্রদ্ধার্ঘ্য মহাকাল ও প্রকৃতির বিপুল, উদাস, বৈচিত্র্যময় রাহস্যিকতার প্রতি।

এরপরেই আসে রবীন্দ্র কাব্যধারার শেষ পর্যায়। 'প্রান্তিক' (১৯৩৮ খ্রি.) 'সেঁজুতি' (১৯৩৮ খ্রি.), 'সানাই' (১৯৪০ খ্রি.)-তে পাওয়া যায় জীবনের অন্তিম পর্বে উপগত কবির মৃত্যুচেতনা ও জীবনের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা-কৃতজ্ঞতা। 'প্রান্তিক'-এর কবিতাগুলি প্রায় মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসে রচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও 'সভ্যতার সংকট' ক্রমে ঘনীভূত হয়েছে কবির মনে। কিন্তু সর্বগ্রাসী সেই অমঙ্গলের দিনেও তিনি মনুষ্যত্বের প্রতি তাঁর আস্থা অটুট রেখেছেন। সেই বিশ্বাসেরই জয়গান ধ্বনিত 'রোগশয্যায়' (১৯৪০ খ্রি.), 'জন্মদিনে' (১৯৪১ খ্রি.) ও 'শেষলেখা' (১৯৪১ খ্রি.)-য়। এই পর্যায়ের 'আরোগ্য কাব্যগ্রন্থে শুনি সেই অমোঘ বাণী, ঔপনিষদিক উষ্ণতায় যা সুমধুর—"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধুলি।" শেষ পর্যায়ে উপনীত কবি তাঁর ফেলে আসা জীবনের মূল্যায়নের ছোঁয়া রাখেন 'জন্মদিনে'র কবিতাগুলিতে। আর 'শেষ লেখা' তাঁর অন্তিম প্ররতি সেই কেন্দ্রীয় রহস্যের অপারতাকে, যে প্রশ্নাতুর নবীন কৌতূহলে এই ধরিত্রী নিত্যনবায়মান—

"বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,
কে তুমি—
পেল না উত্তর।"—

উত্তর বঙ্গসাহিত্যের পাঠককুলও খুঁজে পান না প্রায়। এই অলৌকিক প্রতিভার সর্বব্যাপ্ত প্রভাব কাটাতে প্রয়াসী হয়েছিল ‘কল্লোল’, ‘কালিকলম’, ‘প্রগতি’র সাহিত্যজীবীরা। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে চাওয়া যে প্রকারান্তরে তাঁকে সর্বোচ্চ স্বীকৃতিদান, এই উপলব্ধিতেই গতিশীল থেকেছে পরবর্ত্তীর বাংলা কবিতা। আমরা বলতে পারি, রবীন্দ্রসৃষ্টির এই মহাজাগতিক বিশালতাকে আসলে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে সত্যের প্রতি, আনন্দের প্রতি, শিল্প ও মঙ্গলের প্রতি আমরণ দায়বদ্ধতা—

“সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।”

—(এ দ্যুলোক মধুময়/আরোগ্য)

৮.৫ কবিকৃতি : গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী বাল্যবয়েসে কিছুদিন গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান ও ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক জ্ঞান ছিল। অল্প বয়েসে বিবাহিতা গিরীন্দ্রমোহিনীর জীবন সংসার ও স্বামীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে। বিবাহের পর প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চায় ছেদ পড়লেও স্বামীর উৎসহে তাঁর চিত্রকলা ও কাব্যচর্চা চলতে থাকে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ‘জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী’ নামে তাঁর একটি অনামা গ্রন্থ প্রকাশ পায়। স্বামীকে লেখা কয়েকটি পত্রের সমাহার এই গ্রন্থ। তবে এর বিশেষ প্রচার হয়নি। ওই একই বছরে তাঁর ‘কবিতাহার’ গ্রন্থটিও ‘জনৈক হিন্দুমহিলা প্রণীত’ নামে প্রকাশিত হয়। মাত্র পাঁচটি কবিতা সম্বলিত এই গ্রন্থ ‘বঙ্গদর্শন’-এ বঙ্কিমচন্দ্রের তুমুল প্রশংসা লাভ করেছিল। গিরীন্দ্রমোহিনীর সবচেয়ে প্রচারিত ও জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ ‘অশ্রুকণা’ স্বামীর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ অভিঘাতে রচিত। স্বয়ং অক্ষয়কুমার বড়াল এই কাব্য সম্পাদনা করেছিলেন। স্বামীহারা অবরোধবাসিনীর দ্বিতীয় কোনো অবলম্বন ছিল না স্বামী ছাড়া। আর তাই সেই একাকিত্বে কাব্যচর্চাকে আঁকড়ে ধরায় তৈরি হলো বাংলা কাব্যধারায় নারীসত্তার এমন এক একক ও ভিন্ন স্বর, যাকে শিল্পগুণের নিরিখে তেমন উৎকৃষ্ট মনে না হলেও, আলাদা করে চিনে নিতে অসুবিধে হওয়ার কথা না।

“তুমি কি গিয়ছে চলে? না না তা ত নয়।
য’দিন বাঁচিব আমি, ত’ দিন জীবিত তুমি
আমার জীবন যে গো শুধু তোমা-ময়।
তুমি দাতা আমি কেবা, শূন্য-শূন্যময়।
তুমি কি গিয়াছ চলে তা ত নয়, নয়।

স্মৃতির মন্দির মম প্রতিষ্ঠিত দেবসম
চিরবিরাজিত তুমি, অমর প্রাণেশ।
চিরজন্ম স্মৃতি তুমি, সৌন্দর্য অশেষ।"

—এই উচ্চারণের সবচেয়ে বড়ো গুণ এর সততা ও আন্তরিকতা। বাংলা শোককাব্যের ইতিহাসে এই কাব্য পথিকৃৎসদৃশ। কবির জীবৎকালের মধ্যেই 'অশ্রুকণা'র চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, যা এর অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয়তার পরিচায়ক।

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)

বঙ্কিম সমসাময়িক 'ঝাঁসির রাণী' খ্যাত সাহিত্যজীবী শ্রীচণ্ডীচরণ সেনের কন্যা কামিনী রায় পিতৃসান্নিধ্যে ব্রাহ্ম ভাবধারা ও পরিশীলিত সাহিত্যবোধে দীক্ষিত হয়েছিলেন। উচ্চশিক্ষিতা ও বেথুন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হওয়ার সুবাদে কামিনী রায়ের একটি আভিজাত্য ছিল, যার প্রতিফলন তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়। নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে আজন্ম সচেষ্ট কামিনী রায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Some Thoughts on the Education of our Women'। হেমচন্দ্রের অনুরাগী এই কবির রাবীন্দ্রিক রুচির মধ্যে 'গভীরতা ও সজীবতা'র সন্ধান সেভাবে পাননি। আর এই উপলব্ধিই রবীন্দ্র সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আলাদা করে দেয়। রবীন্দ্রঅনুসারীদের নিয়ে তাঁর তীব্র আপত্তি ছিল। একটি স্বতন্ত্র সন্ধানী ছিলেন তিনি, আলাদা পরিচয়ে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন নিজেকে। উনিশ-বিশের সংযোগকালীন সময়ে লিঙ্গ পরিচয়ে নারী এই কবির এমনতর আকাঙ্ক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯ খ্রি.) 'পৌরাণিকী' (১৮৯৭ খ্রি.) 'অশোকস্মৃতি' (১৯১৩ খ্রি.) প্রভৃতির নাম করা যায়। এসবের মধ্যে আলাদা করে তৃতীয় কাব্যটির কথা বলতে হয়, যা তাঁর প্রিয় পুত্রের অকাল প্রয়াণের স্মৃতিতে রচিত।

"অন্ধকার ছায় যথা ধরণীর বুক,
তেমনি আমার বক্ষ ভরে বেদনায়
এই শান্ত সন্ধ্যাকালে। দূরে শোনা যায়
আনন্দ-সংগীতধ্বনি। হাস্য ও কৌতুক,
নিরুৎসাহ চিত্ত মম অতি নিরুৎসুক,
খোঁজে লুকাবার স্থান, নীরবতা চায়
লয়ে তার স্মৃতিখানি। আঁধারের গায়
সে আমার স্থিরতারা চিরজাগরুক।"

—বাংলা কবিতার জগতে এভাবেই ব্যক্তিক সুর ক্রমে দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠালাভ করতে থাকে। লিঙ্গ পরিচয়ে মহিলা কবিদের তালিকায় কামিনী রায় আলাদা তাঁর শিক্ষিত রুচি ও দীক্ষিত কাব্যকৌশলের

জন্য। বাকিরা যেখানে পারিবারিক গন্ডিবদ্ধ জীবনকেই কাব্যে রূপায়িত করেছিলেন, কামিনী রায় সেই চৌহদ্দি কিছুটা হলেও ভেঙেছিলেন, অথবা সেই চেনা গন্ডিতেও লগিয়েছেন ক্ষণিক নূতনতার ছোঁয়া।

৮.৬ সারাংশ

উনিশ শতকের প্রথম থেকেই শিল্প-সমাজ সাহিত্যে ব্যাপক পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাহিত্যের অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ধর্ম-কেন্দ্রিক দৈবী ভাষায় প্রকাশ ছিল। ঈশ্বর বা দেবদেবী কাব্যক্ষেত্রকে দমন করে রেখেছিল। ইউরোপীয় প্রভাব বড় প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁরাই দেবমাহাত্ম্য বাদে অন্য ধরনের কবিতা লিখলেন। তারপর পাশচাত্য প্রভাবে মধুসূদন সাহিত্যের মহাকাব্য রচনা করলেন। তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রও মহাকাব্য লিখলেন। অন্যদিকে আত্মমগ্ন হলেন বিহারীলাল। রবীন্দ্রনাথ মূলত গীতিকবি। মহিলারাও এ বিষয়ে অগ্রসর হলেন—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায় কবিতায় বিশেষ মর্যাদা দাবি করেন।

তাই পরিশেযে বলতে হয়, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত কাব্যেরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে।

৮.৭ অনুশীলনী

১। বাংলা কাব্যের জগতে উনিশ শতক কীভাবে আধুনিকতার উন্মেষ ঘটিয়েছিল, তা সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে বিচার করুন। প্রাক্-উনিশ শতক কাব্যধারা থেকে এই যুগের সাহিত্যচর্চা কীভাবে আলাদা, আলোচনা করুন।

২। কবি-সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্তকে 'যুগসন্ধির কবি' হিসেবে অভিহিত করাটা কতখানি যুক্তিসঙ্গত, তাঁর কাব্যকৃতির বিশ্লেষণসহ আলোচনা করুন।

৩। জাতীয়তাবাদী ভাবধারার কাব্য রূপায়ণে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'মহাকাব্যের যুগ' কীভাবে হেম-মধু-নবীনের লেখনীতে সমৃদ্ধ হয়েছিল, আলোচনা করুন।

৫। বাংলা কাব্যধারায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৬। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যধারা বিশ্লেষর করে মাইকেল পরবর্তী যুগে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের দিকগুলি চিহ্নিত করুন।

৭। নবীনচন্দ্র সেনের ত্রয়ী মহাকাব্য কীভাবে পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণকে ভিন্নভাবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছে, আলোচনা করুন।

৮। বাংলা গীতিকবিতার ধারায় বিহারীলাল চক্রবর্তীর কৃতিত্ব বর্ণনা করে তাঁকে 'ভোরের পাখি' অভিধায় ভূষিত করা কতখানি যুক্তিসঙ্গত, আলোচনা করুন।

৯। রবীন্দ্রকবিতার পর্যায়গুলি আলোচনা করে তাঁর সামগ্রিক কাব্যকৃতির মুখ্য বিবর্তনের জায়গাগুলি চিহ্নিত করুন।

১০।কবি হিসাবে গিরীন্দ্রমোহনী দাসীর কৃতিত্ব কতখানি তার আলোচনা করুন।

১১।কামিনী রায়ের কবিপ্রতিভার পরিচয় দিন।

৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*—সুকুমার সেন

২। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় খণ্ড)*—ভূদেব চৌধুরী

৪। *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য*—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

মডিউল : ৩

বাংলা নাটক

একক ৯ ❑ আধুনিক বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ

গঠন

৯.১ উদ্দেশ্য

৯.২ প্রস্তাবনা

৯.৩ আধুনিক বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ

৯.৪ সারাংশ

৯.৫ অনুশীলনী

৯.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৯.১ উদ্দেশ্য

আধুনিক বাংলা নাটকের উদ্ভবের সঙ্গে নাট্যশালার উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে এদেশে রঙ্গালয় ও নাটক পারস্পরিক সম্পর্কে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে এগিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষে সংস্কৃত নাটকের একটা বিশাল ঐতিহ্য আছে। একাদশ শতক পর্যন্ত সংস্কৃত নাটকের প্রণয়ন ও অভিনয় হয়েছিল। এরপর মুসলমানদের দ্বারা ভারত বিজিত হয়। সংস্কৃত নাটকে শূদ্রক, ভবভূতি ও কালিদাসের মতো বিখ্যাত নাট্যবিদ্‌দের জন্ম হয়েছিল। রাজাদের আনুকূল্যে এ নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল রাজাদের বিলুপ্তির সঙ্গে সংস্কৃত নাটকেরও মৃত্যু ঘটে। তাছাড়া গ্রামজীবনে যাত্রাও হত। যাত্রা বলতে প্রাচীনকালে উৎসব উপলক্ষে গমন বোঝাত। মঙ্গলগান, লোকসঙ্গীত, পালাগান এসবের মধ্যে যাত্রার অঙ্কুর ছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দও বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যাত্রার প্রভাব আছে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ঝুমুর ও ধামালী গান যাত্রার দ্বারা প্রভাবিত। মঙ্গলগান ও রামায়ণ মহাভারত আগে পাঁচালীর দ্বারা প্রভাবিত। পাঁচালির দুই অঙ্গ গান ও ছড়া বা পয়ারে। চৈতন্যদেবের আগে যে যাত্রার অভিনয় হত তার প্রমাণ ‘চৈতন্য ভাগবতে’ পেয়েছি। এই পরিস্থিতি এবং অজস্র কঠিন পথ পার হয়ে আধুনিক বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। বাংলা নাটক পাঠে, তার গুরুত্ব বিশ্লেষণে এবং বাংলা নাটকের সমালোচনায় বাংলা নাট্যমঞ্চ এবং নাটকের উদ্ভব কিভাবে হল তার ধারণা থাকা জরুরি। নাটকের সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের অবস্থা ও অবস্থান জড়িত। বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশে নাট্যমঞ্চের অভিনয় উপযোগী নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। নাটক দৃশ্যকাব্য এবং অনেকক্ষেত্রেই তা নাট্যমঞ্চে অভিনীত হওয়ার যোগ্য। নাটক বিচারের সময়ে অভিনয় মূল্য ও সাহিত্য মূল্য বিচার করা দরকার।

৯.২ প্রস্তাবনা

ভারতীয় নাটকের যে কোনো আলোচনায় ঐতিহ্যশালী সংস্কৃত নাটকের কথা মনে রাখা দরকার। ঋগ্বেদের মধ্যে নাটকের মৌলিক উপাদান আছে। 'পুরুরবা ও উর্বশী', 'যম ও যমী' বা 'সরমা ও পনি' ইত্যাদি সূক্ত বা গাথা পরবর্তীকালে নাট্যরচনায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। এমনকি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে উদাত্ত অনুদাত্ত উচ্চারণে অভিনয়ের বীজ লুকিয়ে আছে।

আচার্য ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' বইটিতে উল্লেখ আছে যে বৈদিক যুগের পরে মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা পঞ্চম বেদ হিসেবে নাটকের সৃষ্টি করেন। 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে জানা যায় যে মহেন্দ্রর বিজয়োৎসব অথবা ইন্দ্রউৎসবকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত ভাষায় প্রথম নাটক 'দেবাসুর যুদ্ধ' অভিনীত হয়েছিল। তারপরে ব্রহ্মা হিমালয়ে সঙ্গীসাথীদের নিয়ে 'ত্রিপুরদাহ' অভিনয় করে। এই নাটকের অভিনয় অসুরদের উপদ্রবে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে নাট্যবেশ্ম তৈরি করতে বলে। এই 'নাট্যবেশ্ম' থেকে নাকি 'নাট্যগৃহ'-র উৎপত্তি। তারপর থেকে নাট্যমঞ্চে অভিনয়ের রীতি প্রবর্তিত হয়।

অশ্বঘোষের লেখা 'সারিপুত্রপ্রকরণ' সংস্কৃতে লিখিত নাটকের প্রাচীনতম পরিচয়। এই নাটকটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি। এছানা সুবন্ধুর *স্বপ্নবাসবদত্তা*, ভাসের তেরোটি নাটক, শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক*, কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তলম বিক্রমোর্বশী*, *মালবিকাগ্নিমিত্র* ইত্যাদি নাটক ষষ্ঠ শতকে রচিত হয়েছে। সপ্তম শতকে হর্ষের রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, অষ্টম শতকে ভবভূতির *মালতীমাধব*, *উত্তরচরিত*, *মহাবীরচরিত*, নবম শতকের গোড়ায় বিশাখাদত্তের *মুদ্রারাক্ষস*। ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার, দশম শতকে মুরারির *অনর্ঘরাঘব*, রাজশেখরের *কর্পূরমঞ্জরী*, *বালরামায়ণ*, ক্ষেমীশ্বরের *চণ্ডকৌশিক* ইত্যাদি নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে নবাবী শাসনকালে কিছু সংস্কৃত নাটক রচিত হয়েছে। এর মধ্যে রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটক, কবি কর্ণপুরের *চৈতন্যচন্দ্রোদয়*, রায় রামানন্দের *জগন্নাথবল্লভ* উল্লেখ্য। এগুলি ভারতীয় নাট্যমঞ্চের আদর্শে নির্মিত কোনো মঞ্চে অভিনীত হয়নি।

যাত্রা—অনেকের মতে, 'পাঁচালি' থেকে যাত্রার উদ্ভব হয়েছে। মধ্যযুগের আখ্যানমূলক রচনা পাঁচালীরূপে চিহ্নিত হত। উনিশ শতকে 'ভাসান যাত্রা'র উল্লেখ পাই। কৃষ্ণকে উপলক্ষ করে কৃষ্ণযাত্রা গড়ে উঠেছিল। একইভাবে দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা ইত্যাদি।

কেউ কেউ মনে করেন 'নাটগীত' থেকে যাত্রার উৎপত্তি। মধ্যযুগে বাংলায় দেবতার উৎসব উপলক্ষে যে নৃত্যগীত পরিবেশিত হত তাকেই নাটগীত বলা হত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ অথবা বড়ুচণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন এ ধরনের নাটগীত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অভিনয় অর্থে যাত্রা শব্দটি ব্যবহৃত 'চৈতন্য ভাগবতে' আছে 'অঙ্কের বিধানে নৃত্য'। চৈতন্যদেব মুক্তমঞ্চে অনেকটা যাত্রার মতো অভিনয় করতেন।

এখানে রুক্মিনীহরণ ও ব্রজলীলা অভিনয় হয়েছিল। কবিকর্ণপুর, রায়রামানন্দ, রূপ গোস্বামী, দেবীনন্দন সিংহ—এরা যাত্রাপালা লেখেন।

অষ্টাদশ শতকে কৃষ্ণযাত্রা ছিল। তার নাম *কালীয়দমন*। বীরভূমের কেন্দুবিল্ব গ্রামের শিশুরাম ছিলেন যাত্রার জনক। শিশুরামের শিষ্য পরমানন্দ অধিবাসী কালীয়দমন যাত্রার ব্যাসদেবকে যুক্ত করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন।

এরপর শ্রীদাম, সুবল এবং তাঁর শিষ্য বদনের দান, মান-মাথুর লীলাশ্রয়ী যাত্রাপালা বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। যাত্রাশিল্পী হিসাবে রাধাকৃষ্ণ দাস, পীতাম্বর অধিকারী, নালীম্বর মুখোপাধ্যায় প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। এইসময় কৃষ্ণযাত্রার বেশি প্রচলন থাকলেও চণ্ডীযাত্রা, রাসযাত্রা, মনসার ভাসানযাত্রা প্রচলিত ছিল।

উনিশ শতক বাংলার নবজাগরমের যুগ, সেসময়ে যাত্রাপালা সংসারের কাজে এগিয়ে গেলেন শ্রীদাম দাস, সুবল দাস অধিকারী এবং পরমানন্দ অধিবাসী, উনিশ শতকে দ্বিতীয় ভাগে বলিরাজার যাত্রা, নলদময়ন্তী, কামরূপযাত্রা, নন্দবিদায়যাত্রা, রাজা বিক্রমাদিত্য যাত্রা ইত্যাদির অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। কলকাতায় আশেপাশে ধনীবাড়িতে নানা যাত্রাপালা মঞ্চস্থ হয়।

গোপাল উড়ের যাত্রাপালার জনপ্রিয়তা এত বেশি ছিল যে শ্যামবাজারে নবীন বসুর বাড়িতে ১৮৩৫ সালে নতুন রীতিতে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়েছিল। গোপাল উড়ের শিষ্য ছিলেন কৈলাস বারই। একইভাবে লোকাধোপা নামে পরিচিত লোকনাথ দাস সেই সময় গোপাল উড়ের মত ও ভাব অনুসরণ করে রচনা করেন বিদ্যাসুন্দর। 'বিদ্যাসুন্দর', 'নলদময়ন্তী', 'শ্রীমন্তের শ্মশান' এবং কলঙ্কভঞ্জন যাত্রাপালা হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

এই সময় দেশের বিশৃঙ্খল সমাজ মানসের সঙ্গে যোগরক্ষা করতে গিয়ে এবং কবিগান, পাঁচালি, তরজা, হাফ আখড়াই, বুলবুলির লড়াই ইত্যাদির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে যাত্রার মধ্যে অশ্লীলতা, নীতিহীনতা, প্রশ্রয় পেয়েছিল। মানুষের আদিম প্রবৃত্তির বিকৃত চিত্রের মাধ্যমে জনগণের মনোহরণের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু বেশিদিন এই স্থূলরুচির যাত্রাপালা মানুষকে প্রলুব্ধ করে রাখতে পারেনি।

৯.৩ আধুনিক বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ

উনিশ শতকে নাট্যমঞ্চের যবনিকা উত্তোলিত হলে বাংলা নাটকের আত্মপ্রকাশ। নাটকের মধ্যে যে চেতনা প্রকাশিত হচ্ছিল তা জানতে গেলে তৎকালীন সমাজের ভাব ও ভাবনার খোঁজ নেওয়া দরকার। উনিশ শতক বঙ্গদেশের বিবর্তনকাল। সমাজের ধ্যানধারণা চিন্তাচেতনার উন্মেষপর্ব। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়ের পর সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে ধীরে পাল্টাতে শুরু করল প্রাচীনবিলাসী সাবধানীর ফল তার গতি রুদ্ধ করতে চাইল। ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে মেকলে, বেন্টিঙ্ক, রামমোহন, ডেভিড হেয়ার

অগ্রণী হলেন। হিন্দু কলেজ থেকে ছড়িয়ে পড়ল নবযুগের দ্যুতি। হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষাবিদদের অন্যতম। আবার রামমোহন রায়ের অদ্বৈতবাদী চিন্তাধারা ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন প্রাচীন হিন্দু সমাজে ক্ষুব্ধতা সৃষ্টি করল, ব্রাহ্মরা সমাজ সংস্কারেও মন দিলেন। হিন্দু সমাজের পক্ষে তা গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি প্রাথমিক পর্বে। ফলে সে সময়ে রচিত বাংলা প্রহসনে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষ উপচে পড়ল, উনিশ শতকের মাঝামাঝি এলেন বিদ্যাসাগর, সমাজের সম্মিলিত শক্তির প্রবল বাধা বিধবাবিবাহ আইন পাস হল। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হল। তার প্রভাব থেকে বাংলা নাটক বিরত ছিল না।

বাংলার রাজনৈতিক জীবনেও হল পটপরিবর্তনের সূচনা, ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল উত্তর ভারতে। সিপাহী বিদ্রোহের ছোঁয়াচ যেমন বাঙালি সমাজে লাগেনি। তেমন তা বাংলা নাটককেও প্রভাবিত করেনি। এই দেশে নীলচাষীরা দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজদের কাছে চরম নির্যাতন সহ্য করেছিল। উর্বর চাষের জমি নীল চাষের জমিতে পরিণত করছিল সাহেবরা। উপোসী কৃষকের দলের কপালে নীলকর সাহেবদের বেত্রাঘাত ছাড়া কিছুই জুটত না।

বাংলাদেশের সমাজ রাজনৈতিক এই পটভূমিকায়। বাঙালি নাট্যকারদের প্রথম পর্বের আবির্ভাব। উমেশচন্দ্র মিত্রের মতো নাট্যকাররা বিধবাবিবাহকে সমর্থন করলেন তার ‘বিধবাবিবাহ নাটক’-এর উদাহরণ। ‘চপলাটিও চাপল’ নাটকের লেখক যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় বিধবার বিয়ে দিয়ে দিলেন। তা সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্দান্ত বৈপ্লবিক কাজ। শিমুয়েল পীরবক্স লিখলেন ‘বিধবাবিবাহ’ নাটক। মনোমোহন বসুর মতো রক্ষণশীল নাট্যকারও বিধবাবিবাহকে সমর্থন করেছিলেন। শিক্ষিত জনমত একদিকে যেমন বিধবাবিবাহকে সমর্থন করার কথা ভাবছিল তেমনি বাল্যবিবাহের বিরোধী হয়ে উঠেছিল। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হল, ‘সম্বন্ধ সমাধি নাটক’-এ। শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের ‘বাল্যবিবাহ নাটক’, রামচন্দ্র দত্তের ‘বাল্যবিবাহ’ এবং শ্যামাচরণ শ্রীমানীর ‘বাল্যোদ্বাহ’ নাটক উল্লেখ্য। কুলীন রামনারায়ণ আঘাত করলেন কৌলীন্যপ্রথাকে। প্রাচীন ধনশালী, প্রভুত্বকামী সমাজের বিকৃতি ও ব্যাধি তৎকালীন অনেক নাটকের বিষয় ছিল। যাঁরা নব্যভাবাপন্ন আদর্শবাদী চরিত্র আঁকলেন— সেসব চরিত্র তেমন প্রাণবন্ত হল না। তুলনায় নিন্দনীয় চরিত্রগুলো হয়ে উঠল। প্রাণস্পন্দনে পরিপূর্ণ। ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ কিংবা ‘সধবার একাদশী’ নাটকে নব্যসমাজের অধোগতি স্থান পেল। রাজনৈতিক চেতনা তৎকালীন নাটকে ব্যাপকভাবে রূপায়িত হয়নি ঠিকই, দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটক গণবিদ্রোহের পাঞ্চজন্য ধ্বনিত করেছিল। তাছাড়া রচিত হয়েছিল অনেক সামাজিক নক্সা। তার মধ্যে আছে ‘কলিকৌতুক নাটক’, (১৯৫৯) ‘চার ইয়ারে তীর্থ যাত্রা’ (১৮৫৮), ‘সপত্নী নাটক’ (১৮৫৮) রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত ‘বাল্যবিবাহ’, ‘চপলাচিত্ত চাপল্য’ (যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়), ‘বুঝলে কিনা’ (১৮৭৩), শ্যামাচরণ দে-র ‘বাসরকৌতুক’ নাটক (১৮৫৯) ইত্যাদি। অষ্টাদশ শতকের মাঝখান থেকে বাংলাদেশে বিদেশী রঙ্গালয়ের সূচনা সর্বপ্রথম নাট্যশালার দ্বার উদ্‌ঘাটন করলেন হেরাসিম স্টেপানোভিচ্ লেবেড। তিনি Bengalee Theatre নামে একটি নাট্যশালা স্থাপন করলেন এবং

তাতে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষাশিক্ষক গোলোকনাথ দাসের দ্বারা *The Disguise* এবং *Lone is the best Doctor* নামে দুটি ইংরেজি প্রহসনের বাংলা অনুবাদ করালেন। প্রহসন দুখানির মধ্যে বাঙালি দর্শকের রুচি অনুযায়ী অনেক দৃশ্য ও চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছিল। The Disguise-এর বাংলা অনুবাদ প্রথম অভিনীত বাংলা নাটক। সাসুসি থিয়েটার, ক্যালকাটা থিয়েটার ও যৌরঙ্গী থিয়েটার ইংরেজরা স্থাপন করেছিল।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার বাঙালি প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। এতে জুলিয়াস সীজার ও উইলসন অনূদিত *উত্তররামচরিত*-এর অভিনয় হয় বাঙালি পরিচালিত প্রথম যে বাংলা নাটক অভিনীত হয় তার নাম 'বিদ্যাসুন্দর'। নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালায় নাটকখানি প্রথম অভিনীত হয়। বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের পর নন্দকুমার রায় রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলার' কথা উল্লেখ করতে হয়। এর মধ্যে অনেকগুলি নাট্যশালা তৈরি হয়। তার মধ্যে আছে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া নাট্যশালা পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা ইত্যাদি। আধুনিক বাংলা নাটকের সূচনা অনুবাদকের মধ্যে প্রথমে হরচন্দ্র ঘোষের কথা বলতে হয়, তাঁর নাটকের ভাষা সংস্কৃত এবং আড়ষ্ট। তাঁর প্রথম নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস', 'কৌরব বিয়োগ' (১৮৫৮) হরচন্দ্রের দ্বিতীয় নাটক তাঁর আর নাটক 'চারুমুখ-চিত্তহরা (১৮৬৪) এবং 'রজতগিরি নন্দিনী (১৮৭৪)।

কালীপ্রসন্ন সিংহ রঙ্গালয় স্থাপন এবং বাংলা নাটকের অভিনয় ও অনুবাদে ভাবী নাট্যকারদের নাট্যরচনার পথ সুগম করে দিয়েছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রথম নাট্যরচনা 'বাবু' একটি প্রহসন। এটা কোথাও অভিনীত হয়েছে বলে জানা নেই। তিনি 'বিক্রমোর্বশী' অনুবাদ করেন। 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৮৫৮) নাট্যকারের মৌলিক রচনা। 'মালতী মাধব' (১৮৮৫) ভবভূতির প্রসিদ্ধ নাটকের অনুবাদ। এটি চার কাণ্ড ও বার খণ্ডে সমাপ্ত। এটি নির্ভুল চলতি ভাষায় রচিত।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম পর্বে 'কীর্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জুন'-এর বিশিষ্ট স্থান আছে। এই দুখানি নাটক পাশ্চাত্য নাট্যকীর্তিতে লেখা। বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ রূপ যে পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ অবলম্বন করবে তার সূচনা আমরা দেখতে পাই।

'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২) বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিয়োগান্ত নাটক। সংস্কৃত সাহিত্যে বিষাদান্তক নাটক নিষিদ্ধ ছিল সেই সময় লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত সংস্কৃত নাটকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। লেখক যে অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স পড়েছিলেন এ নাটক থেকে তা বোঝা যায়। পাশ্চাত্য নাটকের মতো 'কীর্তিবিলাস' ও পঞ্চাঙ্ক নাটক। তবে সংস্কৃত নাটকের এতে 'নান্দী ও নান্দ্যান্তে সূত্রধার' রয়েছে। লেখকের ভাষা সংস্কৃতের ভারে আড়ষ্ট ও কৃত্রিম অলঙ্কার সমৃদ্ধ ভাষা। লেখকের গদ্যের ভাষায় যেমন আড়ম্বর পদ্যের মধ্যে তেমন চাপল্য। লেখকের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) সার্থক নাটক। কাহিনী সুসংহত। নাটকীয়তা আছে। সংলাপ স্বচ্ছন্দ। সংস্কৃত প্রভাব প্রায় নেই। লেখক পাশ্চাত্য প্রথা অনুযায়ী তাঁর

নাটকখানি পাঁচ অঙ্কে এবং প্রত্যেক অঙ্ক আবার কয়টি দৃশ্যে বিভক্ত করেছেন। নাটকের একটি 'আভাস' রয়েছে। নাটকের সংলাপে গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ দেখা যায়। গদ্য সাধু ভাষায় রচিত। পদ্যরচনা পয়ার ও ত্রিপদীতে বিভক্ত। বাংলা মহাভারতের সঙ্গে এর মিল আছে। অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণ নাটকের বিষয়, আধুনিক বাঙালি সমাজ এতে অন্তর্গত হয়েছে।

উনিশ শতকে নাট্যমঞ্চের যবনিকা উত্তোলিত হবার পর বাংলা নাটক যখন আত্মপ্রকাশ করল তখন সে স্বনির্ভর হয়, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ও সপত্নী সমস্যা নিয়ে নানা নাটক লেখা হয়েছিল সে সময়ে। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। নানা সামাজিক নক্সা লেখা হয়েছে সে সময়ে। এইসব সামাজিক নক্সার মধ্যে আছে 'কালিকৌতুক নাটক' (১৮৫৮), 'চার ইয়ারে তীর্থ যাত্রা' (১৮৫৮), 'সপত্নী নাটক' (১৮৫৮), 'বিধবাবিবাহ নাটক' (১৮৬০), 'বাল্যোদ্বাহ নাটক' (১৮৬০), 'বাল্যবিবাহ', 'চপলাচিত্তচাপল্য' (১৮৬১), 'বুঝলে কিনা' (১৮৭৩), 'বাসর কৌতুক নাটক' (১৮৫৯) ইত্যাদি।

রামনারায়ণ তর্করত্ন বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নাট্যকার। তাঁকে 'নাটুকে রামনারায়ণ' বলা হয়। সামাজিক সমস্যা নিয়ে তিনি সর্বপ্রথম নাটক লিখতে শুরু করেন। গোঁড়া ব্রাহ্মপন্থী হয়েও উদারমনস্ক ছিলেন তিনি। লেখক যতবড় পণ্ডিত ছিলেন ততবড় স্রষ্টা ছিলেন না। 'কীর্তিবিলাস' ও 'পঞ্চাঙ্ক নাটক' লেখকের ভাষা ও রচনারীতি সংস্কৃতের ভারে আড়ষ্ট ও কৃত্রিম। এই নাটকে আছে বিমাতার অত্যাচারের কাহিনি।

ভদ্রার্জুন (১৮৫২) প্রথম সার্থক নাটক। এটির কাহিনি সুসংহত। লেখকের মতে তিনি যুরোপীয় আদর্শে নাটক লিখেছেন। এই নাটকে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে। নাটকের সংলাপে গদ্য ও পদ্যের মিল আছে। পদ্য রচনা পয়ার ও ত্রিপদীতে লেখা। অর্জুনের দ্বারা 'সুভদ্রা হরণ' নাটকের মূল বিষয়। অসংলগ্ন আর অবাস্তব ঘটনা নেই বললেই চলে। কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারের দুশ্চিন্তা, অন্তঃপুরিকাদের সংস্কার ও বিবাদের প্রথা ও স্ত্রীআচার এখানে লিপিবদ্ধ।

৯.৪ সারাংশ

মধুসূদন দত্তের আগে যাঁরা নাটক রচনা করেন তার মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্ন বিখ্যাত। তাঁকে নাটুকে রামনারায়ণ বলা হয়। সামাজিক সমস্যা নিয়ে তাঁর লেখা নাটকগুলি আলোচ্য। নাট্যক্ষেত্রে সংস্কারের কথা ভেবেছেন তিনি। রামনারায়ণ সামাজিক নাটক, পৌরাণিক নাটক, প্রহসন লিখেছেন কিন্তু তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রহসনে, তত্ত্বকথা, কি ধর্মকথা শোনানোর সময়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৬) তাঁর প্রথম নাটক, এটি বাংলা সাহিত্যের আদি নাটকগুলোর অন্যতম। কৌলীন্য প্রথার দোষ ও অসঙ্গতি 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে বলা হয়েছে, নাটকটি ছয় ভাগে বিভক্ত।

পুরুষ ও স্ত্রী চরিত্রের ভাষার ব্যবধান আছে, পুরুষের কথা আড়ষ্ট। নারীরা সহজ ও স্বাভাবিক। রামনারায়ণ একদিকে সংস্কৃত কবিতা ও অন্যদিকে ছড়া ও প্রবচন ব্যবহার করেছেন। নাটকের মধ্যে নানা বিচিত্র চরিত্র বর্ণিত। ১৮৫৪ সালে যখন 'কুলীনকুলসর্বস্ব' রচিত হয় তখন রামনারায়ণ বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ প্রভাবে কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহ রোধ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। এ নাটকে রামনারায়ণ সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসরণ করেন। প্রস্তাবনায় তিনি যে মধুর সাধুভাষায় নাটক রচনা করতে চান তার উল্লেখ আছে। সংস্কৃত নাটকে শুধু অঙ্কবিভাগ আছে। দৃশ্য বিভাগ নেই। এ নাটকে মোট ছয়টি অঙ্ক আছে। সংস্কৃত নাটকের পরিণতি বিয়োগান্তক হয় না। এ নাটকেও তাই। সংস্কৃত নাটকের সংলাপ কিছুটা গদ্যে, কিছু পদ্যে পদ্য সংলাপের ব্যবহার হয়েছে যখন কোন চরিত্র পরোক্ষ ঘটনার বিবৃতি দিয়েছে। পদ্য সংলাপে ভারতচন্দ্রের প্রভাব আছে। এই নাটকে অনেক জায়গায় চরিত্ররা স্বগতোক্তি করেছে। মাত্র দুদিনের ঘটনা। তাতে বহু চরিত্রের আমদানী হয়েছে কুলপালকের পরিবারের বাইরে সব চরিত্রই টাইপ চরিত্র। চরিত্রদের মধ্যে নাট্যকারের ব্যঙ্গ ও কৌতুক প্রকাশিত, মারী চরিত্রগুলি সমাজে অন্যায় অবিচারে যন্ত্রণাময়, ক্লিষ্ট, রঙ্গ রলিকতায়, খেদবিলাপে তাদের কষ্ট প্রকাশিত, নবনাটক (১৮৮৬) কুলীনকুলসর্বস্বের ন্যায় উদ্দেশ্যমূলক নাটক। তবে উদ্দেশ্য প্রধান। এই দুটি নাটকের জন্য তিনি আর্থিক পুরস্কার পেয়েছেন। সিরিয়াস বিষয় অপেক্ষা লঘু, হাস্যরসাত্মক নাটক লিখতে পছন্দ করতেন তিনি। বহু বিবাহের বিরুদ্ধে এখানে তত্ত্বকথা আছে। বিলাপের ক্ষেত্রে কবিতা ব্যবহার করা হয়েছে। নানা টুকরো দৃশ্যে নাটকের মূল ভাব বিলুপ্ত। বহু বিবাহের কুফল দেখানোর জন্য নাটকটি লেখা হয়েছে।

প্রহসন— 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' (১২৭৯ বঙ্গাব্দ) স্ত্রীর প্রতি অবৈধ আসক্তি নিয়ে এটি রচিত। 'চক্ষুদান' (১৮৬৯) লাম্পট্যব্যাধির প্রতি কামের উদ্দেশ্যে লেখা 'উভয় সঙ্কট' (১৮৬৯) সপত্নী সমস্যার কথা আছে।

রামনারায়ণ তর্করত্নের পৌরাণিক নাটক 'রুক্মিনীকরণ' (১৮৭১) সালে লেখা। উপাদান পুরাণ থেকে গৃহীত 'কংসবধ' (১৮৭৫)। কংস দ্বারা অক্রুরকে বৃন্দাবনে প্রেরণ থেকে নাটকের সূচনা এবং কংসবধ ও উগ্রসেনের সিংহাসন লাভে নাটকের সমাপ্তি। সংলাপ দীর্ঘ। আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাস বেশী। আধুনিক বাংলা নাটকের সূচনা হয়েছে বিবর্তনের পথ ধরে। ইংরেজি নাটকের কাছে আমরা এজন্য ঋণী।

৯.৫ অনুশীলনী

বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। আধুনিক বাংলা নাটকের সূচনা কীভাবে হল তা আলোচনা করুন।

২। যাত্রা ও সংস্কৃত নাটক নিয়ে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী :

১। সখের নাট্যমালা নিয়ে আলোচনা করুন।

২। বেঙ্গলী থিয়েটার সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৩। হরচন্দ্র ঘোষ ও কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত নাটক নিয়ে আলোচনা করুন।

৪। কুলীনকুলসর্বস্ব ও নবনাটক বাংলা নাটকে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচনা করুন।

৯.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। *বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস*—দর্শন চৌধুরী

২। *বাংলা নাটকের ইতিহাস*— অজিতকুমার ঘোষ

৩। *শতবর্ষে নাট্যশালা*— আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অজিতকুমার ঘোষ

৪। *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬)*—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একক ১০ ❑ মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, অমৃতলাল বসু

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য

১০.২ প্রস্তাবনা

১০.৩ মধুসূদন দত্তের নাট্যকৃতি

১০.৪ আলোচনা : নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, অমৃতলাল বসু

১০.৫ সারাংশ

১০.৬ অনুশীলনী

১০.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ উদ্দেশ্য

বাংলা নাটকে মধুসূদন দত্তের নাটকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মধ্য বাংলার একটি সাধারণ গ্রামের প্রথাবদ্ধ কিন্তু নব্য ধনী পরিবারে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম। ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছিলেন কলকাতায়। লেখাপড়া শিখেছেন হিন্দু কলেজে, তার বাবা ছিলেন প্রথিতযশা উকিল রাজনারায়ণ দত্ত। যশোহর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে মধুসূদনের পাঠশালায় পড়াশুনার সূচনা, তারপর কলকাতায় স্কুলের পাঠ শেষে হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রতি আকৃষ্ট হন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডসনের সঙ্গে মধুকবির যোগাযোগ ছিল। তাঁর শেক্সপীয়ার প্রীতিতে মধুসূদন মুগ্ধ ছিলেন। রিচার্ডসন কলকাতায় পেশাদার থিয়েটারে ছাত্রদের ইংরেজি নাটক দেখার পরামর্শ দিতেন। মধুসূদনের সাহিত্য রচনার আগে তাঁর ব্যক্তিজীবনটাকেও শিক্ষার্থীদের জানা দরকার।

১০.২ প্রস্তাবনা

বাংলা নাটক সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেই প্রথমে যাঁর নাট্যশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হয় তিনি মধুসূদন দত্ত। বাংলায় প্রথম সার্থক নাট্যকার মধুসূদন দত্ত। তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' রচনার ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। নাটক ছাড়্যা তিনি দুটি প্রহসন লেখেন। মধুসূদনের সমকালে আর একজন নাট্যকার অনেকগুলি নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। তবে তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকের জন্য সকলের কাছে পরিচিত। আমাদের আলোচনায় এই দুই নাট্যকারকে নিয়ে বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে। নাট্যকার অমৃতলাল বসুও এই এককে আলোচিত।

১০.৩ মধুসূদন দত্তের নাট্যকৃতি

নাট্যকারেরা প্রায়ই কোনো-না-কোনো রঙ্গমঞ্চের প্রভাবে নাটক লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। মধুসূদনের এর ব্যতিক্রম নয়। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ১৮৫৮ সালে ‘রত্নাবলী’ নাটকের অভিনয় হয়। মধুসূদন দত্ত এই নাটকটির অনুবাদ করেন ইংরেজিতে। বেলগাছিয়ার রাজার অনুরোধে ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটক লেখেন। এই রাজবাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটক দেখে তিনি হতাশ হয়েছিলেন। ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটকের প্রস্তাবনায় খেদ করে বলেছেন তিনি ‘অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে/নিরমিয়া প্রাণে নাহি সয়।’ ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিরা এই নাটকের প্রশংসা করেছিলেন। মহাভারতের আদিপর্ব থেকে কাহিনী গৃহীত। তবে নাটকের আঙ্গিকে পাশ্চাত্য প্রভাব আছে। ‘শর্মিষ্ঠা’ তাঁকে যথাযোগ্য খ্যাতি ও স্বীকৃতি দিয়েছিল। এই নাটকে সংলাপের ভাষা খানিকটা আড়ষ্ট। মাইকেল-হেনরিয়েটার প্রথম সন্তানের নাম শর্মিষ্ঠা। কন্যা জন্মানোর মাত্র কয়েকদিন পরে নাটকটির সার্থক অভিনয় হয়। ‘শর্মিষ্ঠা’র ইংরেজি অনুবাদ করেন তিনি। শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতির ত্রিকোণ প্রেম নাটকের বিষয়। শর্মিষ্ঠার চরিত্র তেমন সজীব নয়। এই চরিত্রে ভারতীয় নারীর আদর্শে অঙ্কিত। দেবযানী অনেক বেশি ব্যক্তিত্বশালিনী। দেবযানীকে নাটকের নায়িকা বলা যেতে পারে। বিদুষক চরিত্র মধুসূদন সংস্কৃত নাটক থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

পদ্মাবতী (১৮৬০)

‘শর্মিষ্ঠা’র পরে মধুসূদন ‘পদ্মাবতী’ (১৮৬০) রচনা করেন। ‘পদ্মাবতী’র বিষয়বস্তু গ্রীক পুরাণ থেকে গ্রহণ করা হয়। Apple of discord নিয়ে জুনো, ভিনাস, প্যালাস— এই তিন দেবীর বিবাদ বেঁধেছিল এবং তার ফলে ট্রয়ের যুদ্ধ ঘটেছিল— এই গ্রীক উপাখ্যান অবলম্বন করে মধুসূদন দত্ত ‘পদ্মাবতী’ নাটক রচনা করেন। ‘পদ্মাবতী’র শচী, মুরজা ও রতি যথাক্রমে গ্রীক আখ্যানের জুনো, প্যালাস ও ভিনাসের অনুরূপ। ‘পদ্মাবতী’ নাটকে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত আছে। ‘পদ্মাবতী’র উপর শকুন্তলারও প্রভাব আছে। নাটকটি শেষ হয়েছে সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসারে। সংস্কৃত নাটকে যেমন পরিপূর্ণ মিলনে ভরতবাক্যে সকলের শুভ কামনায় নাটকের শেষ হয়েছে। পদ্মাবতীতে তাই বন্ধু গৌরদাস বসাককে চিঠিতে লিখেছেন— ‘আমি কেবল তোমাকে বলতে পারি, নাটকের জন্য এর চেয়ে ভালো প্লট খুব কমই থাকতে পারে।’ শর্মিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করলে কাহিনী সৃষ্টি, চরিত্র নির্মাণ, নাটকীয় পরিবেশ রচনা, সংলাপ— সবকিছুতে এই নাটকে তিনি বেশি সফল হয়েছেন। ‘শর্মিষ্ঠা’র তুলনায় ‘পদ্মাবতী’র ভাষা চলিত রীতির দিকে বেশি এগিয়ে গেছে। ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটকে কেবল ক্রিয়াপদ এবং সর্বনামে চলিত ভাষার স্বাক্ষর আছে। কিন্তু ‘পদ্মাবতীতে অন্য লৌকিক শব্দ ব্যবহার এবং হ্রস্ব বাক্য গঠনে চলিত ভাষা ব্যবহৃত। ‘পদ্মাবতী’র প্লট নিয়ে তিনি রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলির সঙ্গে কথা বলেন।

কৃষ্ণকুমারী (১৮৬০)

বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি। সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অনুসৃত। টডের 'Annals and antiquities of Rajasthan'—এই নাটকের মূল উপাদান। 'কৃষ্ণকুমারী' লিখতে আরম্ভ করার কয়েকদিন পরে তিনি বন্ধু কেশব গাঙ্গুলিকে একটি চিঠি লেখেন তার থেকে বোঝা যায় যে তাঁর নিশ্চিত আশা ছিল যে এ নাটক বেলগাছিয়ার নাট্যশালায় অভিনীত হবে। একটা রোমান্টিক ট্র্যাজেডি লেখার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর। নাটকটি লেখার সময়ে বন্ধু কেশব গাঙ্গুলির সঙ্গে তাঁর বারবার কথাবার্তা হয়েছে। মধুসূদনের স্বপ্ন ছিল যে এ নাটক অভিনয় হবে। এই নাটকে রাজনীতির পটভূমিতে সূক্ষ্ম মানসিক সম্পর্কের টানাপোড়েন চিত্রিত। এ নাটকের কাঠামোয় শেক্সপীয়রের প্রভাব আছে। ধনদাসের সঙ্গে ইয়াগোর, বলেন্দ্রসিংহের সঙ্গে বাস্টার্ডের সাদৃশ্য আছে। নিরপরাধ কৃষ্ণকুমারীকে নিয়তির কারণে প্রাণ দিতে হয়। তার এই আত্মত্যাগের ঘটনা গ্রীক নাটক ইফিজিনিয়াকে মনে করিয়ে দেয়। নারী চরিত্র কল্পনায় মৌলিকতা আছে। ধনদাস, বিলাসবতী ও মদনিকার উপকাহিনীর মধ্যে যে জটিলতা আছে তা বৈচিত্র্য ও মানবিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। কাহিনীর শেষে কৃষ্ণা খঙ্গাঘাতে আত্মহত্যা করে। ভীমসিংহের চরিত্রটি ট্র্যাজিক। দুই প্রবল ক্ষমতাধর তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থী কন্যাকে রক্ষা করতে গেলে এই রাজারা তাকে আক্রমণ করবেন আর দেশের মঙ্গল চাইলে কন্যাকে বিসর্জন দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। নিজের কন্যা বলিপ্রদত্ত হল, নিদারুণ দুঃখ ও গ্লানিতে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেল। এখানেই শেক্সপীয়রের 'কিং লীয়ার' নাটকে রাজা লীয়ারের সঙ্গে মিল রয়েছে। ভীমসিংহ একেবারে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজিক চরিত্র হয়ে গেছে।

নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতির জন্য হয়তো দায়ী মদনিকা, 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের বসন্তসেনার সহচরী মদলিকার মতো সে চতুর এবং বুদ্ধিশালিনী, একটি চিঠিতে জানা যায় যে মদনিকা মধুসূদনের প্রিয় চরিত্র। ধনদাস চতুর, কিন্তু মদনিকা তাঁর চেয়ে বেশি মধুর, ধনদাস উদয়পুরে জগৎসিংহের বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে গেছে কিন্তু মদনিকা বিলাসবতীর পরামর্শে সেই বিবাহ পণ্ড করার জন্য উপস্থিত হয়েছে। মদনিকা নানা কর্মকাণ্ড না ঘটালে জগৎসিংহের সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ হত এবং নাটকের পরিণতি বিষাদান্তক হত না। ধনদাস দুষ্ট স্বভাব, খলচরিত্রের লোক। সে স্বার্থসিদ্ধির আশায় মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়েছে। তবে ধনদাসের নানা অভিসন্ধি নাটককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। অথচ নাটকের শেষে ব্যর্থ ধনদাস অপমানিত ও বিপর্যস্ত হয়েছে। এই নাটকের কাহিনী সংহত। জগৎসিংহ বিলাসবতী-মদনিকা-ধনদাসের কাহিনী উদয়পুরের রাজপরিবারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মধুসূদন জানতেন আঙ্গিক, চরিত্রচিত্রণ, ঘটনার নাটকীয়তা এবং সংলাপ রচনায় এ নাটক 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী'কে ছাড়িয়ে যাবে। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে বিনয় করে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন 'তুমি যখন 'কৃষ্ণকুমারী' পড়বে তখন হয়তো ভাববে যে অনুশীলন করলে সাহিত্যের এ বিভাগে এ লেখক মোটামুটি ভালো ফল করতে পারবে, (*পত্র সংখ্যা*

৮২)। তিনি যে বাংলা ভাষার যে কোনো নাটকের চেয়ে ভালো নাটক রচনা করেছেন এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। এ নাটকটি বিয়োগান্তক। তবু ও নাটকে সমস্ত বিষাদের বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠার একটি সবল সংগ্রাম চিত্রিত। 'কৃষ্ণকুমারী' মধুসূদনের লেখা নাটকগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত যে সকল বিষাদান্ত নাটক রচিত হয়েছে তার মধ্যে এটি অগ্রগণ্য।

***মায়াকানন* (১৮৭৪)**

'কৃষ্ণকুমারী' রচনার তের বছর পরে মধুসূদন 'মায়াকানন' রচনা করেন। এটি একটানা 'দুঃখের কাহিনী। কিন্তু এই দুঃখের যৌক্তিক পরম্পরা তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। এই নাটকে আরও একবার দৈবশক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তির বলিষ্ঠ সংগ্রাম এবং পরিণতিতে তার অনিবার্য পরাজয়ের কথা বলা হল। সুন্দ উপসুন্দ, রাবণ মেঘনাদের বীরত্ব এই শক্তির কাছে হার মানল। অজয় এবং রাজকুমারী ইন্দুমতী অন্ধ নিয়তির কাছে পরাজয় স্বীকার করে। 'মায়াকাননে'র ভাষায় কথ্য ভাষার ধরন আছে। এমনকি রাজমন্ত্রীর ভাষাও সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি, সংলাপে আড়ষ্টতা নেই। তা সাবলীল। মায়াকানন লেখার সময়ে কবি শিশুপাঠ্য কিছু কবিতা লেখেন।

মধুসূদন দুটি প্রহসন লেখেন— 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ'। 'একেই কি বলে সভ্যতা' তৎকালীন যুবসমাজের দোষ ও অনাচার নিয়ে লেখা হয়েছিল বলে সেই যুব সমাজের কয়েকজন প্রতিনিধি পাইকপাড়ার রাজাদের এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করতে বলেন। আর একটি প্রহসনেরও তখন অভিনয় হয়নি। প্রহসনের অভিনয় না হওয়াতে নিরাশ হয়ে মধুসূদন বন্ধু কেশব গাঙ্গুলীকে একটি চিঠি লেখেন— 'Mind you broke my wings once about the farces, if you play similar trick this time, I shall forswear. Bengali and write books in Hebrew and Chinese.' প্রহসনকার সমাজে চিরকাল তিরস্কার লাভ করেন। বিখ্যাত ফরাসি প্রহসনকার মলিয়েরের মরার পর সৎকারের লোক ছিল না। মধুসূদন ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত হয়েও প্রহসনে এদের দোষ ত্রুটির কথা স্বীকার করেছেন। আবার গোঁড়া বাঙালিদের দোষ ত্রুটির কথাও আছে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে। প্রহসন দুটি উদ্দেশ্যমূলক হলেও সেই উদ্দেশ্য কখনো প্রধান হয়ে ঘটনা কিংবা চরিত্রকে খর্ব করেনি।

'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০)। প্রহসন লিখতে গিয়ে তিনি সমকালীন সমস্যাকে বেছে নিলেন। উনিশ শতকে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন যেমন বাংলা প্রহসন রচনাকে উৎসাহিত করেছিল, তেমনি প্রহসন সমাজ-সংস্কার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নির্ভেজাল হাসির মাধ্যমে তিনি আধুনিক নব্যশিক্ষিতদের কশাঘাত করলেন আবার ধর্মের নামে ভণ্ডামি করত যারা তারাও বিদ্রূপ আর ব্যঙ্গ থেকে বাদ গেল না। এই উভয় সমাজকে তিনি কাছ থেকে দেখেছেন। পাশ্চাত্য নাট্যরুচি দিয়ে এই প্রহসনগুলির আঙ্গিক, কাহিনি, চরিত্র সংলাপ রচনার সুযোগ পেলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের

অনুরোধে এই প্রহসনটি রচিত হয়। এগুলি অভিনয় না হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত হন তিনি। কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলীকে একটি চিঠিতে লেখেন— 'মনে রাখবেন, আপনারা প্রহসন দুটির ব্যাপারে আমার ডানা ভেঙে দিয়েছেন। এই প্রহসনে নবকুমার এবং কালীনাথ ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত কুসংস্কার বর্জিত যুবক। জ্ঞান তরঙ্গিনী অধিবেশন। কুসংস্কারের পরিত্যাগ করতে এরা বদ্ধপরিকর। ইন্দ্রিয়বিলাসিতা এদের মূল কথা। এরা সুরা ও গণিকার উপাসক। মাইকেল সরস ব্যঙ্গে কশাঘাতে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'এটাই কি সভ্যতা'। নবকুমারের উন্মত্ত ক্রিয়াকলাপ পাঠকের মনকে ভারাক্রান্ত করে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকে মাত্র একদিনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় কথা নেই। অথচ একদিনের কাহিনীতে সবই বর্ণিত। খণ্ডচিত্রগুলি একসূত্রে গ্রথিত। চরিত্রগুলির সংলাপ সম্পর্কে বাস্তবজনোচিত।

***বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ* (১৯৬০) :** রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এই নাম দিয়েছিলেন। ভণ্ড, দুষ্কৃতি, অত্যাচারী প্রাচীন সমাজ এর লক্ষ্য। তৎকালীন প্রাচীন সমাজের পুরোধা রামগতি ন্যায়রত্ন এই প্রহসনের তীব্র নিন্দা করেছেন। মধুসূদনের জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতে— 'মধুসূদনের সময়ে এই শ্রেণীর কতকগুলি লোকের কলিকাতার ও তাহার নিকটবর্তী পল্লীসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বাহিরে মালাজপ, কিন্তু গোপনে পরাস্বপহরণ; সামাজিক প্রতিপত্তির জন্য দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, কিন্তু গোপনে বারাঙ্গনা প্রতিপালন, তাঁহাদিগের অনেকের নিত্যব্রত ছিল।

'একেই কি বলে সভ্যতা'র ঘটনাস্থল নবীন সমাজের কলকাতা শহর। কিন্তু 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র সংযোগস্থল প্রবীণ সমাজের পীঠস্থান পল্লীগ্রাম। পল্লীগ্রাম ছেড়ে এলেও গ্রামের মানুষের ছবি তাঁর মনে অক্ষয়। তাই 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে হানিফ, ভগী, পঞ্চী, ফতেমা এখানে জীবন্ত চরিত্র। প্রবলের অত্যাচারে পীড়িত, দুর্বল চরিত্র মানুষের কথা বলা আছে এখানে।

দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩৫১ সালে আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে 'মধুসূদন ও ফরাসী সাহিত্য' সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেছেন যে, 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' আর মলিয়ের তার্তুফের যথেষ্ট মিল আছে। 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' দুই অধ্যায় চার গর্ভাঙ্কে সমাপ্ত। এখানে মুখ্য চরিত্র ভক্তপ্রসাদ। ভক্তপ্রসাদ শোষক জমিদার। গরিব চাষীর খাজনার এক পয়সা সে মাপ করে না। মানুষকে কোনও কাজে সাহায্য করে না। দুশ্চরিত্র। পরস্ত্রীর রূপবর্ণনা শুনে আকুল হয়। হানিফের স্ত্রী ফতেমার কাছে দূত পাঠায়। বৃদ্ধ, লোলুপ, ভণ্ড এই মানুষটি নব্যযুবার মতো সেজে পরদার গমন করে। কুকর্ম করতে তার জুড়ি নেই। আবার হিন্দুধর্মের আচারবিচার মানতে, লোককে শাস্ত্রজ্ঞান দিতে তাঁর জুড়ি নেই। ধর্মের নামে অনাচার করায় তাঁর কোনো অনুতাপ নেই। মুসলমানের স্ত্রীকে সে কামনা করে কিন্তু মুসলমান জাতি তার কাছে অচ্ছুৎ। তার এই দ্বিচারিতা মধুসূদনের লেখায় সুতীব্র বিদ্রূপে প্রকাশিত। Poetic justice রয়েছে এই প্রহসনে। ভণ্ডপ্রসাদ তাঁর কুকর্মের যথাযোগ্য শাস্তি পেয়েছে। সে যে মতিচ্ছন্ন

ছিল তাও বোঝানো হয়েছে প্রহসনের শেষে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকে নবকুমারের চরিত্রের শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন হয়নি। সেখানে Poetic justice নেই। সত্যের জয় অসত্যের পরাজয় ঘোষিত হয়নি। বাস্তবে তো তা সবসময় হয় না। 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে ভক্তপ্রসাদের অনুতাপ না হলে নাটকটি আরও মর্মস্পর্শী হত। হানিফ যেন পাঠকের দেখা কোনো মানুষ। সে দারিদ্র্যপীড়িত, কোপনস্বভাব ও গোঁয়ার। কুটনীপুঁটির চরিত্র জীবন্ত। গদা এই প্রহসনে হাস্যরসের খোরাক।

'একেই কি বলে সভ্যতা' নাট্যরসে পরিপূর্ণ। উপস্থাপনায় নাট্যকলার পরিপূর্ণ বিকাশ। কিন্তু সামাজিক সমাজের যে শ্রেণীকে লক্ষ করে প্রহসনের চরিত্র অঙ্কিত সেখানে লেখকের লক্ষ্যভেদ যথাযথ। গ্রামের মূর্খ, অশিক্ষিত শিক্ষকের কথায় গ্রামীণ কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। হানিফ মুসলমান তাই সে কথায় কথায় আরবী, ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছে। পরবর্তীকালে দীনবন্ধু মিত্র এ ধরনের চরিত্র অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ছড়া, প্রবাদ, কবিতা অন্তর্গত করায় এই প্রহসনটি সরস ও কৌতুকময় হয়ে উঠেছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন হিসাবে বাংলা সাহিত্যে চিরকাল অত্যন্ত তাৎপর্যময় স্থান অধিকার করে থাকবে।

১০.৪ আলোচনা : নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, অমৃতলাল বসু

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র

পিতৃদত্ত নাম গন্ধর্বনারায়ণ বদলে দীনবন্ধু রাখেন এই নাট্যকার। দরিদ্র পরিবারে জন্মে বহু কষ্টে লেখাপড়া শেখেন। কলকাতায় এসে স্কুলে পড়াশুনা শেষ করে হিন্দু কলেজে পড়াশুনা করেন। ১৮৫৫ সালে পাটনায় পোষ্টমাস্টার পদে নিযুক্ত হন। তারপর পোষ্টাল ইনস্পেকটর। পোষ্টাল ইনস্পেক্টরের সহকারী। ১৮৭২ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ইনস্পেক্টর পদে যোগদান করেন। এই কর্মবহুল জীবনে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্য জীবনে বিশেষতঃ নাট্যচরিত্র সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে লিখেছেন 'দীনবন্ধু রচিত অনেক নাটক প্রকৃত ঘটনাভিত্তিক এবং অনেক চরিত্র তৎকালীন জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে রচিত। সাহিত্য জীবনের শুরু কবিতা দিয়ে। কিন্তু নাটকেই তাঁর সিদ্ধি। লোকের সঙ্গে মেশবার তাঁর অসাধারণ শক্তি ছিল এবং তিনি আহ্লাদপূর্বক সকলের সঙ্গে মিশতেন। নীলকর নিপীড়িত, অসহায়, দুঃস্থ রায়ত, পরমুখাপেক্ষী দয়াপ্রার্থী ঘরজামাই, মূর্খ ডেপুটি, রঙ্গরসে পরিপূর্ণ পরিচারিকা, গুলিখোর বখাটে যুবক, কেউই দীনবন্ধুর দৃষ্টি এড়াতে পারেননি। এদের ভাবভঙ্গি, স্বভাবচরিত্র যেমন দেখেছেন, সুদক্ষ শিল্পীর মতো তিনি তা এঁকেছেন। নিরক্ষর চাষীদের ভাষাটাও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। নিরীহ নারীদের ওপর পাষণ্ডের অত্যাচার দেখিয়েছেন। ঈর্ষাপরায়ণা, কলহরতা সতীনদের অশ্লীল গালাগালি লিখেছেন, মদ্যপগুলির কদর্যমত্ততাও উল্লেখ করেছেন। চরিত্রগুলোর মধ্যে কৃত্রিমতা আরোপ করেননি, রুচির শালীনতা তুলে তাদের স্বাভাবিকতা নষ্ট করতে চাননি। তিনি

বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাস্তববাদী লেখক। তিনি বৃদ্ধ বিবাহপ্রার্থী, মদ্য ও গণিকাসক্ত বাবু, অসহায় রমণীর সর্বনাশে প্রবৃত্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তি সকলকে ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর অধিকাংশ লেখায় পরিহাস অপেক্ষা উপহাসই স্থান পেয়েছে। দীনবন্ধু নারীদের দুঃখে দুঃখী, সবরকম সামাজিক অসঙ্গতি উন্মোচনে হাস্যমুখী।

মাঝে মাঝে নাটকে ধর্মকথা ও নীতিকথা শোনাতে চেয়েছেন দীনবন্ধু কিন্তু তা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে। যেখানে হাস্যরস সেখানে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত। নিরক্ষর, গ্রাম্য সমাজের মধ্যে নবীনমাধব বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে। তার তুলনায় উড়িয়াবাসী ভৃত্যের কথা স্বতঃস্ফূর্ত। লীলাবতীর কৃত্রিম ভাষা অপেক্ষা হাবার মায়ের কথা অনেক স্বাভাবিক। দীনবন্ধুর নাটকের চরিত্র তত্ত্বকথা বলতে শুরু করলে প্রাণহীন, নীরস হয়ে ওঠে। তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের ছবি আঁকতে পারঙ্গম ছিলেন না। যেখানে সংস্কৃত নাটককে অনুসরণ করেছেন, সেখানে তা আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। সংস্কৃত নাটকের মতো তাঁর নাটকে গদ্য ও পদ্য মিশ্রণ আছে। সামাজিক নাটকের চরিত্রগুলো কবিতায় কথা বললে তা নিতান্ত অস্বাভাবিক দেখায়, অনেক সময়ে তা হাসির খোরাক হয়ে ওঠে। স্ত্রী-পুরুষ দুরূহ সংস্কৃত শব্দবহুল ভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশ করলে তা কেবল হাস্যরসের সৃষ্টি করে।

দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য আতিশয্য দোষ, আবেগের উচ্ছ্বাসে তিনি সংস্কৃত উপমা ও অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন তাতে নাটক ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, নাটকের গতিময়তা নষ্ট হয়েছে।

***নীলদর্পণ* (১৮৬০) :** আজ থেকে প্রায় পৌনে দুশো বছর আগে নীলের সমস্যাকে অবলম্বন করে দেশ জুড়ে জাগরণ শুরু হয়েছিল যা সমাজ ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। নীলকর সাহেবরা উর্বরা শস্যের জমিতে নীলের চাষ করত। কৃষকদের উপর অত্যাচার করত সুতীক্ষ্ণ। 'নীলদর্পণ'-এ বর্ণিত অত্যাচারের কোনো কথা অসত্য ভাষণ নয়। মাঝে মাঝে একটা গোটা গ্রাম নীলকরদের দ্বারা অত্যাচারিত হল। ক্ষেত্রমণির প্রতি অত্যাচার বৃত্তান্ত একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা হয়েছে।

বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে 'নীলদর্পণে'র যথেষ্ট প্রভাব। সুখে শান্তিতে অবস্থানরত বাঙালি পরিবার কীভাবে নীলকরদের তাণ্ডবে শেষ হয়ে গেল— এ নাটকে তাই আলোচ্য বিষয়। 'নীলদর্পণ' বাংলা সাহিত্যে প্রথম সামাজিক নাটক। সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় 'নীলদর্পণ'-এর অভিনয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ন্যাশনাল থিয়েটারে এর অভিনয় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়েছিল। শোষক ও শোষিতের অত্যাচারের যে কাঠামো এখানে তুলে ধরা হয়েছে তার জন্য যে-কোনো দেশকালে 'নীলদর্পণ' প্রাসঙ্গিক।

গোলোক বসুর পরিবারকে কেন্দ্র করে এই নাটকটি গড়ে উঠেছে। সাধুচরণের পরিবারও নীলকরদের দ্বারা সর্বহারা। 'নীলদর্পণ' এর বিষয়বস্তু অত্যন্ত সংহত। কোথাও কোনো দৃশ্য বা ঘটনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। এক ধনী গৃহস্থ পরিবার আর গরিব চাষী পরিবার এদের সংঘর্ষে নাটকের আরম্ভ আর তার পরিণতিতে নাটক শেষ। প্রথম অঙ্কে সংঘর্ষের আভাস—গোলোক বসু চিন্তিত। সাধুচরণ বিব্রত। গোলোক বসুকে কারারুদ্ধ করার জন্য নীলকরদের ষড়যন্ত্র, তৃতীয় অঙ্কে সংঘর্ষের চূড়ান্ত অবস্থা, নীলকরদের সঙ্গে লড়াই, গোলোক বসুর কারাবাস, ক্ষেত্রমণির প্রতি রোগসাহেবের অত্যাচার, চতুর্থ অঙ্কে সংঘর্ষের করুণ পরিণতি—

গোলোক বসুর আত্মহত্যা ও পরিবারের অসহায়তা, নাটকের শেষ অঙ্কে সর্বনাশের গর্ভে গোলোক ও সাধুর পরিবার।

বঙ্কিমের মতে— প্রবল সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং সর্বব্যাপী সহানুভূতি— এই দুটি গুণের জন্য তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলো বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তবে ভদ্র চরিত্রগুলি তেমন সজীব নয় তার বড়ো কারণ এই যে তাদের ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, স্বাভাবিক নয়, তা সংস্কৃত নাটকের ভাষার বাংলা অনুবাদ। সেজন্য তাদের কথা অন্তর স্পর্শ করে না। এক্ষেত্রে দীনবন্ধু সে সময়ের প্রচলিত ভাষাকে অনুসরণ করেছেন। নীলমাধব, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা এসব চরিত্রের ভাষা অস্বাভাবিক দীর্ঘ। নবীনমাধব নাটকের নায়ক। এই উদার যুবকটি নীলকরদের সঙ্গে লড়াই করেছে বরাবর। তাঁর চরিত্রে যথেষ্ট নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ভাষার কৃত্রিম কাঠিন্যে তা চাপা পড়ে গেছে। তাঁর ভাষার আড়ষ্টতা সৈরিন্ধ্রীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন কিংবা নীলকর সাহেবদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করার সময়েও তাঁর ভাষা আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক।

তোরাপ সহায় সম্বলহীন কৃষক। দুর্দান্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তার ভয় নেই। জীবন সম্বন্ধে তাঁর কোনো পরোয়া নেই। বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে ক্ষেত্রমণি আর নবীনমাধবকে উদ্ধার করেছে। নবীনমাধবের মতো শিক্ষিত ও উদার সে নয়, কিন্তু তার মধ্যে আছে মনুষ্যধর্ম। নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, সাধুচরণ ও রাইচরণের মধ্যে রাইচরণ অধিকতর সজীব, সাধুচরণ হিসেবি, সাবধানী, আপসপন্থী। কথাবার্তা আড়ষ্ট ও ভদ্রঘেঁষা, রাইচরণ খাঁটি, গ্রামীণ মানুষ। আদুরী নাট্যকারের অনবদ্য সৃষ্টি। নাটকের দুঃখময় পরিবেশের মধ্যে সে আনন্দের উৎস। নাটকের দুঃখময় পরিবেশের মধ্যে সে আনন্দের সঞ্চার করেছে। নানা বিষয়ে তার নিজস্ব মতামত আছে। গোপীনাথ নীলকর সাহেবের পদলেহী, নীচ, স্বার্থপর। কিন্তু তার মধ্যে একটি ধিক্কার বোধ আছে; পদীময়রানীও তাই। সে বলেছে 'ও, মা, কি লজ্জা, বড়বাবুকে মুখখান দেখালাম। রাজনৈতিক অত্যাচার মানুষকে কীভাবে নিঃস্ব করতে পারে তা দেখানো হয়েছে।

***নবীন তপস্বিনী* (১৮৬৩) :** এই নাটকে ঘটনার জটিলতা ও বৈচিত্র্য আছে। কামিনী ও তার আখ্যানের কথা আছে নাটকে। এখানে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব আছে। জলধর-জগদম্বা-মালতী কাহিনীটিতে শেক্সপীয়রের Merry wives of windsor এর প্রভাব আছে। জগদম্বা চরিত্রটি মৌলিক। নবীন তপস্বিনীর দুটো উপাখ্যান। দুটোর মধ্যে কোনো যোগ না থাকায় নাটকে ঐক্য নষ্ট হয়েছে। নাটকের নাম 'নবীন তপস্বিনী' হলেও তপস্বিনী তেমন উল্লেখ্য চরিত্র নয়।

***লীলাবতী* (১৮৬৭) :** 'লীলাবতী' নাট্যকারের পরিণত লেখনীর রচনা। দীনবন্ধু উৎসর্গ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—'অপরিমিত, আয়াসসহকারে 'লীলাবতী' নাটক প্রকটন করিয়াছি।' যোগজীবনকে প্রথমে একজন তপস্বী, পরে অরবিন্দ, তারপর ভণ্ড সন্ন্যাসী, অবশেষে 'আউরৎ' বুঝতে পেরে দর্শক ধন্দে পড়ে। অরবিন্দের নিরুদ্দেশের জন্য নাটকের দ্বন্দ্ব ও বৈচিত্র্য বেড়েছে। 'লীলাবতী' প্রেম ও প্রেমের ঘাত-প্রতিঘাতমূলক নাটক, কিন্তু ললিত ও লীলাবতীর প্রেমের দৃশ্য বিভ্রান্তিকর। এই নাটকে কৌলীন্য প্রথার অনিষ্টতা দেখানো হয়েছে। সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে নাট্যকারের সমর্থন ছিল, কিন্তু দীনবন্ধু শিক্ষিতাভাবাপন্ন স্ত্রী

চরিত্র আঁকতে গিয়ে আমাদের নিরাশ করেছেন। নায়ক ললিত সুশীল, সুবোধ, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী নয়। হরবিলাস সমস্ত ঘটনার নিয়ন্ত্রক।

***কমলে কামিনী* (১৮৭৩) :** 'কমলে কাহিনী' দীনবন্ধুর সর্বশেষ নাটক, ইতিহাস সমন্বিত প্রেক্ষাপট। অভিনয়ের পক্ষে তেমন উপযোগী নয়, নাটকে স্ত্রী চরিত্রগুলি পুরুষ অপেক্ষা জীবন্ত।

দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনগুলির মধ্যে 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) বিখ্যাত। এটি ইয়ং বেঙ্গল-এর নিখুঁত চিত্রণ । 'একেই কি বলে সভ্যতা'র সঙ্গে মিল আছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ প্রহসন। এই প্রহসনে পাশ্চাত্য প্রভাবসৃষ্ট নবীন সম্প্রদায়ের দোষ প্রকাশিত। অপরিমিত মদ্যাসক্তি অটলবিহারী বা নিমচাঁদের মতো অনেক যুবকের সর্বনাশ করেছিল। প্রখ্যাত অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'সধবার একাদশী'কে শ্রেষ্ঠ প্রহসন বলেছেন। গোলাম মুরশিদ *'আশার ছলনে ভুলি'* গ্রন্থে 'দীনবন্ধু মিত্র মোহমুক্তির খতিয়ান' পরিচ্ছেদে 'সধবার একাদশী'কে শ্রেষ্ঠ নাটক বলেন—এটি উদ্দেশ্যমূলক নাটক। মদ খাওয়ার বাড়াবাড়ি তরুণ সমাজকে কীভাবে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে গেছে নাটকে তাই দেখানো হয়েছে। শুধু তাই নয় এ নাটক নতুন ও পুরাতন যুগের সংঘাতজনিত যুগযন্ত্রণার ট্র্যাজেডি।

পুত্র ললিতচন্দ্রের মতে 'তদানীন্তন সমাজের দুর্দশা দেখিয়া পিতৃদেবের হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। বর্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য এবং ভবিষ্যৎ অমঙ্গল নিবারণের জন্য তিনি সাহিত্যের আশ্রয় লইলেন। এই অধঃপতনের নিখুঁত চিত্র সমাজের সমীপে উপস্থিত করিলে কল্যাণ হইবে, এই আশায় আবার লেখনী ধরিলেন। শরীরে গলিত গন্ধময় ক্ষতস্থান দেখিলে লোকে যেমন শিহরিয়া ওঠে এবং তাহার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করে, সমাজ শরীরে ক্ষতস্থান দেখাইয়া তাহাকে সচেতন করিবার জন্য তাই দীনবন্ধু শিক্ষিতমণ্ডলীর করে দ্বিতীয় দর্পণ অর্পণ করিলেন সেই দর্পণ 'সধবার একাদশী'।

বঙ্কিম প্রথমে এ নাটক গ্রহণ করতে পারেননি। বিনা সংশোধনে এ নাটক যেন প্রকাশ না পায় তাই বলেছেন। তারপর যখন এ নাটক সাড়া ফেলল, তখন বঙ্কিম বললেন, 'অনুরোধ রক্ষা হয় নাই ভালই হইয়াছে, আমরা নিমচাঁদকে দেখিতে পাইয়াছি।' এ নাটকের মধ্যে শিশিরকুমার ভাদুড়ী স্যাটায়ারের সুর খুঁজে পেয়েছিলেন। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিমচাঁদ, নেতিবাচক প্রতিবাদী ভূমিকা তার। গিরিশচন্দ্র ঘোষ দীনবন্ধুর যে মূল্যায়ন করেছেন 'শাস্তি কি শান্তি'-র উৎসর্গপত্রে ধরা পড়ে বাংলা থিয়েটারের গোড়ার যুগে দীনবন্ধুর অবদান। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন—'মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাশনাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয় স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি। সধবারা একাদশী করে না, বিধবারা করে। এ নাটকে দিক্‌ভ্রষ্ট বঙ্গীয় যুবাদের স্ত্রীদের উনিশ শতকের জীবন যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিধবাদের একাদশীর দিনে নিরম্বু উপবাসে, অসহনীয় কষ্টের মধ্যে যে জীবন কাটাতে হত এ নাটকে সধবারা সেরকম কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করেছে। এ নাটকে তৎকালীন কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি জীবনের ছবি ছিল। আর এই ছবির মধ্যে ছিল যুগযন্ত্রণার ব্যর্থতার গোপন কান্না।

'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬)— 'সধবার একাদশী' যেমন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র উত্তরসূরী তেমনি 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ'-এর উত্তরসূরী। দীনবন্ধু এই প্রহসনে প্রাচীন, সংস্কার বিরোধী সমাজকে উপহাস করেছেন।

এটি হাস্যরসাত্মক প্রহসন। এখানে ধারালো কথার তীব্র ঝলক নেই, গভীর সমাজসমস্যার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই, হাস্যরসের অনর্গল ধারায় প্রহসন স্নিগ্ধ ও মধুর।' এই প্রহসনে রাজীবলোচন মৃত্যু পথযাত্রী হয়েও বিবাহ করার জন্য উন্মত্ত। রবীন্দ্রনাথের 'নিষ্কৃতি' কবিতার পিতার মতো বিধবা কন্যাদের বৈধব্য রক্ষা ও ব্রহ্মচর্য পালনে কঠোর, কর্তব্যপরায়ণ। রাজীবলোচন 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ'-এর নায়ক ভক্তপ্রসাদের মতো সুরসিক ও কবিতাপ্রিয়। দীনবন্ধু মিত্র রাজীবের সংলাপে অনেক জায়গায় কবিতা ব্যবহার করেছেন। বুড়ো রাজীব তার কল্পিত স্ত্রীকে কবিতা আউড়ে সন্তুষ্ট করতে চায়। এটা হাস্যরসের কারণ হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত রাজীব সকলের কৌতুকের পাত্র হয়ে ওঠে।

***জামাইবারিক* (১৮৭২)** : ঘর জামাই নিয়ে কাহিনী। অনেকগুলি জামাইকে নিয়ে গল্প। উনিশ শতকের সূচনায় কুলীন ব্রাহ্মণ ছেলেরা অনেক ক্ষেত্রে শ্বশুরবাড়িতে থাকত। তারা খাওয়াপরার জন্য শ্বশুরবাড়ির উপর নির্ভরশীল ছিল। স্বামীদের সমস্যা এখানে আলোচ্য বিষয়। 'জামাইবারিক'-এ হাস্যরস এবং বগলা ও বিন্দুবাসিনীর কলহ, স্বামীর ভালবাসা ভাগ করে নেওয়া, চোরকে স্বামী ভেবে মারধোর কৌতুক সৃষ্টি করেছে। নিষ্কর্মা নেশাখোর জামাইরা অলস দিন কাটায়। এই প্রহসনে মানিকাপীরের গানটি উল্লেখ্য। ঘরোয়া ঠাট্টা রসিকতা ও ছড়া একত্রে প্রহসনটি তাৎপর্যপূর্ণ।

এখানে করুণরসের একটি অদৃশ্য প্রবাহ আছে। 'ঘর জামাইয়ের পোড়া মুখ। মরাবাঁচা সমান সুখ' এই কথাটি প্রকট ত্রুটি স্ত্রী প্রধান প্রহসন। অন্তঃপুরের মহিলাদের কথা আছে এখানে। তাদের হাসিঠাট্টা রঙ্গরস স্থান পেয়েছে। এই প্রহসনের দুটি কাহিনী আলাদাভাবে প্রবাহিত হয়ে চতুর্থ অঙ্গে মিলেছে। অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এই প্রহসনে নাই। ঘটনাগুলি মূল বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত।

নাট্যকার অমৃতলাল বসু

বাংলা প্রহসনের জগতে অমৃতলাল বসু যে ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এবং প্রহসনকে সমৃদ্ধ করেছেন সংখ্যায় ও সৌকর্যে, এই আলোচনায় সেটা বিস্তারিত উপস্থাপনারই মূল লক্ষ্য। গিরিশচন্দ্রের মতো অমৃতলালও নাটক রচনা করার আগে অভিনেতারূপে প্রতিষ্ঠা পান। যেসব অভিনেতা নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের শিষ্য ছিলেন অমৃতলাল তাদের মধ্যে অন্যতম। এই দুই অভিনেতার নাট্যরচনা পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। সিরিয়াস বিষয়, তত্ত্বকথা গিরিশচন্দ্রের নাট্য বিষয়। জীবনের বিপর্যয় ও বিকৃতি অমৃতলালের নাটকের লক্ষ্য ছিল। দীনবন্ধু মিত্রের মতো তাঁর প্রতিভার উৎস হাস্যরস, কিন্তু অমৃতলাল বসুর হাস্যরস তীব্র, তীক্ষ্ণ। তাঁর প্রহসনগুলি Satire। তাঁর 'বিবাহ বিভ্রাট' 'বাবু' 'বৌমা' প্রভৃতি প্রহসন ব্যঙ্গাত্মক।

অমৃতলালের প্রহসনে কাহিনীর জটিল বৈচিত্র্য নেই। দৃশ্য পরম্পরা যুক্ত করে এবং কয়েকটি পাত্রপাত্রীকে এনে লেখকের উদ্দেশ্য ব্যক্ত। অনেক সময়ে এসব প্রহসনে লম্বা বক্তৃতার মধ্য দিয়ে সামাজিক দোষ ও অসঙ্গতি বোঝানো হয়েছে। গ্রন্থকারের বক্তব্য ব্যক্ত করা অনেক প্রহসনের কোনো কোনো চরিত্রের মূল লক্ষণ। বাবু প্রহসনে 'তিনকড়ি মামা' এবং 'বৌমা'তে মতিলাল এরকম চরিত্র। অমৃতলাল বিধবা বিবাহ বিরোধী প্রহসন লিখেছেন। তাঁর রক্ষণশীলতার উদাহরণ **'একাকার'** প্রহসন। প্রাচীন সমাজব্যবস্থার প্রতি তাঁর যুক্তিহীন আনুগত্য ছিল। স্ত্রী-শিক্ষা এবং স্ত্রী-স্বাধীনতাকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি। 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রহসনটি এর দৃষ্টান্ত। তাঁর উপহাসের দ্বিতীয় লক্ষ্য পাশ্চাত্য ভাবচালিত নব্য যুবক যারা স্বদেশী আন্দোলন, ভোট, স্বায়ত্তশাসন, সমাজ-সংস্কার এসব নিয়ে মত্ত থাকলেও অন্তঃসারশূন্য মানুষ। বাংলা নাট্যজগতে তিনি 'রসরাজ' নামে বিখ্যাত। ছেলেবেলা থেকেই অমৃতলাল সাহিত্যানুরাগ অর্জন করেছেন। যৌবনে তিনি লিখলেন, প্যারডি কবিতা এবং একটি প্রহসন 'একেই কি বলে তোদের বাঙ্গালা সাহিত্যে উন্নতি করা'। প্রথম জীবনে পৌরাণিক নাটক লিখেছেন, অমৃতলালের প্রহসনের মূল লক্ষ্য পাশ্চাত্য ভাববিকৃত বাঙ্গালী সমাজ। তাঁর প্রহসনে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ সবই আছে। শাণিত কথার দীপ্তি পাঠকের মনে চমক সৃষ্টি করে। শব্দ ও বাক্য উপস্থাপনায় আছে চমৎকারিত্ব। প্রহসনে wit, pun পাঠককে মুগ্ধ করে। দীর্ঘদিন বাংলা থিয়েটারে অভিনয় করায় বাঙালি দর্শকের মঞ্চ চাহিদা তিনি জানতেন এবং সেই অনুযায়ী প্রহসনে প্রচুর গান অন্তর্গত হয়েছে। তাঁর প্রহসনের মধ্যে অন্যতম 'বিবাহ বিভ্রাট' (১৮৮৪)। এই প্রহসন তাঁকে নাট্যকার হিসাবে যশ ও মর্যাদা দেয়। নন্দের দ্বারা গোপীনাথের প্রতারণা এটির মূল কাহিনী। বিলাসিনী কারফরমা শিক্ষিতা মহিলা, পরপুরুষের সঙ্গে তার মেলামেশা, তার স্বামী মসলা পেষে, খাবার বানায়, আর সেটা উনিশ শতকের দৃষ্টিভঙ্গীতে চরম বিপর্যয়। প্রহসনটিতে ১৩/১৪খানি গান আছে।

***বাবু* (১৮৯৪) :** অমৃতলালের এই প্রহসনটির কোনো অবিচ্ছিন্ন গতি নেই। অমৃতলালের ব্যঙ্গবিদ্রূপ এখানে কঠোরতম। লেখক রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সংস্কারপন্থী ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনে যে বিকৃতি মাঝে মাঝে দেখা যায়, তার কথা বলেছেন। ষষ্ঠীকান্ত অনুকরণপ্রিয়, দাম্ভিক। তার স্বাধীনতা প্রাপ্তির অর্থ স্কুলের ছাত্রদের ধ্বংস করা, নারী প্রগতির অর্থ অযাচিত অনুগ্রহ এবং মার প্রতি অকারণ নিগ্রহ। সজনীকান্ত, বাঞ্ছারাম, দামোদর, কন্দর্প প্রভৃতি চরিত্র ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধি, ব্রাহ্মদের দ্বারা স্ত্রী-শিক্ষা বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সংস্কার আন্দোলন চলেছিল। সেগুলো সম্পর্কে বইটিতে উপহাস করা হয়েছে।

***একাকার* (১৮৯৫) :** সামাজিক ভেদাভেদ দূর করতে না পারলে সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। এটা বিশ্বাস করতেন না অমৃতলাল। এই বিষয় নিয়ে প্রহসন লেখা হয়েছে। বর্ণ অনুসারে সামাজিক মান হওয়া উচিত এটা লেখকের বক্তব্য। একাকার প্রহসনে কাহিনী বলতে কিছু নেই, এর সঙ্গে দৃশ্যের কোনো যোগ নেই।

***বৌমা* (১৮৯৭) :** এই প্রহসনে আছে সরস কৌতুক। ব্যঙ্গের আঘাতে তা তীব্র হয়নি। লেখকের বিদ্রূপের উদ্দেশ্য আধুনিক মতে স্বামী-স্ত্রীর যে নাটুকে প্রণয় দেখা যায় তা তিনি অপছন্দ করেন। তিনি সনাতন মতে স্বামী সেবা, স্বামী ভক্তিই স্ত্রীর কর্তব্য মনে করেন। মিউনিসিপাল শাসনকে ব্যঙ্গ করে *গ্রাম্য বিভ্রাট* (১৮৯৮) ও *সাবাস আঠাশ* (১৯০০) রচিত হয়েছে।

চোরের উপর বাটপাড়ি (১৮৭৬) : একজন দুশ্চরিত্র বিষয়ী ব্যক্তি এক বেকার যুবকের দ্বারা কোনো এক ভদ্র স্ত্রীলোককে ফুসলাতে গিয়ে কীভাবে জব্দ হল— সেই বিষয় নিয়ে এই প্রহসন।

***চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে* (১৮৮৬) :** একটিমাত্র দৃশ্য নিয়ে 'চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে' রচিত। এর মধ্যে একটা সরস বিচিত্র কাহিনী আছে। স্যর এফ্ বানার্ড-এর 'Cox and Box' এবং J.M. Morton' এর 'Box and Cox' এর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। 'চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যের কাহিনীর মোটামুটি একরকম তাজ্জব ব্যাপার। (১৮৯০) স্ত্রী স্বাধীনতা নিয়ে চরম পরিহাস এখানে করা হয়েছে। পুরুষ ও নারী পরস্পরের কাজ করার জন্য হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে।

***কৃপণের ধন* (১৯০০) :** মলিয়েরের 'The Miser' নামক প্রহসনের দ্বারা প্রভাবিত।

অমৃতলালের বৈশিষ্ট্য হাস্যরসের অবতারণায়, গম্ভীর বিষয়ের বর্ণনায় নয়। খাসদখল (১৯২২), নবযৌবন (১৯১৪) অন্যতম রচনা।

***খাসদখল* (১৯১২) :** 'খাসদখল'-এর মধ্যে সামাজিক সমস্যা আছে। মোক্ষদার কাহিনী অবলম্বন করে লেখক বিধবা বিবাহ এবং চিকিৎসকের সম্বন্ধে বিদ্রূপ করেছেন।

***নবযৌবন* (১৯১৪) :** 'নবযৌবন' উচ্ছল প্রাণময় সরস কৌতুকময় কমেডি।

***তরুবালা* (১৮৯১) :** 'তরুবালা' সরস সামাজিক নাটক। মৃত্যুঞ্জয়ের রসিকতা, হারাণের প্রণয়জ্বালা, বেণী এবং দামিনীর সরস কলহ এবং মাতাল বিহারীর বিদ্রূপ সবমিলিয়ে নাটকখানি হাসিতে উজ্জ্বল। এছাড়া তার অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে আছে।

***আদর্শবন্ধু* (১৯০০) :** যাজ্ঞবেণী (১৯১৮) ইত্যাদি।

***তিলতর্পণ* (১৮৮১) :** অমৃতলাল বসু তৎকালীন রঙ্গমঞ্চে অন্তরালে যেসব ঘটনা ঘটত তা নিয়ে লিখেছেন প্রহসন। ঐতিহাসিক অসংলগ্নতা এবং সস্তায় বাজিমাত করার যেসব সুলভ উপকরণ নিয়ে অনেক ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক নাটক লেখা হত, সেগুলোকে বিদ্রূপ করে এ প্রহসন লেখা।

পাড়াগেঁয়ে, মূর্খ, ছোটোখাটো জমিদার 'রাজবাহাদুর' উপাধি পাওয়ার জন্য কীভাবে নাকাল হয়েছে তা 'রাজাবাহাদুর' প্রহসনে দেখানো হয়েছে। মাণিক্য এবং তার বাবার পূর্ববঙ্গীয় কথোপকথন সরস ও

উপভোগ্য। অবতার (১৯০২) অবান্তর দৃশ্য সমন্বিত প্রহসন। নকল বৈষ্ণবকে উপহাস করা হয়েছে এখানে। অমৃতলাল যেসব নাটক লিখেছেন তার মধ্যে আছে 'আদর্শবন্ধু'; এতে গৈরিশ ছন্দ ব্যবহৃত। সংলাপ দুর্বল। সস্তা বীররস রয়েছে এখানে।

'হরিশ্চন্দ্র' এবং যাজ্ঞসেনী—এই দুটি অমৃতলালের পৌরাণিক নাটক। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক নাটক লেখা হয়েছে। অমৃতলালের নাটকটি (১৮৯৯) ক্ষেমীশ্বর চণ্ডকৌশিক অনুসরণ করে লেখা। কামন্দক এবং বিদূষক গ্রন্থের মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন।

***যাজ্ঞসেনী* (১৯১৮) :** গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের অনুরূপ পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে লিখিত নাটক। গিরিশচন্দ্রের মত অমৃতলালের গদ্য ও পদ্য উভয় ভাষা ব্যবহার করেছেন। মহাভারত এর উপাদান যাজ্ঞসেনী কেন্দ্রীয় চরিত্র নন। তাঁর ভিতরকার কোনো দ্বন্দ্ব নাটকে নেই। কৃষ্ণের চরিত্রের ওপর বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' ও নবীন সেনের কৃষ্ণের প্রভাব আছে। পাণ্ডবদের মধ্যে ভীমের চরিত্র উজ্জ্বল। ক্রূর, স্বার্থসন্ধানী, কূট, রাজনীতিক শকুনির চিত্র অবিস্মরণীয়। এই নাটকে অমৃতলালের গদ্য আধুনিক ও ঘরোয়া। ঐক্যবদ্ধ, উদার, স্বাধীন ভারতের কল্পনা তিনি করেছেন। অমৃতলাল নাটকের মধ্যে কোন অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা করেননি।

১০.৫ সারাংশ

আমরা এ পর্যন্ত আলোচনায় মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যরচনার পরিচয় দিয়েছি। তাঁদের নাট্যরচনার পটভূমি ও প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। তার মাধ্যমে তাঁদের নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানলাভ ঘটবে। এছাড়াও রসরাজ অমৃতলাল বসু সম্পর্কে ধারণা করতে পারা যাবে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায়।

১০.৬ অনুশীলনী

বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটকের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২। মধুসূদন দত্ত রচিত প্রহসন দুটি বাংলা নাট্যসাহিত্যে কেন গুরুত্বপূর্ণ তা নির্দেশ করুন।

৩। বাংলা সাহিত্যে প্রথম রাজনৈতিক নাটক নীলদর্পণ—আলোচনা করুন।

৪। বাংলা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের নাটক কি ধরনের পরিবর্তন এনেছিল—তা ব্যক্ত করুন।

৫। বাংলা নাটকের ইতিহাসে অমৃতলাল বসুর প্রহসনের গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

৬। অমৃতলাল বসুর প্রহসনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী:

১। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি নিয়ে আলোচনা করুন।

২। মধুসূদন দত্তের পৌরাণিক নাটকগুলির বিষয়বস্তু কি কি?

৩। মায়াকানন কবে রচিত হয়? এর বিষয়বস্তু কি?

৪। দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।

৫। 'সধবার একাদশী', 'জামাইবারিক'—দীনবন্ধু মিত্রের এইসব নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৬। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের সংলাপ নিয়ে আলোচনা করুন।

৭। অমৃতলাল বসুর লেখা পৌরাণিক নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৮। অমৃতলাল বসুর প্রহসনে তৎকালীন সমাজের কোন বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত?

৯। 'বিবাহবিভ্রাট', 'বাবু' এবং 'বৌমা' প্রহসনটি নিয়ে আলোচনা কর।

১০.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন ও সাহিত্য*— সুরেশচন্দ্র মৈত্র

২। *আশার ছলনে ভুলি*—গোলাম মুরশিদ

৩। *বাংলা নাটকের ইতিহাস*—অজিতকুমার ঘোষ

৪। *বাংলা নাটকের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত*—অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড/৪র্থ খণ্ড)*—সুকুমার সেন

৬। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিচয়*—দিলীপকুমার মিত্র

৭। *অমৃতলাল বসুর জীবন ও সাহিত্য*—অরুণকুমার মিত্র, নাভানা, কলিকাতা

৮। *বাংলা নাটকের ইতিহাস*—অজিতকুমার ঘোষ

৯। *বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস*—দর্শন চৌধুরী

১০। *বাংলা নাটকের ইতিহাস*—অজিতকুমার ঘোষ

১১। *শতবর্ষে নাট্যশালা*—আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অজিতকুমার ঘোষ

একক ১১ ❑ গিরিশচন্দ্র ঘোষ

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য

১১.২ প্রস্তাবনা

১১.৩ আলোচনা: গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১১.৪ সারাংশ

১১.৫ অনুশীলনী

১১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ উদ্দেশ্য

প্রখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা উৎপল দত্ত তাঁর 'গিরিশ মানস' বইটিতে বলেছিলেন যে গিরিশচন্দ্র বাংলা নাটকের জনক। বঙ্গ নাট্যশালার শেষ প্রয়োগাচার্য। নাটক রচনায়, অভিনয়ে, অভিনয় শিক্ষা দানে তাঁর জুড়ি ছিল না। উৎপল দত্তের মতে 'গিরিশচন্দ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তাঁর রচনা বিশ্ব নাট্যসাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য।' গিরিশচন্দ্রকে সেকালের দর্শক, বিভিন্ন মঞ্চের নটনটী, মঞ্চের মালিক—এদের কথা ভেবে নাটক লিখতে হয়েছে। বাংলা নাটক ও নাট্যশালা সৃষ্টির প্রথম পর্বে যাবতীয় উত্থানপতনের পরতে পরতে জড়িয়ে ছিলেন তিনি। দর্শকদের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর সংযোগ। ন্যাশনাল থিয়েটার, স্টার থিয়েটার, এমারেল্ড কিংবা মিনার্ভা বা ক্লাসিক থিয়েটারের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে তিনি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। গিরিশচন্দ্র নিজে যাত্রা করেছেন। যাত্রার দলে গান বেঁধেছেন। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন অভিনেতা। মঞ্চের প্রয়োজনে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন। কিন্তু তা যথেষ্ট না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত প্রায় একশটি নাটক লেখেন।

১১.২ প্রস্তাবনা

নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলা নাট্যজগতে স্বনামধন্য ব্যক্তি। একাধারে নট ও নাট্যকার হওয়ায় তিনি নাটকের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। নট হিসাবে তিনি সার্থক, আবার নাট্যকার হিসাবেও তিনি সার্থক। আমার বর্তমান অধ্যায়ে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করব।

তাঁর নাটকগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১। গীতিনাটক— আনন্দরহো (১৮৭৭), আগমনী (১৮৭৭), অকালবোধন (১৮৭৭), দোললীলা (১৮৭৮) ইত্যাদি।

২। পৌরাণিক নাটক— *রামলীলা* (১৮৮১), *রাবণবধ* (১৮৮১), *সীতার বনবাস* (১৮৮২), *পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস* (১৮৮৩), *জল্লাদ চরিত্র* (১৮৮৪), *জনা* (১৮৯৪), *পাণ্ডব কৌরব* (১৯০০)।

১১.৩ আলোচনা : গিরিশচন্দ্র ঘোষ

'জনা' শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক। নাটকের কাহিনীতে আছে পাণ্ডবদের অশ্বমেধের ঘোড়া মাহিষ্মতী রাজ্যে এলে নীলধ্বজের ছেলে প্রবীর সেই অশ্ব ধরে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়, নীলধ্বজের তাতে অনুমতি নেই। প্রবীরের মা জনা চাইলেন ছেলে যুদ্ধে যাক। যুদ্ধে প্রবীরের মৃত্যু। প্রবীরের স্ত্রী মদনমঞ্জরীরও মৃত্যু ঘটে। পুত্রের মৃত্যুতে উন্মাদিনী জনা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলেন। সে যুদ্ধে স্বামী তার সঙ্গী নন। কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক জনা দেশ রক্ষায় প্রাণ দিলেও এ নাটকের ক্রোড় অঙ্কে স্বর্গে তাঁরা সবাই মিলিত। দেশভাবনা নাটকে আছে। আর রয়েছে ভক্তিরসের প্রাচুর্য, ট্র্যাজেডি। ক্রোড় অঙ্কে স্বর্গে সকলে মিলিত।

গিরিশচন্দ্র তাঁর পৌরাণিক নাটকে রামায়ণ ও মহাভারত থেকে কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। পুরাণ ও তাঁর নাট্যরচনার আকর। তিনি বুঝেছিলেন 'হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম, মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।' গিরিশচন্দ্রের যুগ ধর্মমূলক জাতীয়তা ভাবের যুগ। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির অধিকাংশ যাত্রা লক্ষণাক্রান্ত। এই ধরনের নাটকে আছে ভক্তিরস এবং অলৌকিক অপ্রাকৃত বিষয়। এই সব নাটক মিরাকল' প্লে এর সদৃশ। তাঁর প্রথম নাটক 'রাবণ বধ' (১৮৮১) রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় ছিল। লক্ষণবর্জন (১৮৮২) নিতান্ত সংক্ষিপ্ত অনুল্লেখ্য নাটক। 'রামের বনবাস' (১৮৮২) বিভিন্ন ঘটনার শিথিল সমাবেশ। নাটকীয় রস জমাট বাঁধেনি। 'সীতাহরণ' এ ঘটনাগুলি ঘটে গেছে মাত্র। নাটকীয় দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ জমাট বাঁধেনি। গিরিশচন্দ্রের যেসব নাটকগুলো রামায়ণ অবলম্বনে রচিত, সেসব ক্ষেত্রে তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণকে অবলম্বন করেছেন। 'অভিমন্যুবধ' এবং 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' এই দুটি নাটক গিরিশচন্দ্র মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করে লিখেছেন। 'কমলে-কামিনী' চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'নল-দময়ন্তী' এবং 'শ্রীবৎস-চিন্তার' কাহিনীর মধ্যে সাদৃশ্য আছে।

অবতার মহাপুরুষ নাটক *চৈতন্যলীলা* (১৮৮৪), *নিমাই সন্ন্যাস* (১৮৮৫), *বুদ্ধদেব চরিত* (১৮৮৫), বিল্বমঙ্গল (১৮৮৮)। এই নাটকগুলোতে আছে মহাপুরুষদের জীবনকথা। চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলা অবলম্বন করে 'চৈতন্যলীলা' রচিত হয়েছিল। নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। 'চৈতন্যলীলা'র দ্বিতীয় ভাগ 'নিমাই-সন্ন্যাস'-এ সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তী লীলা প্রকাশিত। 'বিল্বমঙ্গল' গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমূলক অবতারকেন্দ্রিক নাটকের মধ্যে 'বিল্বমঙ্গল' সবচেয়ে জনপ্রিয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন 'বিল্বমঙ্গল', Shakespeare-এরও উপরে গিয়াছে, আমি এরূপ উচ্চভাবের গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই।' তখন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সময়কাল। হিন্দু সমাজের এই ধর্মপ্রাণতার পরিপ্রেক্ষিতে 'বিল্বমঙ্গল'-এর জনপ্রিয়তা অনস্বীকার্য। 'বিল্বমঙ্গল'-এর কাহিনী 'ভক্তমাল' নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত। নাটকটিতে ধর্মতত্ত্বই বড়ো কথা।

'করমেতিবাঈ' (১৮৯৫) কৃষ্ণভক্তি রসাশ্রিত নাটক। 'পূর্ণচন্দ্র', 'নসীরাম', 'বিষাদ' ও 'কালাপাহাড়' এই ভক্তিমূলক নাটকগুলিতে বিষয়বস্তুতে ঐতিহাসিক পটভূমিকা ন্যস্ত।

৪. সামাজিক নাটক—*প্রফুল্ল* (১৮৮৯), *হারানিধি* (১৮৯০), *বলিদান* (১৯০৫), *শাস্তি কি শান্তি* (১৯০৮)।

কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের কাহিনী নিয়ে গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক রচিত। 'প্রফুল্ল' তাঁর সর্বপ্রথম এবং প্রসিদ্ধ সামাজিক নাটক। রঙ্গমঞ্চে অত্যন্ত সমাদৃত। তাঁর সামাজিক নাটকগুলি অধিকাংশ বিয়োগান্তক। প্রফুল্ল তার ব্যতিক্রম নয়। আইন-আদালত সংক্রান্ত সমস্যা, ব্যাঙ্কফেল ও সেজন্য অর্থনৈতিক সমস্যা, মদ্যপান, পণপ্রথা এসব নাটকের বিষয়। প্রফুল্ল নাটকে গৃহকর্তা যোগেশের মানসিক বিষাদ, মদ্যপানে দুঃখ ভোলার চেষ্টা, উকিল মেজ ভাইয়ের কুটিল ষড়যন্ত্র, সবকিছু আত্মসাৎ করার চেষ্টা, রমেশের স্ত্রী প্রফুল্ল নিজের প্রাণের বিনিময়ে সংসার রক্ষা করতে চেয়েছে। যোগেশের 'আক্ষেপোক্তি 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' বাংলা থিয়েটারে একটি প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। অনেকে বলে থাকেন 'প্রফুল্ল' নাটকের নামকরণে একটি গুরুতর অসঙ্গতি আছে। 'প্রফুল্ল' চরিত্র এই নাটকে সামান্য স্থান অধিকার করে আছে। এই নাটকের ট্র্যাজেডি বিশেষভাবে যোগেশের ট্র্যাজেডি।

'বলিদান' নাটকে পণপ্রথার ভয়াবহতার সঙ্গে প্রকাশিত উনিশ শতকের অর্থনৈতিক সংকটগ্রস্ত বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ করুণাময়ের তিন কন্যা। বড় কন্যার বিবাহ হয় নীতিহীন, আদর্শহীন যুবকের সঙ্গে। দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হয় ব্যাধিগ্রস্ত বয়স্ক পাত্রের সঙ্গে। স্বামী মারা গেলে কন্যাটি নিজগৃহে আসতে বাধ্য হয়। পাড়ার ধনী ব্যক্তি রূপচাঁদের বিকৃতদেহ ছেলে কনিষ্ঠকন্যাকে বিবাহ করতে চাইলে পাড়ার ছেলে কিশোর ছোটো কন্যাকে বিবাহ করতে চায়, এদিকে মধ্যম কন্যাটি জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। কষ্ট সহ্য না করতে পেরে করুণাময়ও শেষপর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। উদ্দেশ্যমূলক নাটক। নাটক হিসেবে উপস্থাপনে মুন্সিয়ানা ও দক্ষতার ছাপ স্পষ্ট। চরিত্রগুলি বাস্তবজনোচিত। নাটকের মুখ্য চরিত্রের মধ্যে কয়েকজন ট্র্যাজেডির দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে গেছে। তা রোখা যায়নি।

হারানিধি (১৮৯০) নাটকটির বিষয় বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা। কন্যার অসুখে পিতার চরিত্রের পরিবর্তন নাটকটিকে মিলনাত্মক করেছে। এই নাটকের অঘোর চরিত্রটি সরস, ধারালো ও হাস্যরসপূর্ণ। নীলমাধব সবচেয়ে আড়ষ্ট চরিত্র। তার চরিত্রে প্রাণের স্পর্শ নেই।

***মায়াবসান* (১৮৯৮)**—নিষ্কামকর্ম এই নাটকের বক্তব্য। ধর্ম ও নীতিকথার প্রাচুর্য। অনেক জায়গায় তা ক্লান্তিকর। রঙ্গিনী নিষ্কামকর্ম ও সেবাধর্মের আইডিয়া। *শাস্তি কি শান্তি* (১৯০৮) বিধবাবিবাহের সমস্যা নিয়ে লেখা। গিরিশচন্দ্রের সাহিত্যে বিধবা শাস্ত্র শাসিত। তাই সেখানে বিধবার প্রেমে কঠিন সাজা। প্রমদা বিবাহিত বিধবা কিন্তু সে সুখী নয়। আদর্শ বিধবা নির্মলা। কষ্টসহিষ্ণুতা ও ব্রহ্মচর্য তাঁর সম্বল। এই নাটকটির শেষে মৃত্যুর ঘনঘটা, তাই মেলোড্রামার লক্ষণ অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

গৃহলক্ষী (১৯১২)-গিরিশচন্দ্রের সর্বশেষ সামাজিক নাটক। নাটকটির পঞ্চম অঙ্ক গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয় দেবেন্দ্রনাথ বসু লেখেন, এই নাটকটির সঙ্গে 'প্রফুল্ল' নাটকের ভারি মিল। গিরিশচন্দ্রের নাটকে নারী সতী নয়ত বেশ্যা, তবে এই নাটকে বিরজা গৃহের মমতাময়ী নারী। সংসারের রক্ষাকর্ত্রী। এই নাটকে তরঙ্গিনী পুত্রের সহায়তায় স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। স্বামীর বিরোধিতা গিরিশচন্দ্রের নাটকে ব্যতিক্রমী বিষয়।

ঐতিহাসিক নাটক-গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি ইতিহাসকে অনুসরণ করে নাটক লিখতেন। পড়াশুনো করে তাঁর নাটক লেখা। distortion of facts তিনি তেমন পছন্দ করতেন না। নাটকে গদ্য ও পদ্য উভয় রীতি ব্যবহৃত। গিরিশচন্দ্রের প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক নাটক 'চণ্ড'। টডের রাজস্থান এর অন্তর্গত Annuals of Mewar-এ সপ্তম পরিচ্ছেদে এর কাহিনী বর্ণিত আছে। নাটকের মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার যথেষ্ট। নাট্যরসেরও অভাব নেই। *ভ্রান্তি* (১৯০২)-এই নাটকটিকে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না, ইতিহাসের ছায়া না থাকলেও প্রেম ও ঈর্ষামূলক নাটক, নাটকীয় ঘটনাতে যুক্তির অভাব আছে।

সৎনাম (১৯০৪) মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ হয়েছিল সেই কাহিনী নিয়ে গিরিশচন্দ্র 'সৎনাম' নাটকটিক লেখেন। স্বাধীনতাকামী ব্রতধারী সম্প্রদায়ের আশা ও আশাভঙ্গের কাহিনী এটি। মৃত্যুর বাড়াবাড়ি নাটকটির বড়ো ত্রুটি। পরপর সাতটি চরিত্রের মৃত্যুতে যা হতে পারত ট্র্যাজেডি তা মেলোড্রামায় পরিণত হয়েছে। বাসর (১৯০৬)-কাহিনী চমৎকার। নাটকীয় Suspense আছে। নাটকের মধ্যে অনেকগুলি গান আছে, এই নাটকটি তেমন উঁচুদরের নয়।

অশোক (১৯১১) ইতিহাসের প্রতি যথাযোগ্য বিশ্বস্ততা রক্ষা করে নিজের মৌলিক কল্পনার খানিকটা মিশিয়ে গিরিশচন্দ্র এই নাটক লিখেছিলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য এই নাটকটিকে বি.এ. ও এম.এ সিলেবাসে অন্তর্গত করেছিলেন। এ নাটকটি ইতিহাস নয়, কিন্তু ইতিহাসকে নাটকে পরিণত করতে যা প্রয়োজনীয়তা গ্রহণ করেছেন গিরিশচন্দ্র। চণ্ডাশোক বুদ্ধের প্রভাবে কীভাবে ধর্মশোকে পরিণত হলেন এ নাটকে তা আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত।

সিরাজদৌল্লা (১৯০৬)-'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির অনুরোধে তিনি এই নাটক লেখেন। গিরিশচন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন। তিনি নাটক লেখার জন্য নানা জায়গা থেকে বই সংগ্রহ করে পড়তেন। সিরাজদ্দৌলা নাটকে জোহরা এবং করিমচাচা চরিত্র দুটি কাল্পনিক চরিত্র। বালগঙ্গাধর তিলক এই নাটকটি দেখতে আসেন। নাটকে সিরাজ ক্ষমাশীল ও স্বদেশবৎসল নবাব। স্বদেশপ্রীতি ও সুতীব্র ইংরেজ বিদ্বেষ তাঁর চরিত্রকে জাতীয়তায় মহিমান্বিত করেছে। এ নাটকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ১৯১১ সালে ৮ জানুয়ারি তারিখে গভর্ণমেন্ট সিরাজদ্দৌলা নাটকের অভিনয় ও প্রচার বন্ধ করেছিলেন। এই নাটকটি ট্র্যাজিক নাটক হিসাবে খ্যাত।

১১.৪ সারাংশ

পঞ্চরং এবং গীতিনাট্য-গিরিশচন্দ্র কতকগুলি প্রহসন রচনা করেছেন। এইগুলো পঞ্চরং নামে প্রসিদ্ধ। 'সপ্তমীতে বিসর্জন', 'বেল্লিক বাজার', 'বড়দিনের বখসিস' 'সভ্যতার পাণ্ডা' প্রভৃতি প্রহসনগুলির নাম উল্লেখ্য। সাধারণত শিবরাত্রি অথবা বড়দিন উপলক্ষে নানা আমোদের উপকরণ দিয়ে রচিত। এদের আকার খুব সংক্ষিপ্ত এবং ঘটনা নিতান্ত সাধারণ ও সরল। ব্যঙ্গের আঘাত প্রহসনগুলোতে আছে স্নিগ্ধ হাস্যরসের উচ্ছ্বল প্রবাহ নেই। পঞ্চরংগুলির ভাষা কলকাতা ইতর সমাজের ভাষা, রসিকতার শব্দ এবং বাক্যগুলোও গীতিনাট্য রচনা করেছেন। 'মলিনমালা' 'স্বপ্নের ফুল', 'দেলদার' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। 'আবুহোসেন' উল্লেখ্য গীতিনাট্য 'আবুহোসেন' কৌতুকাবহ, রোমান্টিক এবং হাস্যরসে পরিপূর্ণ।

১১.৫ অনুশীলনী

১) বাংলা নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের অবদান নির্ণয় করুন।

২) গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলি পর্যালেচনা করুন।

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১) গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকগুলি বিষয়ে আলোচনা করুন।

২) পৌরাণিক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র কী ধরণের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন?

৩) গিরিশচন্দ্রের দেবচরিতমূলক নাটক বিষয়ে ব্যক্ত করুন।

১১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) *গিরিশ মানস*—উৎপল দত্ত।

২) *বাংলা নাটকের ইতিহাস*—অজিতকুমার ঘোষ

৩) *বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস*—আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪) *অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*—বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

একক ১২ ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য

১২.২ প্রস্তাবনা

১২.৩ নাট্যকার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২.৪ সারাংশ

১২.৫ অনুশীলনী

১২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ উদ্দেশ্য

বাংলা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সমকালে সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক নাটকের যে ধারা প্রবাহিত ছিল, তার থেকে ভিন্নধর্মী নাট্য রচনা করেছেন তিনি। তাঁর সমকালে মঞ্চে এ ধরণের নাটক জনপ্রিয় হয়নি কেননা তৎকালীন দর্শক এই ভিন্নধর্মী নাটককে হৃদয়াঙ্গম করতে পারেননি। তাঁর অধিকালে নাটক তত্ত্বভাবনা সঞ্জাত, কাব্যধর্মিতা প্রধান লক্ষণ। চিন্তা ও চেতনাধর্মী। মৌলিক ভাবনাধর্মী রবীন্দ্রনাথ সবরকম রীতি নিয়ম অস্বীকার করে যে নাট্য রচনা করলেন তাতে বাংলা নাট্যসাহিত্যের পরিধি সম্প্রসারিত হল।

১২.২ প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাট্য সাহিত্যে একটি ব্যতিক্রমী স্থান দখল করে আছেন। তিনি জন্মেছেন জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। সেখানে বরাবরই অভিনয়চর্চার পরিবেশ ছিল। (রবীন্দ্রনাথের দাদা এবং বাড়ির অন্যান্যরা এ সব নাট্যচর্চায় অংশগ্রহণ করতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ফরাসী প্রহসনকার মলিয়েরের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর প্রহসনে মলিয়েরের প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারীও নাট্যচর্চা করেছেন। এদের বাড়ির বিয়েতে নাটক অভিনয় হত। তাছাড়া যাত্রা, কথকতা এসবেরও অভাব ছিল না জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। সুতরাং ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রতি ঔৎসুক্য বেড়েছিল। নাট্যগোষ্ঠী গঠন, মঞ্চ পরিকল্পনা, পরিচালনা, নাট্য প্রযোজনা, অভিনয় শিক্ষাদান, অভিনয়ে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা ছিল। নাট্যরচনার মধ্যে তিনি নতুন নতুন আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন।

১২.৩ নাট্যকার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা সখের নাট্যশালাগুলির মধ্যে অন্যতম। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় যে নাট্যসমিতি গঠিত হয় তার নাম কমিটি অফ ফাইভ। এতে মধুসূদনের *কৃষ্ণকুমারী নাটক* অভিনয় হয়। এরপর 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনীত হয়। এখানে অভিনীত হয়েছিল 'নবনাটক', 'নবনাটকের অভিনয় সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা লিখেছিল 'নাট্যশালা প্রকৃত রীতিতে ও দ্রষ্টব্যার্থগুলি সুন্দর, বিশেষতঃ সূর্যাস্ত ও সন্ধ্যার সময় অতি মনোহর হইয়াছিল।'

রবীন্দ্রনাথ অভিনেতা ও নাটকাররূপে আবির্ভূত হওয়ার আগে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা পাশ্চাত্য নাট্যরীতি গ্রহণ করেছিল। সাধারণ দর্শকের সামনে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিপ্রতিভার বাল্মীকির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। নাট্যকার হিসাবে এটাই তার প্রথম আবির্ভাব। এই নাটকের দৃশ্যসজ্জা অসাধারণ সুন্দর ছিল, বাস্তবধর্মী মঞ্চসজ্জা।

রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি গীতিনাট্য রচনা করেন। এর মধ্যে রয়েছে 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১)। রত্নাকরের দস্যু জীবন শেষ হয়ে গেল। দেশি বিদেশি রাগরাগিনীতে অপূর্ব লীলা দেখান হয়েছে।

মায়ার খেলা (১৮৮৮)—এখানে নাটক মুখ্য নয়, গান মুখ্য। মায়ার খেলা মানসী যুগে রচিত হয়। এ নাটকের মূলকথা—

'এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মিলে না

শুধু সুখ চলে যায়

এমনি মায়ার ছলনা'

রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কাব্যনাট্য আছে, ১৮৮১ সালে লেখা হয় *রুদ্রচণ্ড*। ক্রুদ্ধ জ্বালাময় প্রতিহিংসা এবং মধুর মমতাময় *প্রতিশোধ* (১৮৮৪) এই নাটকে তত্ত্বকথা বড়ো হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমার সহিত মিলন সাধনের পালা। এই সীমা-অসীমের মিলন তত্ত্ব এখানে ব্যক্ত হয়েছে। প্রেমের সেতুতে যখন দুই পক্ষের ভেদ ঘুচল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর মিলন হল, সীমায় অসীমে মিলিত হয়ে সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হয়ে গেল। সন্ন্যাসীর দীর্ঘ অন্তর্মুখী উক্তি অসঙ্গত এবং মূল্যহীন। গানগুলি অবশ্য উল্লেখযোগ্য।

রাজা ও রানী (১৮৮৯)-পরবর্তীকালে এই নাটক থেকে পরিবর্তন পরিমার্জনা করে 'তপতী'ও লেখেন রবীন্দ্রনাথ। এটি পঞ্চাঙ্ক সমন্বিত নাটক, এ নাটকে রাজা বিক্রমদেব রানী সুমিত্রার প্রেমে উন্মত্ত। তিনি রাজকার্য্য ছেড়ে সুমিত্রার সঙ্গে সময় কাটাতে চান। এতে রাজত্ব বিপর্যস্ত হয়। সুমিত্রা কাশ্মীর রাজকন্যা।

কাশ্মীর থেকে রানীর আত্মীয়রা বিক্রমদেবের শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। সুমিত্রা তা চায় নি। রাজার এই মতিভ্রমের জন্য সে রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে। কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দিরে গিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছে। রাজা অনুতাপগ্রস্ত হয়েছেন, এখানে একটি subplot আছে, তা কুমার ও ইলার কাহিনী। বিক্রম ও সুমিত্রার প্রেমে আছে অর্ন্তবিরোধ, কুমার ও ইলার প্রেমে পারস্পরিক বিশ্বাস। বিষাদে ও ব্যর্থতায় দুই প্রেমের পরিণতি। সুমিত্রা বৃহত্তর কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ আর বিক্রম সুমিত্রায় সংকীর্ণভাবে আসক্ত। কুমারসেন, চন্দ্রসেন, শঙ্কর প্রভৃতি চরিত্র *'রাজা ও রানী'তে* জীবন্ত। বিক্রমদেবের ট্র্যাজেডি করুণ ও সুতীব্র। রবীন্দ্রনাথ ভোগের দ্বারা ত্যাগকে শুদ্ধ করতে বলেছেন। যে প্রেম তা নয় তা অশান্ত ও অতৃপ্ত। তবে কুমারের কাটা শির, সুমিত্রার পতন ও মৃত্যু, ইলার আকস্মিক আগমন ও মূর্চ্ছা এ ভঙ্গি মেলোড্রামার লক্ষণ।

বিসর্জন (১৮৯১)—হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তিহীন ধর্মাচার কখনও আদর্শ হতে পারে না—এটাই নাটকের মূলকথা। *বাল্মীকি প্রতিভাতে* হিংসার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ, তারই পূর্ণতর রূপ বিসর্জনে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—এই নাটকে বরাবর এই দুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে—প্রেম এবং প্রতাপ। রঘুপতির প্রভুত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির দ্বন্দ্ব বেঁধেছিল। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য। রাজপরিবারের মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি। সে মন্দিরে বলিদান হয়। মন্দিরের আশ্রিত জয়সিংহ। রঘুপতি তার পালক পিতা। এ বলিদান জয়সিংহের পছন্দ নয়। ভাইরা মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবীকে আত্মবলিদান দিয়ে বলিদান বন্ধ করতে চায়। রঘুপতি শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের মূর্তিমান প্রতীক। তাঁর রুদ্রতেজ, অমিত পরাক্রম। গোবিন্দমাণিক্য অটল পর্বতের মতো তার বিরোধিতার তীব্রতাকে বার বার প্রতিহত করেছে। রঘুপতি এবং গোবিন্দমাণিক্য এই দুই বিপরীত শক্তির মধ্যে জয়সিংহ বিরাজ করছে। একদিকে ধর্ম এবং গুরুর প্রতি অটুট শ্রদ্ধা এবং নবজাগ্রত সত্যবোধ এই দুই বিপরীত ভাবের মধ্যে সে দোদুল্যমান। জয়সিংহের বিসর্জনে রঘুপতির আসন পরাজয় এবং পরিবর্তন। এই বিসর্জন নাটকের তত্ত্বকে সার্থক করেছে।

মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে *'চিত্রাঙ্গদা'*। চিত্রাঙ্গদা কুরূপা কিন্তু সুরূপা হয়ে অর্জুনের মন জয় করতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সম্বিৎ ফিরল। মর্মসঙ্গিনী হয়ে নয় সহধর্মিনী হয়ে বেঁচে থাকাই তার কাছে সুখকর ও প্রীতিকর।। এখানে প্রেয়বোধের সঙ্গে শ্রেয়বোধের একটা সামঞ্জস্য আছে। শেষ পর্যন্ত প্রেমের কল্যাণময় রূপ জয়ী হয়েছে এখানে।

মালিনী (১৮৯৬) সালে লেখা। এই নাটকের রচনার উৎস তিনটি। (১) বৌদ্ধ সংস্কৃতে লেখা "মহাবস্তাবদান' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মালিন্যবস্তু'র সংক্ষিপ্ত ইংরেজি অনুবাদে বারাণসীর রাজা কৃকির কন্যা মালিনীর কাহিনী। (২) লন্ডনের ক্রিমরোজ হিলে কবির কবির বন্ধু তারকনাথ পালিতের বাড়ি রবীন্দ্রনাথের নিশীথস্বপ্নে পাওয়া কাহিনী। (৩) এই সময় রবীন্দ্রনাথের মনে সত্য ধর্ম স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে *মালিনী* অনুবাদ করেন। কবি ও গ্রীক সাহিত্যের রসজ্ঞ ট্র্যাভিলিয়ানের মতে এই নাটকে গ্রীক নাট্য সাহিত্যের প্রভাব আছে। চিত্রাঙ্গদার মতো

'মালিনী'র অঙ্ক বিভাগ অনুপস্থিত। মাত্র চারটি দৃশ্যে বিভিন্ন ঘাত সংঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব রূপায়িত। রবীন্দ্রনাথ মালিনীর ভূমিকায় লিখেছেন—'শেক্সপীয়রের নাটক আমাকে কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখায়িত বৈচিত্র, ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে। মালিনীর নাট্যরূপ সংযত, সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন।'

মালিনী নাটকের গল্পটা এই যে—মালিনী রাজপ্রাসাদের মধ্যে অহং এ গণ্ডিবদ্ধ হয়েছিল। কাশ্যপের দীক্ষায় সে জগতে আনন্দলোকের সন্ধান পেল। ক্ষেমঙ্কর তার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও মালিনী ক্ষেমঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেছে। ক্ষেমঙ্কর সুপ্রিয়কে হত্যা করা সত্ত্বেও ক্ষেমঙ্করের জন্য ক্ষমা চেয়েছে। বৌদ্ধধর্মের আদর্শ এখানে জয়যুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি প্রহসন লিখেছেন। এর মধ্যে উল্লেখ্য *বৈকুণ্ঠের খাতা* (১৩০২) তিন দৃশ্যের প্রহসন। *চিরকুমার সভা* (১৩৩২) রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ প্রহসন। এই নাটকের প্রধান গুণ এর অর্থময়, ধ্বনিময় সংলাপ, কিন্তু সংলাপের চমৎকারিত্ব সত্ত্বেও কাহিনী দুর্বল। চিরকুমার সভার কৌমার্যব্রত এবং এর বিরুদ্ধে বিবাহের ষড়যন্ত্র—এই দুই ভাবের স্পষ্টতা প্রহসনে স্পষ্ট। চন্দ্রবাবু পর্যন্ত কৌমার্যনীতির ধারক, কুমার সভার নায়ক, কুমারদের চালক। অতি সহজে বিবাহ প্রথাকে মানলেন তিনি, শেষরক্ষা (১৩৩৯)—'শেষরক্ষা' প্রহসনখানি 'গোড়ায় গলদ' এর সংস্কৃত ও মার্জিত রূপ। প্রহসনের মধ্যে তিনজোড়া পাত্রপাত্রী তিনরকম স্বতন্ত্র ঘটনারস সৃষ্টি করেও পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়েছে। চন্দ্র এবং ক্ষান্তর অম্লমধুর দাম্পত্য প্রেম, বিনোদ কমলের অর্থসমস্যা, পীড়িত বিচ্ছেদ সম্বন্ধ এবং গদাই ও ইন্দুর ভ্রান্তি মধুর অনুরাগ—এই তিন প্রকার আখ্যান প্রহসনে আছে। প্রহসনের শেষে সকলের শেষরক্ষা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটককে রূপক সাঙ্কেতিক নাটক বলা হয়। রূপক আর সাঙ্কেতিক শব্দটার মধ্যে তফাত আছে। রূপক অর্থাৎ allegory, গ্যেটে বলেছেন— 'Allegory transforms the phenomenon into a concept, the concept into an image; but in such a way that in the image the concept may even be preserved, circumscribed and complete at hand and expressible। রূপকে যে কোনো বিষয়ের দুটি অর্থ থাকে। একটি অন্তরালের অর্থ আর একটি বাইরের অর্থ। একটি প্রকাশ্য অর্থ আর একটি গুপ্ত অর্থ। কবি ইয়েট্স সংকেতকে রূপাতীত বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন, তাঁর মতে—a symbol is indeed the possible expression of some invisible essence, a transparent এবং Allegory is one of many possible representations of an embodied thing' অরূপকে রূপের মধ্যে ধরার চেষ্টা সাঙ্কেতিক রচনায় এবং রূপকে রূপান্তরে দেখার ইচ্ছা রূপক রচনায়। সাঙ্কেতিক রীতিতে যা অপ্রকাশ্য তা অপ্রকাশ্য থেকে যায় কিন্তু রূপক রীতিতে অপ্রকাশিত ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয় মাত্র।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর আগে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেও পৃথিবীতে রোমান্টিসিজমের এর

প্রতিস্পর্ধী আন্দোলন হিসেবে যে Symbolistic Movement বিশ্বজুড়ে আছড়ে পড়েছিল তা রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো নাটকে প্রতিভাত।

শারদোৎসব (১৩১৫)—ঋতু প্রশস্তি পর্যায় নাটিকা। বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হওয়ার জন্য রচিত। প্রকৃতির ঋতু উৎসবে সাড়া দেওয়ার কথা। অভিজিৎ কিংবা পঞ্চক প্রকৃতিকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিল। এই নাটকে রাজসন্ন্যাসীর আধিপত্যে ঠাকুরদা উপেক্ষিত মর্যাদা লাভ করেছেন। তিনি ও তাঁর ছেলের দল ছুটির আনন্দকে ব্যক্ত করেছিল। এই নাটিকার বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে 'ঋণশোধ'। ঋণশোধের উপনন্দের ঋণশোধের একটি গভীরতর ও ব্যাপকতর তাৎপর্য আছে। সন্ন্যাসী বলেছেন—'আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করবে বড় সহজে করবে না। নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে করবে।'

প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬) ঐতিহাসিক নাটক। 'বৌ ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস থেকে মূল কাহিনী গৃহীত। এই নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী নামে একটি চরিত্র আছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে পথের যে আকর্ষণ তাই এখানে ধ্বনিত হয়েছে। উদয়াদিত্য, বিভা, ধনঞ্জয় সকলে পথে নেমে পড়েছে। নব মুক্তিপথে তাদের যাত্রা, পণ্যশক্তির সঙ্গে আত্মিকশক্তির দ্বন্দ্ব। রাজা প্রতাপাদিত্যের মধ্যে মানবিকতা বোধ নেই বললেই চলে, ফলে দেশেও অরাজকতা। এই অরাজকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নায়ক ধনঞ্জয় বৈরাগী। স্বৈরতন্ত্রী রাজশক্তির সঙ্গে এখানে প্রজাশক্তির সংঘাত। প্রতাপের আঘাতে উদয়াদিত্য, বিভা সরমা, বসন্তরায়—এই সব মানুষের জীবনে বিপর্যস্ত। কিন্তু তাঁর নিজের জীবনে কি ম্যাকবেথের মতো নিদারুণ একাকীত্ব নেমে এল না?

রাজা (১৩১৭)— গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি পর্বে রবীন্দ্রনাথের মন যখন অরূপ সাধনায় মগ্ন তখন তিনি অরূপ তত্ত্ব বিষয়ক নাটক রাজা রচনা করেন। রানী সুদর্শনা কথ্য রূপ ও সৌন্দর্যের মধ্যে মগ্ন ছিল। যে প্রভু কোনো বিশেষ রূপে সকল দেশে, সকল কালে, আবার অন্তরের আনন্দরসে যাকে উপলব্ধি করা যায় তাকে রূপের খাঁচায় খোঁজা বৃথা চেষ্টা। আপনার চিত্তকে দুঃখতাপে পরিশুদ্ধ করে সুদর্শনা রূপাতীতকে উপলব্ধি করেছিল। বিপদ ও দুর্যোগের মধ্যে সুদর্শনা অন্ধকার ঘরে রাজাকে খুঁজে পেল। আর এই আবিষ্কারে তাকে সাহায্য করেছে সহচরী সুরঙ্গমা। রূপসাগরে ফিরে অরূপ রতন খুঁজে পেয়েছে সুদর্শনা। রাজা নাটকে দুটো পরিবেশ অন্ধকার ঘর আর বসন্ত প্রকৃতি। সুদর্শনার বিভ্রম আর পতনের মূলে কাঞ্চী রাজ। কাঞ্চীরাজের চরিত্র জীবন্ত। ঠাকুরদা তার সরস কথা ও আনন্দময় মন নিয়ে উপস্থিত।

রানী সুদর্শনার সঙ্গে রাজার অন্ধকার ঘরে নিয়মিত মিলন হয়। সুদর্শনা তাতে সুখী নয়। সে আলোয় রাজাকে দেখতে চায়। রাজা বললেন বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে তুমি চাইলে আমাকে দেখতে পাবে। সুবর্ণর রূপ দেখে তাকে রাজা বলে ভুল করল সুদর্শনা। কাঞ্চীরাজও বুঝল যে এ রাজা নয়। কাঞ্চীরাজ সুদর্শনাকে লাভ করতে চেয়েছিল। সে সুবর্ণকে দিয়ে প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দিল। অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে সুবর্ণ স্বীকার করল সে রাজা নয়। অবশেষে সুদর্শনা রাজাকে দেখল ঝড়ের মেঘের মতো কালো, কুলশূন্য সমুদ্রের

মতো কালো। সুদর্শনা রাজার থেকে দূরে গেল। সে পিতার অন্তঃপুরে দাসীর পদ পেল। শেষ পর্যন্ত অনেকটা পথ পার হয়ে অনেক বাধাবিঘ্ন পার হয়ে রাজার সঙ্গে সুদর্শনার মিলন হয়। *অচলায়তন* (১৩১৮)-রবীন্দ্রনাথ বরাবর অর্থহীন সংস্কার এবং যুক্তিহীন আচার ও প্রথার তীব্র নিন্দা করেছেন। নাটক 'অচলায়তনে' ও আছে সেই ভাবনা। মহাপঞ্চক এবং তার অনুবর্তীরা সমাজের অস্পৃশ্য বলে সাধারণ মানুষকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। সেখানে আচার্যের মতো ক্ষমতাবান এবং পঞ্চকের মতো প্রাণবাণ পূরুষের স্থান হয়নি। সত্যবোধের আঘাতে অচলায়তের প্রাচীর খসে পড়ল। এখানে পঞ্চকের মতো প্রাণবাণ পুরুষের স্থান হয়নি। সত্যবোধের আঘাতে অচলায়তের প্রাচীর খসে পড়ল। এখানে পঞ্চকের জয় ও মহাপঞ্চকের পরাজয়। অচলায়তনের দুই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলেও তাতে দীপ্তি বা দাহ তেমন নেই। মহাপঞ্চক নাটকের জীবন্ত চরিত্র। অচলায়তনে একজন গুরু আছেন যিনি শোণপাংশুদের কাছে দাদাঠাকুর দর্ভকদের কাছে গোঁসাই। যেখানে বাধার প্রাচীর সেখানে গুরুর আবির্ভাব। সেই প্রাচীর ভাঙার জন্য, অচলায়তনে প্রাচীর ভাঙার পর গুরুর সঙ্গে মহাপঞ্চকের কোনো ব্যবধান রইল না। গুরুর পথ নিরপেক্ষ সত্যের পথ। নাটকের মধ্যে ভক্তিবাদ শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছে।

ডাকঘর (১৩১৮)—রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকগুলোর মধ্যে—'ডাকঘর' সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অমল যেন রুদ্ধগৃহবাসী বালক রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিরূপ। কবি 'জীবন স্মৃতি' তে বলেছেন— 'ছেলেবেলায়-জীবন ও জগতের রহস্যরসে মন মাতিয়া থাকে, পরিচিত দৃশ্যবস্তুর মধ্যে অদ্ভুত রহস্যময় বিষয়ের সন্ধানে মন ঘুরিতে থাকে'। অমল পিসিমার কাছে মানুষ। সে অসুস্থ। তার ঘরের বাইরে যাওয়া বারণ। সে রাজার চিঠি আসার স্বপ্ন দেখে। সুধা এসে অমলের খেলার সঙ্গী হয়। অমল ডাকহরকরার কাছে রাজার চিঠির খোঁজ করে। অমল সুদূরের পিয়াসী। সে দইওয়ালার মতো দূর দূর গাঁয়ে দই বেচতে চায়, অমলের অসুস্থতা বাড়ে। তার চোখে অন্ধকার নেমে আসে। শেষ পর্যন্ত রাজার চিঠি আসে। ঠাকুরদা বলেন অমল যে ঘরে শুয়ে আছে সে ঘরে জানালাগুলো সব খুলে দাও। এই নাটকে মৃত্যুচেতনার উপলব্ধি আছে। যে দেহ খাঁচার মধ্যে অমল আবদ্ধ ছিল অবশেষে মৃত্যুর মধ্যে তা থেকে সে মুক্তি লাভ করে। তার সৌন্দর্য পিপাসু চিত্ত অখণ্ড, পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের সন্ধান পেল। মৃত্যুর পরে সব রহস্যের তলে সে পৌঁছতে পারল।

ফাল্গুনী (১৩২৩)—'পূরবী, বলাকা' কাব্য গ্রন্থ 'ফাল্গুনী নাটক লেখার সময়ে লেখা হয়েছিল। 'গীতাঞ্জলি' পর্বের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার পথ পার হয়ে তিনি পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ ও গতিবাদের পথে ভ্রমণ করছিলেন। 'বলাকা' গতিবাদের কাব্য, সেখানে আছে যৌবনের বন্দনা। এই নাটকে বসন্তের উচ্ছ্বসিত আনন্দ উৎসবে চিরনবীনকে বন্দনা করা হয়েছে। এই নবীন বারবার মৃত্যুর মধ্যে অবগাহন করে জন্মলাভ করে। পুরাতন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চিরনবীন হয়ে ওঠে। এই তো বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে যারা মৃত্যুকে ভয় করে তারা জীবনকে চেনে না। তারা জড়কে বরণ করে জীবন্মৃত হয়ে থাকে। বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাদের।

ফাল্গুনীর ভূমিকায় একটি নাট্যদৃশ্য আছে। সংস্কৃত নাটকের প্রকরণ সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। এই নাটকটি কাব্যময়। এই নাটকে একদল বাঁধন ছেঁড়া প্রকৃতি পাগল ছেলে বুড়োর দল এসে নাচগানে মেতে উঠেছে। এদের মধ্যে কে এল কে গেল কার সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগল তা দেখার সময় নেই। বসন্তের বাতাসের মতে চরিত্রের গতি।

মুক্তধারা (১৩২৯)-রবীন্দ্র নাট্যধারায় 'মুক্তধারা'-র উল্লেখ্য নাটক। কালিদাস নাগকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—'আমি মুক্তধারা বলে একটি ছোটো নাটক লিখেছি। এতদিনে 'প্রবাসী'তে সেটা পড়ে থাকবে। তার ইংরেজি অনুবাদ মডার্ন রিভিউতে বেরিয়েছে। তোমার চিঠিতে তুমি machine সম্বন্ধে যে আলোচনার কথা লিখেছ সেই machine এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়।

কাহিনীতে আছে উত্তরকূটের স্বৈরাচারী শোষক রাজতন্ত্র শিবতরাই দক্ষিণের এর ধনসম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাদের জব্দ করার জন্য যন্ত্ররাজ বিদূতিকে দিয়ে যন্ত্র নির্মাণ করেছে। সে যন্ত্র ঝরণার জলকে বেঁধেছে। তৃষ্ণায় শিবতরাই বিপন্ন, এর জন্য ভৈরব প্রাঙ্গণে উৎসব। তাতে যোগ দিতে চায় না যুবরাজ অভিজিৎ। সে রাজার কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান। অভিজিৎ শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদ করেছে। সে নিজেই নন্দি সংকট ভেঙে ঝরণার ধারাকে মুক্ত করে। যুবরাজ তার প্রাণের বিনিময়ে মানুষকে মুক্তি দেয়। যন্ত্র পরাজিত মানুষের কাছে। এই নাটকের নাম ছিল পথ। পরে ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ হয়েছে *মুক্তধারা*। এই নাটকে বিভূতি অত্যন্ত শক্তিশালী, মেধাবী। তার ধনবাদী জড়বাদী দানবীয় শক্তির কাছে মনুষ্যত্বের মূল্য নেই। ধনঞ্জয় রবীন্দ্র ভাবাদর্শের উদ্বুদ্ধ বলিষ্ঠ চরিত্র, এ নাটকে যন্ত্রের অত্যাচার অবিচার ও উৎপীড়ন আছে। আছে উৎপীড়কদের কাছে মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। তার চরিত্রের অন্তর্গত কথা এই যে, যে মানুষ আঘাত করছে আত্মার ট্র্যাজেডি তারই। মুক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণ দিয়ে ভাঙবার ভার তার। আস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী নির্মল হৃদয় ধনঞ্জয় ঠাকুর পরমেশ্বরের বিচারে আস্থাবান (আর সেজন্য সে বিশ্বাস করে 'আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন।'

রবীন্দ্রনাথের নাটকে এক একটি চরিত্র মহৎপ্রাণ জগতের কল্যাণে আত্ম উৎসর্গ করেছে। এই ধারায় অন্যতম চরিত্র অভিজিৎ। কালিদাস নাগকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন অভিজিৎ সম্পর্কে-'যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে, কেননা যে মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে—তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ।' (২১শে বৈশাখ, ১৩২৯) অভিজিৎ বিভূতির কাছে দূত পাঠিয়ে যন্ত্রের বিভীষিকা বোঝাতে চেয়েছে। কিন্তু সে ফিরে এসেছে। তখন অভিজিৎ বাঁধ ভেঙে যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে শিবতরাইবাসীকে। সে রাজবাড়ি ত্যাগ করেছে। তারপর আত্মবলিদানে দেশের কল্যাণ করেছে। 'মুক্তধারায়' রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ গান ব্যবহৃত। গানগুলি কাহিনীর সঙ্গে মানানসই।

'রক্তকরবী' (১৩৩১) এই নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় করে দিচ্ছে। 'রক্তকরবী' নাটকে যক্ষপুরীও এক অতিকায় অজগরের মতো মানুষকে গ্রাস করে চলেছে।

আধুনিক জড়বাদী বিশ্বের দুই অংশ। যন্ত্র ও ধনতন্ত্র। এরা পরস্পরের পরিপূরক। এই বস্তুশক্তি মাটিকে পাষাণ আর মানুষকে পুতুল করে ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথ এই উন্মত্ত বস্তুশক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। এটা প্রেম ও প্রাণের প্রতিবাদ। যক্ষপুরীতে মানুষ ধানের কথা ভুলেছে। লক্ষ্মীর শাসন ফেলে কুবেরের আগারের দিকে ছুটেছে। এই আকর্ষণ অশুভ কিন্তু সত্য। 'যক্ষপুরী' তে জালের আড়ালে থাকেন রাজা। যক্ষপুরীতে স্তরে স্তরে শাসনব্যবস্থা বিন্যস্ত। সেখানে সর্দার আছে, মোড়ল আছে, অধ্যাপক আছে, পুরাণবাগীশ আছে, আছে শাসনতন্ত্রের জাঁতাকল। সেখানে এসে পড়েছে নন্দিনী, ঈশানী পাড়ার মেয়ে। সে এই যক্ষপুরীর মধ্যে প্রাণের ঢেউ তুলেছে। সেই ঢেউয়ের দোলা রাজাকেও চঞ্চল করে তুলেছে। রাজাকে সে জালের অন্তরাল থেকে বাইরে আসার স্বপ্ন দেখায়। সমস্ত যক্ষপুরীর মধ্যে সে নতুন চেতনা সঞ্চার করতে চায়। নন্দিনীর প্রেমিক রঞ্জন। নন্দিনী যক্ষপুরীতে রঞ্জনের অপেক্ষা করে। শেষ পর্যন্ত রাজার কাছে সে রঞ্জনের মৃতদেহ আবিষ্কার করে। রাজা নিজেই জালের অন্তরাল থেকে বের হয়ে আসেন। আপন হাতে ভেঙে দেন ধ্বজা। এই নাটকে কিশোর একটি প্রাণবন্ত চরিত্র। সেও নন্দিনীকে পছন্দ করে ভালোবাসত। নন্দিনীর আভরণ রক্তকরবী। রক্তকরবী প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক প্রেমের যেখানে ইঙ্গিত সেখানে রক্তকরবীর অবতারণা।

'মুক্তধারা'র মত 'রক্তকরবী'তে অঙ্ক ও দৃশ্য ভাগ নেই। এই নাটকের গানগুলি নাট্যবিষয়ের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' এই নাটকের থীম সংগীত। ধনতান্ত্রিক অত্যাচারের বীভৎস, কুৎসিত রূপটি এখানে প্রকাশিত।

কালের যাত্রা (১৩৩৯)-এর মধ্যে দুটি নাটক আছে 'রথের রশি' এবং 'কবির দীক্ষা'। 'কবির দীক্ষা'য় নাটকীয় ঘটনা সংস্থান ও চরিত্র সমাবেশ তেমন নেই। 'রথের রশি'র মধ্যে 'ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান' এর লীলা দেখানো হয়েছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মন্ত্রবল, স্ত্রীলোকদের পূজা ও নৈবেদ্য, সৈনিকদের বাহুবল, ধনপতির ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা যে রথ টলাতে পারল না, শূদ্রদের স্পর্শমাত্রই তা সচল হয়ে উঠল। সবার পিছে, সবার নিচে, সর্বহারাদের মাঝে মহাকাল আজ নেমে এসে শূদ্রশক্তিকে জাগ্রত করে তুলেছেন, রথের রশি'র ভাষা গদ্য হলেও কবিতার মতো মধুর ও ছন্দোময়।

তাসের দেশ (১৩৪০)-এখানেও রূপককে গ্রহণ করা হয়েছে। লাল কাল উর্দিপরা তাসগুলো নিয়মের আবর্তে ঘুরছে, কিন্তু প্রাণের ছন্দে চলছে না। তাদের চাল আছে কিন্তু চলন নেই। তারা চ্যাপ্টা, ভিতরে হাওয়া নেই বলে তারা আগাতে পারে নি। তারা অতিমাত্রায় গম্ভীর এবং ব্রহ্মার হাই থেকে উৎপন্ন। রূপক অত্যন্ত স্পষ্ট নামগুলি তাসের। কিন্তু তারা নিয়মের গড়ে থাকা বাসিন্দাদের প্রতিভূ শোধবোধ (১৩৩৩)

'কর্মফল'- গল্পের নাট্যরূপ'। 'শোধবোধ' এতে নকল সাহেবিয়ানাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বাঁশরি (১৩৪০) সোমশঙ্কর ও বাঁশরীর প্রেম এ নাটকের মূলকথা।

১২.৪ সারাংশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হল এখানে প্রত্যেকটি নাটকের বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। তাই প্রধান প্রধান নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাণ জীবনে প্রচলিত পাঁচ অঙ্কের নাটক বিসর্জন, এবং 'রাজা ও রানী' নাটক দুটি লেখেন। এরপর তিনি নাট্য রচনা নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। বিভিন্ন ধরনের আঙ্গিকে নাটকগুলি রচনা করেছেন। তিনি, পাঁচ অঙ্কের নাটক, সাংকেতিক নাটক, রূপক নাটক, প্রহসন রচনা করেছেন।

১২.৫ অনুশীলনী

১) বাংলা নাট্যধারায় রবীন্দ্রনাথের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২) রবীন্দ্রনাথ কি ধরণের নাটক লিখেছেন তা আলোচনা করুন।

৩) রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটক নিয়ে আলোচনা করুন।

৪) রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের তাৎপর্য নির্ণয় করুন।

৫) রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাঙ্ক সমন্বিত নাটক নিয়ে আলোচনা করুন।

৬) রবীন্দ্র গীতিনাট্যের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করুন।

১২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) *রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা*—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

২) *রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য*—শান্তিকুমার দাশগুপ্ত

৩) *রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ*—প্রমথনাথ বিশী

৪) *বাংলা নাটকের ইতিহাস*—অজিতকুমার ঘোষ

৫) *রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য*—অশ্রুকুমার সিকদার

৬) *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাথ*—শঙ্খ ঘোষ

মডিউল : ৪

বাংলা উপন্যাস ও ছোটোগল্প

একক ১৩ ❑ বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ

গঠন

১৩.১ উদ্দেশ্য

১৩.২ প্রস্তাবনা

১৩.৩ উপন্যাস রচনার প্রাগভাষ

১৩.৪ উপন্যাস রচনায় বিদেশি প্রভাব

১৩.৫ উপন্যাস ও আধুনিক কাল

১৩.৬ বাংলা উপন্যাসের বিকাশ

১৩.৭ সারাংশ

১৩.৮ অনুশীলনী

১৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- উপন্যাস যে সাহিত্যের একটি স্বাতন্ত্র সে বিষয়ে একটি পূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- উপন্যাস সৃষ্টির পশ্চাতে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাস্তব জীবন ও নরনারীর মনস্তত্ত্বের বহুমুখিনতা অনুধাবন করতে পারবেন।
- উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্র অনুযায়ী শ্রেণিভেদগুলি চিনে নিতে পারবেন।
- ভাবনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ধারণা নিতে পারবেন।

১৩.২ প্রস্তাবনা

সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপের মত উপন্যাস একটি সংরূপ। এই সংরূপটি জায়মান। ইংল্যান্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে জোয়ার এলেও বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের জন্ম হয় উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বলা যেতে পারে বাংলা উপন্যাস পুরোপুরি আধুনিক যুগের ফসল। বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নের ইতিহাস, উপন্যাসের

গতি-প্রকৃতি এবং তার শক্তি-দুর্বলতা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। সমকালীন জীবন সম্বন্ধে আগ্রহ হল উপন্যাসের জন্মলগ্নের প্রাথমিক শর্ত, কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত সমকাল ও সমকালীন জীবন সম্বন্ধে আগ্রহের ভিন্ন রূপ ভারতবর্ষের ইতিহাসে অবশ্য অন্যভাবে উপস্থিত ছিল। যে ধর্মাশ্রয়ী চেতনা, আধ্যাত্ম-কীর্তি সমন্বিত জীবন প্রাচীন ও মধ্যযুগ পর্যন্ত মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল, তা খসে পরতে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর এক নতুন জীবন বোধে। সমকালীন জীবন সম্বন্ধে বাস্তব আগ্রহ এই নতুন চেতনার জনক। এই বাস্তব আগ্রহের স্বরূপনির্ণয় বাংলা উপন্যাসের জন্মকালের আলোচনায় অবশ্য দরকার। পাশ্চাত্য গঠনমূলক ধারণা ও সমকালীন জীবনবোধের সংমিশ্রণে বাংলা উপন্যাস সৃষ্টি। এই যুগের জীবনের সমগ্র চেহারার কিছুটা নকশা সংগ্রহ না করলে এ-যুগের জীবনের সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না। বলাবাহুল্য সব দেশ, সব ভাষার উপন্যাসের উদ্ভবের ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা প্রায় একইভাবে ঘটেছে। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা এবং মফস্বলের জীবনের বিন্যাসে ধনতান্ত্রিক সমাজ ও শিল্প সভ্যতার প্লাবন যখন সমাজ-মানুষের জীবনে আলোছায়ার বুনন সৃষ্টি করেছিল, যখন মানুষ নানাবিধ দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত ঠিক তখনই উপন্যাস সৃষ্টির বাস্তব পটভূমি গড়ে ওঠে।

শিল্প সভ্যতা ও ধনতান্ত্রিক সভ্যতার কারণে সামন্ততান্ত্রিক ও কৃষি কেন্দ্রিক গ্রাম ব্যবস্তায় পাটল ধরে। এই ক্ষয়ক্ষতি বিনিময়ে কিছুটা পুরনো সমাজ কাঠামো নিয়ে গ্রামীণ সভ্যতা টিকে থাকলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে বাংলা দেশের শিক্ষিত ভদ্রসমাজের কলকাতা অভিমুখী জীবন বিস্তার ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই সময়পর্বের অনেক আগে থেকেই কলকাতা শহর ইংরেজদের আনাগোনা ও ব্যবসাকেন্দ্র হওয়ার কারণে বাংলা তথা দেশের প্রধান শহর হয়ে ওঠে। কলকাতা শহর সেই সময় থেকে সামাজিক জীবনের একাংশে যেমন বহু জয়ানীগুণী ব্যক্তির সমাবেশে সংস্কৃতির নবরূপ গনে উঠছিল, অন্যদিকে তেমনই নব্য আধুনিকতার নামে ভ্রষ্টাচার, মেকি ও চারিত্রিক বিকারের উৎস কেন্দ্রেও পরিণত হচ্ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে প্রহসন ও ব্যঙ্গ রচনাগুলো সেই নাগরিক মেকি ও বিকারকে উপজীব্য করে রচিত হচ্ছিল। সমকালীন কলকাতা শহরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা কারণে এক নতুন শ্রেণির জন্ম দিয়েছিল-মধ্যবিত্তশ্রেরি। সেই সঙ্গে সামাজিক এই রূপান্তরের মুখে সমাজের একটা অংশ তখন 'বাবু' অবিধা অর্জনের জন্য ব্যস্ত। এই নব উদ্ভূত বাবু সমাজ ও মধ্যবিত্তশ্রেণির যাপিত জীবনের নানা চিত্র ধরে রাখার জন্য সেই সময় জন্ম নেয় নানা সংবাদ ও সাময়িকপত্র। 'বাবু'রা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত বাংলা নকশা, উপন্যাসের নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠে। 'বাবু' সমাজেরই একটা অংশ সেই জীবন থেকে আবির্ভূত হলেও আত্মসচেতন ও জীবনবোধে সত্যাভিপ্রায়ী ব্যক্তি যারা 'ভদ্রলোক' তারা হয়ে ওঠে সেই সব নকা ও উপন্যাসের স্রষ্টা।

একটা সময় পর্যন্ত বাংলা গদ্য সাহিত্য বলতে ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যের আক্ষরিক ও সার অনুবাদ ছাড়া আর কিছু বোঝাত না, সেখানে এই 'ভদ্রলোক' লেখক সেই যুগের বাবু সমাজের

জীবন-বিকারকে ব্যঙ্গাত্মক ভাবে উপস্থাপন করায় কালক্রমে বাংলা ভাষায় সাহিত্যে একটা নতুন সংরূপকে খুঁজে পেয়েছিল। প্রাথমিকভাবে এই অসংহত সাহিত্য সংরূপ একটা সময় পর্যন্ত 'নকা' নামে চিহ্নিত হয়। পরে এটির সংহত ও মার্জিতরূপ 'উপন্যাস' নাম সাহিত্য সংরূপটি নির্মিত হয়।

১৩.৩ উপন্যাস রচনার প্রাগ্‌ভাষ

উপন্যাস-এই নামকরণটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থটি ভাবার মত। উপন্যাস কথাটির মধ্যে 'উপ' এই উপসর্গটি লক্ষণীয়। এছাড়া 'ন্যাস' শব্দটি অনেকটা শৈলী নির্দেশক। জীবনের যথাযথ রূপ নয়, সেই রূপ-স্বরূপের যথাযোগ্য বিন্যাসই হল উপন্যাসের আসল কথা। ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আমদানি পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে হলেও তা যে একেবারে আলটপকা বাংলা সাহিত্যে ঢুকে পড়েছে এমনটা বলা যায় না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্যেও এর ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, কাব্যে যেখানে লেখকের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সমাজের বাস্তব ছবি ধরা পরেছে সেখানেই ভাবী উপন্যাসের ছায়াপাত ঘটেছে। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও আখ্যায়িকা, যেমন 'কথাসরিৎসাগর', 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', 'দশকুমারচরিত', 'কাদম্বরী' ইত্যাদি গ্রন্থগুলিতে বর্ণনা বাহুল্যের অন্তরালে উপন্যাসের উপাদান যে নিহিত আছে তা অনুধাবন করা যায়। বৌদ্ধ জাতকগুলির মধ্যে বাস্তব জীবনের নানা ছবি খুব স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। বলাবাহুল্য সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে, সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনায় বাস্তবতার সুরটি গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। এর কারণ অনুমান করে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "বোধ হয় সহার একটি কারণ এই যে, বৌদ্ধধর্ম অনেকটা গণতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত। ইহা হিন্দুধর্মের সনাতন শ্রেণীবিভাগগুলি ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া মানুষকে একটি নতুন ঐক্য ও সাম্যের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে এবং চিরপ্রথাগত রাজন্য ও অভিজাতবর্গের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া মধ্যশ্রেণীর লোকের বাস্তব জীবনকে নিজ বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা-শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩)। এই জাতকগুলির মধ্যে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ জনের কাহিনি যে পরিমাণে স্থান পেয়েছে তা আমাদের অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায় না। শুধুমাত্র নীতি প্রচারের জন্য গল্পগুলিকে মনোহর বা চিত্তাকর্ষক করে তোলার চেষ্টা জাতক লেখকেরা করেননি। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্মাচরণের নানা সমস্যা, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ঈর্ষা, ভক্তি ও ভণ্ডামি—এই সমস্ত কিছুর নিখুঁত ছবি জাতকগুলির মধ্যে ধরা পরেছে। এই বিষয়গুলি উপন্যাসের পথপ্রদর্শক ও অগ্রদূতের দাবী করতে পারে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সংস্কৃত গল্পসংগ্রহ, যেমন—পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, দশকুমারচরিত প্রভৃতি রচনাগুলি মূলত নীতিশিক্ষার জন্য রচিত হলেও সাধারণ আখ্যানগুন দেখা যায়। এই গল্পগুলিতে দাম্পত্য জীবন, সামাজিক ও পারিবারিক ছবির নানাদিক অঙ্কিত হয়েছে। 'দশকুমারচরিত' গ্রন্থে তৎকালীন গার্হস্থ জীবন অপেক্ষা রাজসভার চক্রান্ত, কুটিলতার ছবি খুব বাস্তব সম্মত ভাবে ফুটে উঠেছিল। পরে রাজপরিবেশের ওই সমস্ত কাহিনিগুলি প্রেম ও কৌতুক রসে জারিত হয়ে নানা আখ্যানের জন্ম দিয়েছিল।

বাংলাদেশের মাটি-জল-বাতাস নানা লৌকিক গল্প ও রূপকথার গল্পে পরিপূর্ণ। এগুলি বাংলা উপন্যাসের পদাঙ্ক নির্মাণে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছিল। উপন্যাসের মত এগুলির মূল চালিকাশক্তি হল আখ্যান, যা খাঁটি ও অবিমিশ্র। অন্যদিকে এর মধ্যে অলৌকিকতা থাকলেও একটি সূক্ষ্মভাবে দেখলে বোঝা যাবে, এতে লেখক মানুষের লৌকিক ও সামাজিক ব্যবহারেরই পরিণাম দেখে তার উপর নিজের সমালোচনা আরোপ করেছেন মাত্র। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মূলত ধর্মকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল, একথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেই ধর্ম বোধের অন্তরালে দেবতা যে মানুষেরই অধীন তার প্রকাশ সর্বত্র দেখা যায়। দেবতাদের ক্রুর ও খল মানসিকতা দেবকীর্তি বন্দনার চাইতে উজ্জ্বল বাস্তবচিত্র অনেক বেশি স্বপ্রভ। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এযুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পৃ.১২)। চৈতন্য জীবনী সাহিত্যে, চৈতন্যের বাস্তব জীবনচিত্র সহ সমাজ বাস্তবতার নানা আখ্যান, ময়মনসিংহগীতিকায় গ্রামীণ জনজীবনের বাস্তব রূপ, আরাকান রাজসভার রোমান্সধর্মী আখ্যান ও নাথ-সাহিত্যের ধর্মীয় আবহের অন্তরালে বাস্তবতার চোরা স্রোত—এই সমস্তকিছুই উপন্যাস রচনার অগ্রদূত উপাদান হিসেবে মধ্যযুগের সাহিত্যে বর্তমান ছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে বাঙালির জীবনে ও মনে ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এই সময়পর্বে সাময়িক পত্রের প্রতিষ্ঠা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রটিকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য দেশের মধ্যে ঘটে যালয়া বিচিত্র, কৌতুহলোদ্দীপক সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন করতে থাকে। 'বাবু'-দের জীবনরঙ্গের নানা দিক সেই সময়ের সংবাদপত্রগুলির সংবাদ পরিবেশনের একটি 'বিষয়' হয়ে দাঁড়ায়।

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু-বিলাস'-এর পর থেকে বাংলা সাহিত্যের নকশা রচনার জোয়ার আসে। সেগুলির মধ্যে বাংলা উপন্যাসের অনেক উপাদান রক্ষিত ও লক্ষিত হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম হল 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২) ইত্যাদি।

১৩.৪ উপন্যাস রচনায় বিদেশি প্রভাব

'নববাবু-বিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল' ইত্যাদি নকশাগুলি প্রথম বাংলা উপন্যাসের গৌরব দাবি রাখলেও বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় শ্রীমতী হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্স রচিত 'করুণা ও ফুলমণির বিবরণ' (১৮৫২) গ্রন্থটি উল্লেখ করতেই হবে। ঊনিশ শতকে বাংলাদেশে যখন নকশা জাতীয় এক নতুন ধরণের লেখার ঝোঁক চলছে তখন নতুন কলকাতা নগর ও নাগরিক মনের জটিলতাকে লিপিবদ্ধ

করেছিলেন হ্যানা ক্যাথারিন। এই গ্রন্থেও উপন্যাসের আভাস পাওয়া যায়। সুকুমার সেন বাংলা উপন্যাস রচনার চারটি ধারার কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি হল "খ্রিস্টান প্রচারকদের লেখা অনুবাদ ও মৌলিক নীতিকাহিনী। এই ধরনের বসয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং প্রথম (?) মিসেস্ হ্যানা ক্যাথেরীন মলেনস-এর (Mullens) 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২)। বইটি আকারে ও প্রকারে উপন্যাসের মতো। ইহাতে অনুন্নত সমাজের বাঙ্গালী খ্রিস্টানের জীবনচিত্র যথাযথভাবে বর্ণিত। ভাষা সরল ও শোভন, বিদেশিনী লেখিকার পক্ষে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই বইটি দেশীয় খ্রিস্টানদের বিদ্যালয়ে পাঠ্য হসয়াছিল এবং সেই কারণে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।" (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৩)। প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভাবের কয়েক বছর আগে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' প্রকাশিত হয়। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে গ্রন্থটি "বিদেশিনীর পক্ষে এ গ্রন্থ রচনা একটি অপূর্ব বিস্ময়।...এর ভাষার আশ্চর্য সরলতা ও পরিচ্ছন্নতা লক্ষ করা যায়।...'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে'র এ ভাষা তেকে লেখিকার আশ্চর্য বাংলা-ভাষাবিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাবে।...তবে এই প্রসঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে, শ্রীমতী ম্যুলেন্স অতি চমৎকার বাংলাভাষা আয়ত্ত করলেও উপন্যাস বা কথাশিল্পের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয় না" (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৩২৪-৩২৫)। সত্যজিৎ চৌধুরী উল্লেখ করেছেন "রচনার ভাষা অত্যন্ত সরল এবং পরিচ্ছন্ন। কোনো বিদেশিনীর পক্ষে এই ধরনের বাংলা লেখা সম্ভবপর মনে হয় না। সম্ভবত ইনি বাঙালি মহিলা, কোনো বিদেশীকে বিবাহ করেছিলেন" (সত্যজিৎ-চৌধুরী, *আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ২১)।

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গ্রন্থটিকে অনেকে মৌলিক গ্রন্থ মানতে অস্বীকার করেছেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে গ্রন্থটি 'The Last Day of the Week' নামে একটি ইংরেজি আখ্যানের ছায়াবলম্বনে রচনা করা হয়েছে। এর চরিত্রগুলি শুধু বাঙালি। এতে যে কাহিনী বর্ণিত আছে তা খ্রিস্টান পরিবার সংক্রান্ত ঘটনা। তৎকালীন হিন্দু পরিবারের ঘটনা এখানে স্থান পায়নি, ফলে এই লেখিকা সম্বন্ধেও তেমন কৌতুহল দেখা যায়নি সেই সময়ে। গ্রন্থটি বেশ কিছু স্থানে বর্ণনা ও চরিত্রচিত্রণে লেখিকার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা উপন্যাস রচনার প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকলেও বেশ কিছু ত্রুটিতে গ্রন্থটি জর্জরিত। লেখিকা গ্রন্থটির চরিত্র ও ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন মাত্র। কাহিনির মধ্যে তাঁর কোন স্বক্রিয় অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। লেখিকা সমস্ত ঘটনার নির্লিপ্ত দ্রষ্টা মাত্র।

১৩.৫ উপন্যাস ও আধুনিক কাল

আলোচনার শুরুর দিকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপন্যাস একেবারে আধুনিক কালের সৃষ্টি। এতে থাকে একটি নিটোল গল্প। কিন্তু এই গল্প বা আখ্যান তো প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যেও ছিলো। সেই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে কেন উপন্যাসকে আধুনিক কালের সৃষ্টি বলব? পরবর্তী সাহিত্যিকদের হাতে তার প্রকৃত উদ্ভব ঘটেছিল, এ কথাই বা বলা যাবে কেমন করে? তাই সাহিত্য হিসেবে আধুনিক

কাল ও উপন্যাসের পারস্পরিক যোগ ও সেই সঙ্গে উপন্যাসের বৈশিষ্টখ্যগুলি বুঝে নিতে হবে। উপন্যাস এই সংরূপটির নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল।

প্রথমত, উপন্যাস হচ্ছে মানুষের গল্প এবং মানবিক অনুভূতির গল্প। সেইজন্য আধুনিক কাল ছাড়া উপন্যাসের উদ্ভব সম্ভব ছিল না। মধ্যযুগের সাহিত্যে দেবদেবীদেরই প্রাধান্য ছিল, সেখানে দেবতারাই সব, মানুষ নিমিত্ত মাত্র। মানুষের গল্পও যে মানুষকে শোনানো যায়, তার জীবনের সুখদুঃখের গল্প অর্তাৎ মানবিক অনুভূতির গল্পও যে মানুষকে আনন্দ দিতে পারে, একথা উপলব্ধি করা গেছে আধুনিক কালেই। মানুষের এই প্রাধান্য স্বীকৃত না হলে মানুষের গল্প মানুষকে শোনানো যায় না। আধুনিক কালে মানুষ স্বীকৃতি পেয়েছে বলেই উপন্যাসের উদ্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, উপন্যাস সাধারণ মানুষের গল্প। দেব-দেবী বা অসাধারণ মানুষের গল্পই পূর্বে মুগ্ধ করত। আধুনিককালে গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে, সাধারণ মানুষের মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে, তাই সেই সাধারণ মানুষের গল্পই উপন্যাসে শুনতে পাঠক আগ্রহী। গণতন্ত্রের বিকাশ উপন্যাসের উদ্ভবের আর একটি কারণ। তৃতীয়ত, উপন্যাসের প্রধান গুণ বাস্তবতাবোধ। প্রাচীন ও মধ্যযুগে যেসব কাহিনি রচিত হত সেখানে বাস্তবতার কোনো ছোঁয়া থাকত না। তা বিশ্বাসযোগ্য কী বিশ্বাসযোগ্য নয় এ বিষয়ে কারও কোনো চিন্তা ছিল না। দেবদেবী যত অলৌকিক এবং অবিশ্বাস্য ক্ষমতা দেখাবেন তত তাঁদের প্রতি ভক্তি বাড়বে। কিন্তু আজকের মানুষ সেভাবে চিন্তা করে না। কাহিনি বাস্তবসম্মত না হলে আধুনিক পাঠক সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। তাছাড়া সাধারণ মানুষের সাধারণ সুখদুঃখের গল্পে অলৌকিক ঘটনাতো ঘটেও না। কাজেই উপন্যাস বেঁচে থাকে তার বাস্তবতার গুণে। অনেকে এটাকেই উপন্যাসের সবচেয়ে বড়ো গুণ বলে মনে করেন।

চতুর্থত, মানুষ তার অভিজ্ঞতা এবং মানসিকতা নিয়ে এই পৃথিবীটাকে দেখেছে এবং দেখতে দেখতে তার একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিও তৈরি করেছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিটা খুব জরুরি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের দেব নির্ভর আখ্যানে লেখকের বর্ণনায় তাঁর জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ধারণাটা কীরকম সেটা খুব একটা বোঝা যায় না। কিন্তু এই আধুনিক কালের একটা উপন্যাস পড়ার সময় পাঠক লেখকের জীবন উপলব্ধীকৃত দৃষ্টিভঙ্গীকে পড়তে চান। বলাবাহুল্য পাঠক সেটা পেয়ে থাকেন।

পঞ্চমত, আধুনিক কালে মুদ্রণযন্ত্রের ব্যাপক প্রসার উপন্যাস রচনার পথকে প্রসারিত করেছে। মধ্যযুগীয় শ্রুত সাহিত্য মুক্তি পেল পাঠ্য সাহিত্যে। শ্রুত সাহিত্যের অনেক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে লেখক খুঁজে পেলেন পাঠককে। যে কাহিনি মানুষকে ডেকে শোনাতে হত সেখানে লেখকের স্বাধীনতা থাকে অল্প। কিন্তু যখন সাহিত্য পাঠ্য হয়ে গেল, তখন আর গিয়ে শোনাতে হয় না, পাঠক নিজে পড়ে নিতে পারে। আধুনিক কালে এই রকম অবস্থা এসে গেল যে উপন্যাস লেখকের লেখার স্বাধীনতা ও পাঠক স্বাধীনতা কোন অভাব থাকল না।

১৩.৬ বাংলা উপন্যাসের বিকাশ

কথ্যভাষায় রচিত ও স্বাধীন কল্পনা বিশিটে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হল প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৬)। গদ্যে লিখিত সাহিত্যে একান্তভাবে লৌকিক ভাষা ব্যবহার করেও যে সাহিত্যরস সৃষ্টি করা যায় তা প্যারীচাঁদ মিত্রই প্রথম প্রমাণ করেন। সমকালীন নব্যশিক্ষিত বঙ্গজীবনের বিকৃতি-বিভ্রান্তিকে বিষয় করে প্যারীচাঁদের এই কাহিনি নির্মাণ। তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' লেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের ঘরোয়া জীবনযাত্রার সঙ্গে বিদেশীদের পরিচয় করিয়া দেওয়া। বলাবাহুল্য এই কাজে তিনি অনেকটাই সফল। 'আলালের ঘরের দুলাল' যেহেতু প্রথম কল্পনা বিশিষ্ট রচনা তাই রচনাটিকে অনেকে উপন্যাসও বলতে চান। হালকা চালের কলকাতার কক্‌নি বুলি যেমন এতে আছে, তেমনই আছে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ। এ ভাষায় 'আলালী ভাষা' নামে চিহ্নিত। দূরবিস্তারী প্রভাব সঞ্চারক আদর্শ ভাষা সৃজন না করলেও আদর্শ বাংলা উপন্যাসের সর্বপ্রথম সন্ধান দেন প্যারীচাঁদ মিত্র। কিন্তু সমালোচকদের মতে 'আলালের ঘরের দুলাল' 'উপন্যাসের মত' হলেও উপন্যাস নয়। সুকুমার সেনের মতে—"যদিচ কাহিনির ধারাবাহিকতা উপন্যাসের মতই তবুও কয়েকটি কারণে বইটিকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলা চলে না। প্রথমত প্লট খাপছাড়া রকমের। দ্বিতীয়ত মূল কাহিনি প্রায়ই অবান্তর ঘটনায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয়ত অধিকাংশ ভূমিকাই অপরিণত, অস্ফুট অথবা ক্ষণদৃশ্য। চতুর্থত নারী ভূমিকাগুলি অত্যন্ত অবহেলিত। পঞ্চমত সাধারণ উপন্যাসে অপেক্ষিত প্রণয়রস একেবারেই নাই" (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড)।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২) ব্যাঙ্গাত্মক আখ্যান রচনার নতুন আঙ্গিকসৃষ্টি, সমাজচেতনা, হাস্যরস সৃষ্টি, সংস্কারমুক্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিষয় বর্ণনা ও চরিত্রচিত্রণে বাস্তবতা ও সরস্তার অপূর্ব সমন্বয়ে বাংলা সাহিত্য এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে 'নকশা' কথাটি ব্যবহার করে হুতোম প্রথমেই সচেতনভাবে বাংলা সাহিত্যে একে এক নতুন আঙ্গিক হিসেবে সূচিত করে প্রথম প্রবর্তনের কৃতিত্ব স্থাপন করলেন। কলকাতার লোকসাধারণের প্রচলিত কথ্যভাষা বা চলিত বুলিতে অপরিমার্জিতভাবে সাহিত্যে ব্যবহারের অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বাংলা সাহিত্যে আজও অক্ষম অনুকরণের প্রলোভন সৃষ্টিকারী অতুলনীয় এবং একক নিদর্শন হয়ে আছে। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র বিষয় সমসাময়িক কলকাতার নব্য মধ্যবিত্তের জীবনধারা। রচনাটির উপন্যাস গুণ সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, বাংলা উপন্যাসের জন্মসূত্র সময় ও উৎস সন্ধানে হুতোমের আবেশ-সঞ্চরক জীবনবর্ণনার স্বাদ পেয়ে এইটুকু বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, বহু বিরূপ নিন্দা ও অপ্রসন্নতা সত্ত্বেও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বাংলা সাহিত্যের একখানি অননুকরণীয় বিচিত্র গ্রন্থরূপে এখনও বেঁচে আছে।

ইতিহাস আশ্রিত বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। এতে দুটি গল্প সংকলিত হয়েছিল; 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। কান্টের

লেখা *'Romance of History-India'* নামক ঐতিহাসিক গল্প অবলম্বনে 'সফল স্বপ্ন' লিখিত হয়েছিল। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' পূর্বোক্ত ইংরেজি গ্রন্থ অনুসরণে লিখিত হলেও এতে ভূদেবের স্বাধীন কল্পনা বেশি। এটি যথার্থ ঔপন্যাসিক রোমান্স হয়ে উঠেছে।

যে প্রতিভাধর স্রষ্টা তাঁর জীবনের যাবতীয় দ্বন্দ্ব এবং জটিলতাকে সাহিত্যের নব্য আধারে ভরে দিয়ে 'উপন্যাস' নামক আধারটিকে বাংলা সাহিত্যে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেন তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—"দুর্গেশনন্দিনী বঙ্গ সমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্যাস বাংলাতে কেউ দেখে নাই।.....'আলালের ঘরে দুলাল' তাহার মধ্যে একটু নূতনভাব আনিয়াছিল। কিন্তু *দুর্গেশনন্দিনী*তে আমরা যাহা দেখিলাম তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই। দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল" (*শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*)। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সকে বিষয় করে উপন্যাসে লেখা শুরু করেন, তা 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে শুরু করে প্রবাহিত হয়েছে তাঁর শেষ উপন্যাস সীতারাম পর্যন্ত। বঙ্কিমচন্দ্রে অন্যান্য উপন্যাসগুলি হল—'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'রাধারানী', 'সীতারাম'। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিটি উপন্যাস বাংলা উপন্যাসের বিবর্তনের ইতিহাসে সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রায় সব উপন্যাসের মধ্যে যে নতুন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তা হল 'নারী ব্যক্তিত্বের নূতন উন্মোচনের' ইঙ্গিত।

যে যুক্তিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয় তার মর্মকথা হল সুগভীর জীবনবোধ ও কল্পনার বিশালতা দিয়ে কাহিনি রচনার কৃতিত্ব, আখ্যানে জীবন-সমস্যা বিশ্লেষণের সঙ্গে নিজস্ব জীবনবোধের অধ্যয়ন। তৎকালীন বাংলার শিক্ষিত হিন্দু-মধ্যবিত্তের আত্মজাগরণের কালে নতুন মানবজীবনবোধের সঙ্গে আবির্ভূত গভীরতম জীবন জিজ্ঞাসাকে সাহিত্যের আধারে ধারণ করার প্রতিভা প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের মূল্যায়ণ যথাযত— 'মৃণালিনীর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যগুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করাইলেন।.....বিষবৃক্ষের দ্বারাই বিবাহের বাহিরে নরনারীর প্রেম বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্বীকৃত হইল। উপন্যাসে বঙ্কিম নীতি-আদর্শের বীজও বুনিলেন। আইনের অনুমোদন পাইলেও যে বিধবাবিবাহ বাঙালি সংসারে আনিতে পারে না ইহাই বিষবৃক্ষের প্রতিপাদ্য" (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড) 'স্বর্ণলতা' (১৮৭২) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ। সরকারি স্বাস্থ্য কমিশনের অধীনে বসন্তের টীকা দেওয়ার কাজে তত্ত্বাবধায়ক রূপে তারকনাথ উত্তর বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরে ঘুরে কাজ করতেন। এই কাজের সুবাদে নতুন নতুন মানুষের সঙ্গ লাভের সুযোগ পেতেন এবং তাদের চরিত্রকে অনুশীলন করার সুযোগ পেতেন। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করার ফলেই তাঁর 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস বিচিত্র চরিত্রের নরনারীতে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সমাজ ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত নরনারীকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে লক্ষ করতে পারা এবং রচনার মধ্যে জীবন্ত প্রকাশ করতে পারা—এটাই উপন্যাস লেখার পথ, যেটা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় খুব যত্নের সঙ্গে ফুটিয়ে

তুলেচিলেন। ভবিষ্যৎ বাংলা উপন্যাসের দৃষ্টিকে যথার্থ লক্ষ নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলি হল—'সৌদামিনী', 'হরিষে বিষাদ', 'অদৃষ্ট', 'বিধিলিপি' ইত্যাদি।

রমেশচন্দ্র দত্ত বেশ কয়েকজন ঔপন্যাসিক এই সময় ঐতিহাসিক ধারার উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন। রমেশচন্দ্রের 'বঙ্গবিজেতা' 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' উপন্যাসে জাতিবিরোধ-লাঞ্ছিত মধ্যযুগের ভারতবর্ষকে খুঁজে পাওয়া যায়। উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনা ঘাত-প্রতিঘাতে প্রায় নিষ্প্রাণ। ঔপন্যাসিক যেন ইতিহাসের অবয়ব নির্মাণ করেছেন মাত্র কিন্তু তাতে প্রাণসঞ্চার করতে পারেননি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুকরণগামী ঔপন্যাসিকদের রচনায় ব্যক্তিচেতনা ও মানবপ্রত্যয় দ্বিধামুক্ত হবার সুযোগ পায়নি। উপন্যাসে এই আধুনিক ভাবনার প্রকাশ দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর সূচনায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে বঙ্কিম ধারার অবসান ঘটিয়ে নতুন পথের যাত্রা সূচিত করেন। সে পথে উপন্যাসের আখ্যান গৌণ, চরিত্র মুখ্য। 'চোখের বালি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তিনটি বিষয়ে নতুনত্ব আনলেন যথা দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও বর্ণনারীতির পুঙ্খানুপুঙ্খতা। পরবর্তী উপন্যাস 'গোরা' (১৯১০) মহাকাব্যিক প্রেক্ষাপটে লেখা বৃহৎ উপন্যাস। ব্যক্তিজীবনের নিরীক্ষণ ও কালের ভাবনা দ্বন্দ্বকে এই উপন্যাসে ধরতে চেয়েছেন লেখক। সুকুমার সেনের মতে, "গোরা রবীন্দ্রনাথের এবং বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কালের হাওয়ায় সমাজের মন যেভাবে ও যেদিকে ফিরিতেছে এবং ফিরিবে রবীন্দ্রনাথ তাহারই নির্দেশ দিয়াছেন।"

পরাধীন ভারতবর্ষের সমাজ-রাজনৈতিক সংকট এবং সংকট থেকে মুক্তির পথসন্ধান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত বিশ্বাসই ব্যক্ত হয়েছে 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) এবং 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাস দুটিতে। 'যোগাযোগ' (১৯২৯) উপন্যাসটি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবে শিক্ষিত ও রুচিশীলা নারীর পীড়ন ও আত্মসমর্পণের আখ্যান। 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) উপন্যাসেও দৈনন্দিন বিবাহিত জীবনের কর্তব্যপীড়িত গতানুগতিকতা এবং অপার্থিব রোমান্টিক প্রেমের স্বপ্নাভিসার। 'দুইবোন' (১৯৩৩), 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) নারী-পুরুষের জৈব আকাঙ্ক্ষার স্থূল দ্বন্দ্বকে ভিত্তি করে রচিত আখ্যান। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি ধরে বলা যায় যে— "বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসের অগ্রগতি যখন রুদ্ধপ্রায় হইয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথই তাহার জন্য নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা যাহা স্পর্শ করিয়াছে তাহাই দ্যুতিমান হইয়া উঠিয়াছে এবং উপন্যাসের উপর তাঁহার প্রভাবের যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা মুছিবার নহে। আধুনিক বঙ্গ-উপন্যাস তাঁহার প্রদর্শিত পথেই চলিয়াছে।"

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অধিকাংশ রচনা বাঙালির যৌবন অপচয় ও জাতি-আত্মার অবক্ষয়ের দিনে রচিত। তাঁর সৃষ্টির চূড়ান্ত সিদ্ধির যুগটাই ছিল অস্থির। এই অস্থির সময়ের অন্তরঙ্গ ও যথার্থ ভাবছবি

উপন্যাসের আঙ্গিকে তুলে ধরেন শরৎচন্দ্র। ব্যক্তিমানুষ ও তার জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ ও প্রকাশ কীভাবে সামাজিক পাকচক্রের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে না বা মুক্তি পাচ্ছে না— তা শরৎচন্দ্র প্রথম বাংলা কথাসাহিত্যে তুলে ধরেন। 'বড়দিদি' (১৯১৩) থেকে 'শেষের পরিচয়' (১৯৩৯) এই পঁচিশ বছরে শরৎচন্দ্র তেইশটি উপন্যাস লেখেন। সেগুলির মধ্যে কয়েকযি হল 'বিরাজ বৌ', 'পল্লীসমাজ', 'শ্রীকান্ত', 'দেবদাস', 'গৃহদাহ', 'শেষপ্রশ্ন' ইত্যাদি।

একান্নবর্তী পরিবারের কাহিনি শরৎচন্দ্রের বেশিরভাগ কাহিনির মূল বিষয়। যৌথ পরিবারের স্বার্থসংঘাতে কীভাবে ভাঙনের মুখে পৌঁছায়, আদর্শবান আত্মত্যাগী চরিত্ররা কিভাবে সেই ভাঙন রোধ করতে নিজেকে বঞ্চিত করে, সেই কথাই তিনি নানাভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনি যুগসন্ধির বাঙালি জীবনের ভাবসঙ্কটের শিল্পী। বিংশ শতাব্দীর দুই ও তিনের দশকে বাংলাদেশে, বিশেষত কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত জনমানসে সংস্কারমুক্ত আধুনিকতার চেতনা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ অভিঘাতেই এসব ঘটছিল। বিশ্বব্যাপ্ত পরিবর্তনের প্রবাহের গতিতে বাঙালির পারিবারিক জীবনেও পরিবর্তিত হয়। ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হবার পর অর্থনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী মধ্যবিত্ত সমাজ ফুলে ফেঁপে ওঠে নগরকেন্দ্রে অধিকার করেছিল, তাই নতুন যুগের ক্ষয়, হতাশা ও বিভ্রান্তির প্রকটতা তাদের মধ্যেই বেশি প্রভাব ফেলে। সেই সময় বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনে ভোগের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, অথচ অন্ধ জৈবিক শক্তির তাড়নায় ভোগের বাসনা প্রবলতর হচ্ছিল। এ এক আশ্চর্য কাল। একদিকে হতাশা, অবিশ্বাস ও অনিশ্চয়তা বাঙালি যুবচিত্তকে ক্রমশ ঘিরে ধরছিল। এই যুগ ও যুগের তরুণতম লেখকগোষ্ঠী মুখ্যত 'কল্লোল' (১৯২৩), 'কালিকলম' (১৯২৬) ও 'প্রগতি' (১৯২৭) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-শরৎ অতিক্রমী যুগ পরিবর্তনের সঙ্কল্প করেছিলেন।

'কল্লোল' গোষ্ঠীর প্রধান তিনজন কথাকার ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে', বুদ্ধদেব বসুর 'সাড়া', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'আগামীকাল' উপন্যাসগুলি কল্লোলের যুগলক্ষণকে খুব স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছিল। এছাড়া শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রবোধকুমার সান্যাল সমান তালে বাস্তববাদী জীবন অধ্যায়কে এক বিচিত্র কল্পকথায় মূর্ত করে তুলেছিলেন। শৈলজানন্দের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন কয়লাখনি অঞ্চলে। প্রবোধকুমার বলশেভিক বিপ্লব থেকে নতুন চিন্তাসূত্র আহরণ করে নতুনত্ব আমদানি করেন বাংলা উপন্যাসে।

কল্লোল সমসাময়িক ও পরবর্তী সর্বাধিক খ্যাতিবান উপন্যাসকাররা হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও মহৎ উপন্যাস স্রষ্টা হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন জগদীশ গুপ্ত, সতীনাথ ভাদুড়ী, মনোজ বসু, বনফুল, জরাসন্ধ প্রভৃতি।

ঐতিহাসিক জ্ঞান এবং পরিশুদ্ধ সমাজ-চেতনার সাহায্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাস জগতে এক নতুন যুগের সন্ধান দেন। তাঁর উপন্যাসের পটভূমিকায় দেখা যায় এক বিরাট বিস্তৃত জীবনের আভাস। প্রায় বিনষ্ট সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম্য কৃষিপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনের ধারার প্রতিটি শ্রেণির

মর্মকথার রূপায়ণ ঘটেছে তারাশঙ্করের উপন্যাসগুলিতে। তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণী' (১৯২৯) থেকে পরবর্তী চল্লিশ বছরের লেখা বেশিরভাগ উপন্যাসেই লেখকের তীক্ষ্ণ সমাজনিরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯) উপন্যাসে শিবনাথের আত্মজিজ্ঞাসা, গান্ধীবাদী আন্দোলনে তৎকালীন বাংলাদেশের গ্রামে বিত্তশালী পরিবারের শিক্ষিত যুবকের দেশভাবনার ভাবাতিশয্যকে চিনিয়ে দেয়। 'কালিন্দী' (১৯৪০) উপন্যাসে গ্রাম্য সামন্ততন্ত্রের অন্তর্বিরোধের সঙ্গে গ্রাম ঘনিষ্ঠ মফস্বলগুলিতে লগ্নীপুঁজির বিস্তার লক্ষ করা যায়। গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ঘটনা অর্থাৎ গ্রামজীবনের ভাঙনের এক প্রবল গভীরতায় ও নৈপুণ্যে বছরের পর বছর ধরে যত্নে অধ্যাবসায়ে রূপ দিয়েছিলেন তারাশঙ্কর তাঁর 'গণদেবতা', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'কবি', 'আরোগ্য নিকেতন' ইত্যাদি উপন্যাসগুলিতে।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণকে 'রোমান্স-প্রবণ' ঔপন্যাসিকরূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' দুই খণ্ড বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ রচনা। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'-র মধ্যে লেখক উপন্যাসের বাঁধা পথ অবলম্বন করেননি। একটি বালকচিত্ত কীভাবে রূপকথার রূপলোক বিচরণ করতে করতে অগ্রসর হল, জীবনের নানা ক্ষয়ক্ষতির মধ্যেও হারিয়ে গেল না, তারপর তাঁর পুত্রের মধ্যেও সেই জীবন প্রতীতি বয়ে চলল-সেই কথাটাই বিভূতিভূষণ অসাধারণ শিল্পরূপের দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন। 'আরণ্যক' (১৯৩৯) উপন্যাসে বিহারের বহমান ভূমি ব্যবস্থার একমুখি শোষণের পাশাপাশি অপার বন্য প্রকৃতির লাবণ্য পাঠককে সমৃদ্ধ ও মুগ্ধ করে।

বিভূতিভূষণের অন্যান্য রচনাগুলি হল 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'বিপিনের সংসার', 'দেবযান', 'অশনিসঙ্কেত', 'ইছামতী' প্রভৃতি। বিভূতিভূষণ যেন বাংলার সজীব গ্রামের চিরকালের পাঁচালিকার।

বাংলাদেশের বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তর-মার্কসবাদের প্রভাবে যখন মানুষের জীবন-যাপন প্রণালীকে অর্থনৈতিক সম্পন্নতার স্তরগত বিভাজনে চিহ্নিত করার রাজনৈতিক বোধ তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠেছিল, তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখায় সেই নতুন তাত্ত্বিক কাঠামোকে ফলিত রূপায়ণে ব্রতী হলেন। ১৯২৮ থেকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একচল্লিশটি উপন্যাস রচনা করেন। 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫) মানিকের প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসে নৈরাশ্যবাদের সঙ্গে আত্মহননের ও আত্মখননের যুগ্ম-প্রবণতা ফুটে উঠেছে। 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বস্তুত এই উপন্যাসটি বাংলা ভাষায় নদীমাতৃক ও লোকজীবনকেন্দ্রিক আখ্যানের পথিকৃৎ। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) চিরকালের বাংলা উপন্যাসের ধারায় অক্ষয় একটি নাম। 'অহিংসা' (১৯৪০) উপন্যাসে সদানন্দ নামক এক কামনা বাসনাময় সাধু ও তার ভক্তদের মধ্যে সম্পর্কের প্রতারণা চিত্রিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য উপন্যাসগুলি হল 'জীবনের জটিলতা', 'অমৃতস্য পুত্র', 'শহরতলী', 'চতুষ্কোণ', 'মাঝির ছেলে', 'শহরবাসের ইতিকথা', 'চিহ্ন', 'হলুদ নদী সবুজ বন' ইত্যাদি।

এছাড়া বাস্তব জীবনের সংযমী রূপকে উপন্যাসে বেঁধেছেন এই সময়ের বেশ কিছু কথাকার তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সরোজকুমার রায়চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, সতীনাথ ভাদুড়ী প্রমুখ।

১৩.৭ সারাংশ

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে, বিশেষ করে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ায় উপন্যাস রচনায় প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনায় উপন্যাসের লক্ষণ স্পষ্ট নয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক।

১৩.৮ অনুশীলনী

১। 'আলালের ঘরের দুলাল'কে সার্থক উপন্যাস বলা যায় কিনা বিস্তারিত লিখুন।

২। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে নক্‌শাজাতীয় রচনাগুলির পরিচয় দিন।

৩। বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বলা যায় কিনা বিচার করুন।

১৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। *কালের প্রতিমা*—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

৩। *বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা*—গোপাল হালদার

একক ১৪ ❑ প্রাক্-উপন্যাস পর্বের নক্শাধর্মী রচনা : ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ

গঠন

১৪.১ উদ্দেশ্য

১৪.২ প্রস্তাবনা

১৪.৩ আলোচনা

১৪.৪ সারাংশ

১৪.৫ অনুশীলনী

১৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য প্রাক্‌বঙ্কিম উপন্যাসধর্মী রচনা ও কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের রচনা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান।

১৪.২ প্রস্তাবনা

সার্থক বাংলা উপন্যাসে প্রথম শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তার আগেও কিছু কিছু রচনা পাওয়া যায়। উপন্যাস রচনার আলোচনায় তাঁদের নাম স্মরণযোগ্য। কিছু নকশা জাতীয় রচনা বা সমাজচিত্র জাতীয় রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের আলোচনা এই এককে করা হবে।

১৪.৩ আলোচনা

বাংলা গদ্যের জন্মলগ্নে একদিকে রাজনারায়ণ বসু ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সুগভীর চিন্তায়, সুদৃঢ় প্রকাশভঙ্গীতে, সংহত ভাষায় এবং যুক্তির অসংশয়িত স্বচ্ছতায় বাংলা গদ্য দৃঢ়তা লাভ করেছিল। অপরদিকে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনায় বাংলা গদ্যে স্থান পেয়েছিল সমকাল-সচেতনতা, বাস্তব জীবনবোধ। বাংলা গদ্যের চলার পথ হয়ে উঠেছিল সরস, প্রাণোজ্জ্বল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীচরণকে ‘বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম প্রবর্তক’ বলে অভিহিত করেছিলেন। ব্যঙ্গাত্মক নকসাজাতীয় রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্যে সাহিত্যরসের সঞ্চার ঘটেছিল। যদিও বাংলা

রঙ্গব্যঙ্গমূলক নকশা সম্পর্কে সুকুমার সেনের অভিমত, "এইসব রচনার সাহিত্যিক মূল্য প্রায় নাস্তি। সর্বত্র সুরুচির পরিচয়ও নাই। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রহসনের অগ্রদূত বলিয়াই এগুলির নাম করিতে হয়।" (ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*, পৃষ্ঠা. ৩২২) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যের ইতিহাসে নকশাজাতীয় রচনার মূল্য এবং ভবানীচরণের রচনা সম্পর্কে বলেছেন, "নীরস শাস্ত্রীয় বিচার-বিতর্কের যুগে তিনি বাংলা ভাষায় যে লালিত্য ও রসসঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঠিক ইতিহাস লিখিত হইলে সে সংবাদ বাঙালির অগোচর থাকিত না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ সামাজিক চিত্র রচয়িতা হিসাবে তাঁহার নাম সর্বাগ্রে করিতে হয়।" (ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*, পৃষ্ঠা. ৩২২)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রামমোহন রায় যখন আধুনিকতার বার্তা জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছিয়ে দিতে তৎপর, সেই সময় বাঙালি সমাজে যে বৃহৎ অংশ রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে প্রাচীন রীতিনীতি ও ধর্মবিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছিলেন, সেই প্রাচীনপন্থীদের মুখপাত্র ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম দিকে রামমোহন রায়ের প্রতি তাঁর যথেষ্ট সমর্থন ছিল। তাঁদের যৌথ উদ্যোগে 'সম্বাদ কৌমুদী'-র (১৮২১) পথ চলা শুরু হয়েছিল। কিন্তু খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের মতবিরোধ ঘটায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২) প্রকাশ করে রামমোহন রায়কে তীব্র সমালোচনার বাণে বিদ্ধ করেছিলেন।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৫)। এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন— "কলিকাতা মহানগরের স্থূল বৃত্তান্ত বিবরণ করিয়া কলিকাতা কমলালয় নামক গ্রন্থকরণে প্রবৃত্ত হইলাম।" কারণ 'পল্লিগ্রাম নিবাসী ও অন্যান্য নগরবাসী লোক-সকল এই কলিকাতায় আসিয়া এখানকার আচার-বিচার, রীতি ও বাককৌশলাদি অবগত হইতে আশু অসমর্থ হন," (ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*, দ্বিতীয় পর্যায়, পৃষ্ঠা. ৩২৩) তাদের জ্ঞাতার্থে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থে লেখকের সমকাল দর্শনের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যক্ত হয়েছে, সেই সঙ্গে পরিহাসপূর্ণ wit-এর দীপ্তিও চোখে পড়ার মতো। সরস ভঙ্গীতে কলকাতার এক বিশেষ 'বাবু' শ্রেণিকে তির্যক ব্যঙ্গরসে বিদ্ধ করেছেন।

লেখকের দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ 'নববাবু বিলাস' ((১৮২৫), যদিও এটিই ভবানীচরণের প্রথম রচনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ বাংলার জীবনে এক কালপরিবর্তনের সময়। এই সময় একদল যুবক হিন্দু কলেজের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নতুন যুগকে স্বাগত জানিয়েছিল, দীর্ঘদিনের লালিত সংস্কার ছেড়ে নানা সমাজ-সংস্কারমূলক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যেও নতুনকে নিয়ে এসেছিল। আর একদল মনে পুরনো চিন্তা-ভাবনাকে লালন করে শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে আধুনিকতাকে গ্রহণ করে হয়ে উঠেছিল 'হঠাৎ বাবু'। আধুনিকতার নামে অনুকরণ সর্বস্বতা, ভ্রষ্টাচার এবং চারিত্রিক অধঃপাতকে

তারা গ্রহণ করেছিল। তারাই ছিল সমাজের মাতা। তারা মদ্যপান, গোমাংস ভক্ষণ, একাধিক রক্ষিতা রাখার মত কাজগুলি করে নিজেদের অর্থপ্রদর্শন এবং আত্মতৃপ্তি বোধ করত। 'নববাবু বিলাস'-এ এই অজ্ঞানান্ধ অর্থ-মদমত্ত হঠাৎ বাবুদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের নৈতিক গ্লানিকে চিত্রিত করেছেন। এই গ্রন্থ রচনার সময় তিনি 'প্রমথনাথ শর্মা' ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন।

ভবানীচরণের আরও দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'দূতীবিলাস' (১৮২৫) এবং 'নববিবিবিলাস' (১৮৩১)। গ্রন্থদুটিতেও লেখক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্ষুরধার লেখনশৈলীর মাধ্যমে সমাজের নৈতিক অধঃপতনকে সরসভঙ্গীতে উপস্থাপন করেছিলেন। প্রথমটি পদ্য ছন্দে রচিত, দ্বিতীয়টি গদ্যে। 'নববিবিবিলাস' গ্রন্থটি 'নববাবুবিলাস'-এর পরিপূরক। গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন, "যদ্যপি নববাবুবিলাসে নববাবুদিগের স্বভাব সুপ্রকাশ আছে, কিন্তু সে গ্রন্থের ফলখণ্ডে লিখিত ফলের প্রধান মূল বাবুদিগের বিবি। এ নিমিত্ত তৎপ্রকাশে প্রয়াস পূর্ব্বক নববিবিবিলাস নামক এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।" এই গ্রন্থ রচনার সময় তিনি 'ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে 'শ্রীগয়া তীর্থ বিস্তার' (১৮৩১) এবং 'আশ্চর্য উপাখ্যান' (১৮৩৫) বেশ উল্লেখযোগ্য।

প্যারীচাঁদ মিত্র

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) নবীন উপন্যাসের পথপ্রদর্শক। তিনি দৈনন্দিন জীবনানুসারী গদ্যরীতির প্রথম প্রবর্তয়িতা এবং প্রথম বাংলা উপন্যাস লেখক। বেতাল-পঞ্চবিংশতি, তুতিনামা, আরব্য উপন্যাসের বাইরেও যে গল্পরস থাকতে পারে এবং সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাও যে উপন্যাসের ভাষা হতে পারে, তা প্যারীচাঁদ মিত্র প্রথম দেখালেন 'আলালের ঘরে দুলাল' (১৮৫৮) রচনা করে।

১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্ম হয়েছিল। তাঁর পিতার নাম রামনারায়ণ মিত্র। হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র এবং 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের অন্যতম নেতা ছিলেন তিনি। সাহিত্যক্ষেত্র ছাড়াও সংস্কৃতি, কৃষিবিদ্যা, আধ্যাত্মবিদ্যাতে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। 'প্রেততত্ত্ব' ও 'থিয়োজফি'-তে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি একই সঙ্গে ছিলেন শিক্ষাব্রতী, সমাজসংস্কারক, ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় এবং কৃষিবিদ্যার প্রবর্তক। ইংরেজি ও বাংলায় লিখিত বহু প্রবন্ধ তাঁর বিস্তৃত জ্ঞানচর্চার সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর বাংলা রচিত প্রধান কিছু প্রবন্ধ-গ্রন্থ ও গদ্যরচনা হল—'আলালের ঘরে দুলাল' (১৮৫৮), 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০), 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১), 'যৎকিঞ্চিত' (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০), 'বামাতোষিণী' (১৮৮১)। এছাড়াও তিনি ব্রহ্ম-বিষয়ক গানের সমষ্টি 'গীতাঙ্কুর' রচনা করেছিলেন। 'কৃষিপাঠ'-এর প্রবন্ধগুলিতে প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলার কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 'রামারঞ্জিকা' স্ত্রীশিক্ষামূলক। রাধানাথ সিকদারের সহযোগিতায় তিনি 'মাসিক পত্রিকা' (প্রথম প্রকাশ ১৮৫৪) নামে একটি ক্ষুদ্রকায় সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণকে, বিশেষ করে মেয়েদেরকে শিক্ষাচ্ছলে সাহিত্যরসের যোগান

দেওয়া। তাই প্রবন্ধগুলি ছিল সহজ, চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ এবং ভাষার ক্ষেত্রে কথ্যরীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। পত্রিকাটির আদর্শ ছিল, "এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক।" (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৪) 'রামারঞ্জিকা'-র প্রবন্ধগুলি এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। তাই রচনাকাল হিসেবে এটিই প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রথম গ্রন্থ। 'যৎকিঞ্চিত' ঈশ্বর-উপনিষদাদি বিষয়ক আলোচনামূলক গ্রন্থ। 'অভেদী', 'আধ্যাত্মিকা', 'বামাতোষিণী' ইত্যাদি কথোপকথন ও গল্পমূলক, নীতিবিষয়ক রচনা। তাঁর অধিকাংশ রচনাই উদ্দেশ্য প্রণোদিত-সামাজিক কল্যাণবোধই তার উদ্দেশ্য। রচনাগুলিতে আখ্যানের কিছু ধর্ম বজায় থাকলেও সেগুলি মূলত স্কেচ (নকশা) ধরণের। কিন্তু প্রচারমূলক, আদর্শনিষ্ঠ ও নীতিশিক্ষামূলক হলেও সরসতা স্কেচধর্মী আখ্যানগুলিতে সাহিত্যগুণ যুক্ত করেছে। ব্যাঙ্গাত্মক দুটি রচনা—'আলালের ঘরে দুলাল' ও 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়'-তে লেখক সমকালীন সমাজকে ব্যঙ্গের বাণে বিদ্ধ করেছেন। এখানে তিনি স্রষ্টা নন, দ্রষ্টা। এই দুটি রচনায় তিনি সামাজিক ও চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

'আলালের ঘরে দুলাল' প্যারীচাঁদ মিত্রের সর্বাপেক্ষা সার্থক রচনা। 'টেকচাঁদ ঠাকুর'-এই ছদ্মনামের আড়ালে তিনি সমাজের মুখোশ খুলে প্রকৃত রূপ উন্মোচন করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের কলকাতা ও শহরতলীর সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচার বর্ণনায় তিনি সরস কৌতুকরসের ব্যবহার করেছেন। কাহিনীর ধারাবাহিকতা উপন্যাসের মতো হলেও কয়েকটি কারণে আখ্যানটিকে রীতিমত উপন্যাস বলা চলে না। উপন্যাসের প্রধান ছয়টি লক্ষণ হল—কাহিনী, চরিত্র, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, বাস্তবতা ও স্থানীয় পরিবেশ, সংলাপ এবং ঔপন্যাসিক জীবনদর্শন। এর মধ্যে কাহিনী গ্রন্থনে কিছুটা এবং বাস্তবতা ও স্থানীয় পরিবেশ বর্ণনায় লেখক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু চরিত্র সৃষ্টি বা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিক থেকে বিচার করলে এটিকে যথার্থ উপন্যাস বলা যায় না। সুকুমার সেনের ভাষায়— "আলালের ঘরে দুলালকে কতকটা ডিকেন্সের 'পিকউইক পেপার্স'-এর মতো চিত্রোপন্যাস বলা যাইতে পারে। এই ধরনের রচনার বৈশিষ্ট্য হইতেছে 'এপিসোড' বা অবান্তর আখ্যানগুলির মনোজ্ঞতা এবং ভূমিকা-চিত্রগুলির বর্ণোজ্জ্বলতা। কাহিনীর নায়ক বলিতে মতিলাল, কেননা বইটি তাহারই জীবন-ইতিহাস। কিন্তু ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে প্রধানত ঠকচাচার দ্বারা। সেদিক থেকে দেখিলে ঠকচাচাই আসল নায়ক। তাহা হইলে বইটি 'পিকারেকস' নভেলের পর্যায়েই পড়ে।" (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড*, পৃষ্ঠা-১৬৪) কাহিনীর নায়ক মতিলালের জীবনের বিচিত্র বিন্যাসে কাহিনীর সমস্যা বিধৃত হয়ে রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত মতিলালের মনুষ্যত্ব উপলব্ধি কেমন করে ঘটল, সেটাই আখ্যানের মূল গল্প। এই গল্পের অন্তরালে যে বক্তব্য ক্রিয়াশীল তা হল মানুষের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হলে সুখ, শান্তি পাওয়া যায় না। চরিত্র নির্মাণে লেখক নীতিবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। ফলত চরিত্রগুলি হয় পুরোপুরি সৎ আর না হলে সম্পূর্ণ ঠক বা প্রবঞ্চক। তাদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক কোনো

ঘাত-প্রতিঘাত নেই। চরিত্রগুলির একমুখীনতা লেককের উদ্দেশ্য বা নীতি প্রচারে অনুকূল হলেও, উপন্যাসের আবহাওয়াকে কৃত্রিম করে তুলেছে। ঠকচাচা 'টাইপ চরিত্র' হলেও তার আচার-আচরণ ও সংলাপে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। সুকুমার সেন বলেছেন, "আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম অমর চরিত্র হইতেছে ঠকচাচা, পুরানো সাহিত্যের ভুবনে জনবিরল অমরাবতীতে ভাঁড়ুদত্তের পাশেই তাহার স্থান।" (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা. ১৬৪) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আখ্যানটিতে কিছু উপন্যাসলক্ষণ লক্ষ করেছেন। তাঁর ভাষায়, "কাহিনী, বাস্তবতা ও চরিত্র-উপন্যাসের মূল লক্ষণগুলি এতে সহজেই চোখে পড়বে। তাই মনে হয়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নকশা জাতীয় রচনাগুলির চেয়ে প্যারীচাঁদের রচনা অনেক পূর্ণাঙ্গ। তাঁর কোন কোন রচনায়, বিশেষতঃ 'আলালের ঘরে দুলালে' সর্বপ্রথম নকশার স্থলে উপন্যাসের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।" (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, পৃষ্ঠা. ৩২৪)

সংলাপের ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ মিত্র প্রথম মুখের ভাষাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিদ্যাসাগরীয় ভাষা সংস্কৃত ঘেঁষা হওয়ায় সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখগুলি সেই ভাষায় প্রাণ পায় না। তাই তিনি অপেক্ষাকৃত সরল ভাষায় কাহিনী নির্মাণ করেছিলেন, যার মূল লক্ষ্য অর্ধশিক্ষিত স্ত্রীসমাজ হলেও সমস্ত সাহিত্যরসিক, বাঙালি পাঠকসমাজের কাছে তা সমাদৃত হয়েছিল। সাধুভাষার চলতি শব্দ ও হালকা বাকরীতির অনুসরণে তিনি সাধারণ মানুষের জীবন ও প্রাণোচ্ছল আলাপচারিতাকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর এই বাক্‌রীতি 'আলালী ভাষা' নামেও পরিচিত। 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' নিতান্তই স্কেচধর্মী নিবন্ধধরনের অনুল্লেখ্য রচনা। এখানে প্যারীচাঁদের প্রধান গৌরব তাঁর সৃষ্টি 'আলালী ভাষা'।

তবে পরিশেষে বলা যায়, প্যারীচাঁদের সাহিত্য-কীর্তির সমালোচনা থাকলেও সরস কৌতুকের ভাষায় এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে যেভাবে তিনি বাস্তব জীবনকে চিত্রিত করেছেন, তা সবিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। মধুসূদন দত্তের কলমে পদ্য যেমন নতুন হয়ে উঠেছিল, তেমনই প্যারীচাঁদের কলমে গদ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। তাঁর সৃষ্টি 'আলালের গরে দুলাল'-এ বাংলা সাহিত্য প্রথম যে সব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল সেগুলি হল—

(ক) উপন্যাসোচিত একটি সমস্যার প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছিল এই রচনায়।

(খ) একটি বিস্তৃত দেশজ জীবনপট, প্রকৃতি এবং মানুষকে আখ্যানের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছিল।

(গ) ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত সর্বগ্রাহী মনের প্রথম পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এই রচনায়।

(ঘ) সর্বোপরি জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটা মানসদৃষ্টির সাক্ষাৎও পাওয়া গিয়েছিল এই রচনায়।

প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে, তাহার জন্য ইংরেজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা করিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে।" (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, পৃষ্ঠা৩২৬) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই প্যারীচাঁদ মিত্রের অবদান অনস্বীকার্য।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

প্যারীচাঁদ মিত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে 'আলালী ভাষা'-র প্রবর্তন করেছিলেন অর্থাৎ কথ্যভাষাকে লেখ্যরূপ দিয়েছিলেন, সেই চেষ্টা আরও পূর্ণতা লাভ করেছিল কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) হাতে। জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ধনবান ও সংস্কৃতিপোষক সিংহ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর পিতা ছিলেন নন্দলাল সিংহ এবং পিতামহ ছিলেন জয়কৃষ্ণ সিংহ, যিনি হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। শৈশব থেকেই অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। খুব কম বয়সে তিনি সমাজ-সংস্কৃতিমূলক নানা ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তরুণ বয়সে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা', 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা', 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উদারমনস্ক কালীপ্রসন্ন সিংহ গুণীর কদর করতে জানতেন। মধুসূদনের কবি-প্রতিভা প্রথম প্রকাশ্য অভিনন্দন লাভ করেছিল কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিনী সভায়। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করার জন্য রেভাঃ লঙ সাহেবকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল এবং হাজার টাকা জরিমানা হয়েছিল। কালীপ্রসন্ন নিজে অর্থব্যয় করে লঙ সাহেবকে কারামুক্ত করেছিলেন। সমাজ-সংস্কারমূলক কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করলে, তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। নিজে অর্থব্যয় করে বহু বিধবার তিনি বিবাহ দিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বহু দান-ধ্যান করেছিলেন তিনি, কেউ ভালো কোনো গ্রন্থ লিখলে তাঁকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করতেন, আমার কখনো বই ছাপানোর যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করতেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং ব্রাহ্মসমাজও তাঁর বদান্যতার অংশগ্রাহী হয়েছিল। এছাড়াও সামাজিক ও স্বাদেশিক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনাতেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রের পুনঃপ্রকাশ এবং 'পরিদর্শক' পত্রিকা পরিচালনা তাঁর দক্ষতার সাক্ষর বহন করেছিল।

কালীপ্রসন্ন সিংহের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নিদর্শন 'হুতোম পেঁচার নকশা'। গ্রন্থটির প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে। এই গ্রন্থে 'নকশা' শব্দটিকে সচেতনভাবে ব্যবহার করে লেখক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন আঙ্গিকের প্রবর্ত্তন করেছিলেন। 'হুতোম পেঁচা' ছদ্মনামে ধনীসমাজের কদাচারকে শাণিত ভাষায় ব্যঙ্গ করেছেন তিনি।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— "সে যুগের কলকাতার ধনী মধ্যবিত্ত ও সাধারণ সমাজ কি পরিমাণে হুজুগ-প্রিয় ছিল, হুল্লোড়ের ধুলোট উৎসবে কতটা মাখামাখি করত, উৎসব-অনুষ্ঠানে জঘন্য ব্যাপার কত অবলীলাক্রমে অনুষ্ঠিত হত, শিক্ষিত যুবক, ঘোর ব্রাহ্ম, নাসিকাধ্বনিকারী বৈষ্ণব বাবাজী, অলিন্দবিহারিণী স্থূলাঙ্গিনী বারবধূ, চড়ক, গাজন, দুর্গোৎসব, মাহেশের রথ, চকরে বাবু, মোসাহেব পরিবৃত মানুষের স্তুপ অর্থাৎ জমিদার, পথের ভিখারী, কেরানী, দোকানী, হাটুরে, পুরুতঠাকুর, মিশিদাঁতে রংদার জুতোপায়ে নবীন নাগর ইত্যাদি কলকাতার সংযাত্রার নানাবিধ রংদার ব্যাপার ছদ্মনামী হুতোম আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন।" (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, পৃ.৩২৯) ধর্মের ভন্ডামিকে তিনি কখনোই ক্ষমা করেননি, সে বৈষ্ণবই হোক বা ব্রাহ্মই হোক। রাজনীতি থেকে শুরু করে মূল্যবোধের অবক্ষয়, ধর্মের গোঁড়ামি কিংবা বিশেষ কোনো সম্প্রদায় বা ব্যক্তির চারিত্রিক ত্রুটি নিয়েও নকশা রচনা করেছিলেন তিনি। কেবল ব্যঙ্গ নয়, রঙ্গ-রসের যোগান দিয়েছেন কালীপ্রসন্ন তাঁর রচিত নকশাগুলিতে। রচনাটির প্রধান দুটি উদ্দেশ্য ছিল—(ক) কলকাতার উৎসব-সমাজ-সংসারের সরস ও বাস্তব বর্ণনা উপলক্ষ্যে কোন কোন ব্যক্তি ও পরিবারের প্রতি কটাক্ষ করা এবং (খ) সামাজিক দুর্বলতাগুলিকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। তাঁর জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' গ্রন্থে বলেছেন, "ইহা কেবল নকশা বলিয়াই তৎকালে আদৃত হয় নাই, অনেক ভণ্ড সামজদ্রোহীর পৃষ্ঠে ইহা যে তীব্র কশাঘাতপূর্বক তাঁহাদিগকে সৎপথে প্রবৃত্ত করিয়া সমাজ-সংস্কার সাধন করিয়াছিল, তজ্জন্যও ইহা কম প্রশংসা লাভ করে নাই।" কলকাতার সমাজ-জীবনের 'ফটোগ্রাফ' তুলে ধরে ছিলেন তিনি। বিশিষ্ট ব্যক্তি রাণাঘাটের জমিদার কৃষ্ণদাস পাল 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় হুতোম সম্পর্কে লিখেছিলেন, "'Hutum Pancha' marks an era in the history of fiction writing in Bengali. He has introduced a familiar and graphic style in drawing sketches from real life hither to unknown among Bengalee writers." হুতোমের নকশা পরবর্তীতে বাংলা প্রহসন রচনাকে প্রভাবিত করেছিল।

ভাষার বিচারে 'চলতি ভাষায়' আদ্যন্ত লেখা প্রথম বর্ণনামূলক গ্রন্থ 'হুতোম পেঁচার নকশা'। প্যারীচাঁদ মিত্র কথ্যভাষাকে সাহিত্যিক রূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ভাষা ছিল সাধু ও চলতি ভাষার মিশ্রণ এবং পরিশীলিত, মার্জিত। হুতোম এক্ষেত্রে খুব সচেতনভাবে সাধু ভাষা ও মুখের ভাষার সংমিশ্রণ করেননি। কলকাতার চলতি বুলিতে (Calcutta Cockney) নকশাগুলি প্রাণোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মুখের ভাষার বাস্তবতা এবং সাবলীলতা বজায় রাখার জন্য অশ্লীল-অমার্জিত (slang) শব্দ ব্যবহারেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। তিনি মুখের ভাষাকে—ভালো-মন্দ, শ্লীল-অশ্লীল, গ্রাম্য-নাগরিক শব্দকে অবিকৃতভাবে সাহিত্যে ব্যবহার করেছিলেন। হুতোম উপলব্ধি করেছিলেন, কলকাতার বদ-সহবত শোধরাতে গেলে এই ধরণের ঝাঁঝালো ভাষাই দরকার। এই ভাষা বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অনেক লেখকই এই ভাষা নকল করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হুতোমের সরস, কৌতুকতরল, শাণিত ব্যঙ্গের সজীবতা ও সাবলীলতার কাছে সেই সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। চিন্তাশীল গুরুতর বিষয়েও হুতোমের গম্ভীর অথচ সরস বর্ণনা

প্রশংসার দাবী রাখে। ক্লাসিকপন্থী বঙ্কিমচন্দ্র এই ভাষার সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, "হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দ নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে।" (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, পৃষ্ঠা. ৩৩১) এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য নয়। ভাষার ক্ষেত্রে হুতোম-প্যাঁচার-নকশার মূল্য অনস্বীকার্য। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়, "আলালী ভাষার উৎকট নমুনা হুতোমের নকশা। যাঁহার ইচ্ছা হয় পাঠ করিয়া দেখিবেন তাহা কেমন সরল, মিষ্টি ও হৃদয়গ্রাহী।"

নকশা রচনার জন্য তিনি অধিকতর পরিচিত হলেও নাটক ও প্রহসন রচনাতেও তাঁর সাহিত্য প্রতিভার উজ্জ্বল প্রতিফলন দেখা যায়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল 'বাবু নাটক' নামে প্রহসন এবং ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল দুইখানি নাটক—'বিক্রমোর্বশী এবং 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক'। প্রথম নাটকটি কালিদাসের মূলানুগ নাটক এবং দ্বিতীয়টি পুরাণ-কথাশ্রিত। পরে ভবভূতির 'মালতী মাধব' নাটকেরও অনুবাদ (১৮৭৯) করেছিলেন তিনি। এটি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশে প্রদত্ত বক্তৃতা, 'বঙ্গেশবিজয়ন' নামে অসমাপ্ত উপন্যাস, গীতার অনুবাদে তিনি সংস্কৃতঘেঁষা গুরুভার রচনারীতির ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড়ো গৌরব মূল মহাভারতের অনুবাদ ও প্রকাশ। বহু পণ্ডিতের সহায়তায় এবং বিদ্যাসাগরের সদুপদেশে তরুণ বয়সে তিনি মহাভারত অনুবাদের মতো দুঃসাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বিপুল অর্থব্যয় ও অসাধারণ কর্মদক্ষতার ফলে তিনি মহাভারতের বিশুদ্ধ গদ্য প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন। অষ্টাদশ পর্ব অনুবাদের শেষে অষ্টাদশ পর্ব অনুবাদের উপসংহার' প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন লিখেছিলেন— "১৭৮০ সনে সৎকীর্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া ৭ জন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই অষ্টবর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া বিশ্বপিতা জগদীশ্বরের কৃপায় অদ্য সেই চিরসংকল্পিত কঠোর ব্রতের উদযাপন স্বরূপ মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্ব্বের মূলানুবাদ সম্পূর্ণ করিলাম।" (ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*, পৃষ্ঠা.৩২৯) স্বল্পজীবনের পরিসরে তিনি সাহিত্য ও সমাজের নানা গঠনমূলক কাজে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। তাঁর অকাল-মৃত্যু বাংলা সাহিত্য ও সমাজের এক অপূরণীয় অভাব সৃষ্টি করেছিল।

১৪.৪ সারাংশ

বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ প্রসঙ্গে আলোচনায় লক্ষ করা গেল, বাংলা ভাষায় উপন্যাস রচনা মূলত ইউরোপীয় প্রভাবে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দরাম প্রভৃতির রচনায় উপন্যাসের লক্ষণ থাকলেও তাকে উপন্যাস বলা যায় না। কারণ উপন্যাস গদ্যে রচিত হয়। তাই ইউরোপীয়দের প্রভাবেই পাশ্চাত্য উপন্যাস বাংলায় দেখা গেল। বাংলায় গদ্যরীতির চর্চা শুরু হতেই গদ্যে আখ্যান বা গল্প রচনা

শুরু হয়। প্রথমদিকে বাংলা গদ্যের কাব্যরীতির প্রচলন হতে সময় লেগেছিল। তারপর রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে বাংলা গদ্যের একটা শিষ্টরূপ পাওয়া যায় এবং গদ্যে লেখালেখি শুরু হয়। এই সময়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দ প্রভৃতি ঔপন্যাসিকগণ বাংলা উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। আজ পর্যন্ত সেই ধারা প্রবহমান।

১৪.৫ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :

১। বাংলা উপন্যাসের বীজ 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ লুকিয়েছিল—মন্তব্যটি ব্যাখ্যা করুন।

২। প্রাক্ বঙ্কিম পর্বে বাংলা নকশাধর্মী রচনাগুলি উদ্ভবের কারণগুলি সূত্রাকারে উল্লেখ করুন।

৩। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের প্রথম নিপুণ শিল্পী—মন্তব্যটি আপনি সমর্থন করেন? আপনার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দিন।

৪। বাংলা উপন্যাস রচনার প্রাগভাস বলতে কী বোঝ? সবিস্তার ব্যাখ্যা করুন।

৫। বাংলা উপন্যাস রচনার জন্য বিদেশী প্রভাব কতখানি তা নিজের ভাষায় লিখুন।

৬। আধুনিক কাল বাংলা উপন্যাস রচনার ভিত্তিভূমি—যুক্তিসহ মন্তব্যটি বিচার করুন।

৭। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত বাঙালির চরিত্র ও সমাজ জীবকে কীভাবে ধারণ করেছে তা আলোচনা করুন।

৮। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বাংলা উপন্যাসে কল্লোলের মূল তিনজন লেখকের অবদান আলোচনা করুন।

৯। বাংলা উপন্যাসে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

১০। সংক্ষেপে বাংলা উপন্যাসের বিকাশের ধারাটি আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। উনিশ শতক ও বাংলা নকশার অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

২। প্যারীচাঁদ মিত্রের নক্সার ভাষা কেমন তা আলোচনা করুন।

৩। কল্লোল পত্রিকায় আধুনিকতা বিষয় সংক্ষেপে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

৪। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীপ্রকৃতির প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করুন।

৫। গ্রামজীবনের নব্য রূপান্তর তারাশঙ্কর কীভাবে তুলে ধরেছেন তা আলোচনা করুন।

৬। বিভূতিভূষণের নিসর্গপ্রীতি তাঁর উপন্যাসে কীভাবে ধরা পরেছে তা উল্লেখ করুন।

৭। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস মানব মনস্তত্ত্বকে নিষ্ঠাপূর্ণ ভাবে তুলে ধরেছেন তা নিজের ভাষায় লিখুন।

১৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। *কালের প্রতিমা*—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং

২। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

৩। *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা, দ্বিতীয় খণ্ড*—গোপাল হালদার, অরুণা প্রকাশ।

৪। *কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্য*—দেবকুমার বসু, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স।

৫। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

৬। *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা*—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি

৭। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (দ্বিতীয় খণ্ড)*—শ্রী ভূদেব চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং

৮। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড)*—সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স

৯। *আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্য*—সত্যজিৎ চৌধুরী, দি ঢাকা স্টুডেন্টস লাইব্রেরী

১০। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং

১১। *বাংলা উপন্যাস :* দ্বান্দ্বিক দর্পণ—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

একক ১৫ ❑ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সমকালীন ঔপন্যাসিকবৃন্দ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী

গঠন

১৫.১ উদ্দেশ্য

১৫.২ প্রস্তাবনা

১৫.৩ বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

১৫.৪ সমকালীন ঔপন্যাসিক বৃন্দের উপন্যাসকৃতি

১৫.৫ সারাংশ

১৫.৬ অনুশীলনী

১৫.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- বাংলা উপন্যাসের প্রথম পর্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বিষয়ে একটি পূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা প্রসঙ্গে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবেন।
- ঐতিহাসিক উপন্যাস ও রোমান্সধর্মী উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলি চিনে নিতে পারবেন।
- নারী উপন্যাসিক হিসেবে স্বর্ণকুমারী দেবীর অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

১৫.২ প্রস্তাবনা

উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ কলকাতা অভিমুখে জীবন বিস্তারে আগ্রহী হয়ে পড়ছিল। কেননা ইংরেজদের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে কলকাতা নগরীর সমৃদ্ধির সঙ্গে

তাল মিলিয়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এসে সেখানে বসবাস শুরু করে। গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিভিত্তিক সমাজ বেষ্টনী ছেড়ে নগরে বাঁচতে আসা এই নতুন মানুষদের সমাজতত্ত্বের পরিভাষায় বলে 'মধ্যবিত্ত'। এই নতুন যুগে নতুন পরিচয়ে ওই মানুষগুলোর সবার চাওয়া না-চাওয়া অথবা ভাবনা ব্যতিরেকে জন্ম নেয় নতুন গদ্য, 'উপন্যাস'।

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় বাংলা তথা ভারতীয় প্রথম উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'। ইতিহাসকে বঙ্কিমচন্দ্র তার উপন্যাসের আধার করলেও বাস্তবতা ও বাংলার তথা ভারতের ইতিহাস ইংরেজিবিদ্যার সংস্পর্শে এনে বঙ্কিমচন্দ্র আসলে দেখাতে চাইলেন বাঙালি উচ্চবিত্ত ধনী, জমিদার, ব্যবসায়ী, বড় বেতনের চাকুরিজীবীর রোমান্টিক ভাবুকতা কল্পকাহিনির ইতিহাস। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'স্বর্ণলতা' সহ অন্যান্য উপন্যাসের মাধ্যমে মানুষের বাস্তব মনের শাশ্বত মূল্যের ধারণা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

এই সময়ের উপন্যাসকারেরা উপন্যাসের বিষয় করে তুলেছিলেন ইতিহাসের সত্য, অর্থসত্য ও অতিরঞ্জিত ঘটনা। কেউ কেউ দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত গল্প, কেউ বা ইংরেজি আখ্যান বা সংস্কৃত কাহিনি। এই পর্বের অন্যতম ঔপন্যাসিক হলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার চেষ্টার প্রথম ফসল 'মাধবীকঙ্কন'। এই সময় পর্বের প্রথম নারী উপন্যাসিক স্বর্ণকুমারীদেবী। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'দীপনির্বাণ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। পুরুষপ্রধান সমাজে নারীর নিজস্ব ভাষা-চিন্তা ও সমাজ ভাবনার বিশিষ্ট্য রূপটি স্পষ্ট হয়ে না উঠলেও তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভাকে অস্বীকার করা যাবে না।

১৫.৩ বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের পথের দিশারী। রমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বলেছিলেন, 'the greatest man of nineteenth century'। বাঙালি মনকে মননের দ্বারা সুদৃঢ় করে, যুক্তির দ্বারা সংস্কারকে বিচার করে, প্রাচীন ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করে, স্বাদেশিক মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে তিনি নতুন মানবতার পথ নির্দেশ করেছিলেন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ এবং ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য তাঁর জীবনাদর্শে সমানভাবে স্থান পেয়েছিল। তাঁর সাহিত্যকর্ম এই জীবনাদর্শেরই প্রতিফলন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার প্রেরণা ছিল, প্রত্যক্ষভাবে স্বজাতি, স্বদেশ ও স্ব-সমাজ এবং পরোক্ষভাবে—মানুষের অদৃষ্ট ও মনুষ্যত্বের আদর্শ সন্ধান। সুগভীর জীবনবোধ ও কল্পনার বিশালতা এবং জীবন-সমস্যা বিশ্লেষণের সঙ্গে নিজস্ব জীবনবোধের মিশ্রণ তাঁর সাহিত্যে ব্যাপ্তি প্রদান করেছিল। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী লিখেছিলেন— "বঙ্কিমচন্দ্রই বস্তুত বাংলা উপন্যাসে বিষয় ও শিল্পরূপের সমন্বয়ধর্মী প্রকাশের দিক থেকে যথার্থ পথিকৃত।...উপন্যাসের শিল্পরূপ বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রকেই নির্মাণ করে নিতে হয়েছে। কাহিনি, চরিত্র, স্থান ও সময়ের পরিবেশ, ভাষা-সংলাপ—বিন্যাসের এই সব উপাদানকে যথাযথভাবে আশ্লিষ্ট করেই তাঁর উপন্যাসের 'আর্টফর্ম' রূপ পেয়েছিল। ইউরোপীয় মডেল তাঁর সামনে

ছিল ঠিকই, কিন্তু তাকে আত্মস্থ করে, প্রয়োজনীয় রূপান্তর ঘটিয়ে স্বকীয়তার উজ্জ্বল এক শিল্পসমৃদ্ধ আধার নির্মাণ করলেন তিনি।" (গোবিকানাথ রায়চৌধুরী, "শিল্পরীতির বিভিন্ন মাত্রা : বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস", 'পশ্চিমবঙ্গ' বঙ্কিম সংখ্যা, পৃষ্ঠা. ৮৮)

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস ইংরেজিতে লেখা 'Rajmohan's Wife'; এটি ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। 'Indian Field' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকায় এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসটির ভাষা ইংরেজি হলেও কাহিনী আধুনিক বাঙ্গালির পারিবারিক জীবন-ঘেষাঁ। এর পরের বছরই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস তথা বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক উপন্যাস—*দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫)। তাঁর রচিত উপন্যাস সংখ্যা চৌদ্দটি। সন-তারিখের ক্রম হিসেবে চৌদ্দটি উপন্যাস হল : *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫), *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *মৃণালিনী* (১৮৬৯), *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩), *ইন্দিরা* (১৯৭৩), *যুগলাঙ্গুরীয়* (১৮৭৪), *চন্দ্রশেখর* (১৮৭৫), *রজনী* (১৮৭৭), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮), *রাজসিংহ* (১৮৮২), *আনন্দমঠ* (১৮৮৪), *দেবী চৌধুরাণী* (১৮৮৪), *রাধারাণী* (১৮৮৬), *সীতারাম* (১৮৮৭)। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি এবং রোমান্স-রসের পরিমাণ অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে সুকুমার সেন তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। এক, রসপ্রধান ও বিশুদ্ধ রোমান্টিক। এই পর্যায়ে তিনি *দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী* ও *রাজসিংহ* উপন্যাসগুলিকে রেখেছিলেন। দুই, নীতিপ্রধান ও গার্হস্থ্য রোমান্স। এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত উপন্যাসগুলি হল *বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর* এবং *রজনী*। তিন, নীতিপ্রধান ও 'গীতোক্ত' আধ্যাত্ম-রোমান্স। এই পর্যায়ের তিনটি উপন্যাস হল *আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী* এবং *সীতারাম*। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসের নীতি-আদর্শ পারিবারিক, সামাজিক এবং তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসের নীতি-আদর্শ রাষ্ট্রীয় ও দেশাত্মবোধক। বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভাষাকেও তিনি নতুন প্রাণ দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস রচনা শুরু করেছিলেন তখন সাধুগদ্যের ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' সেই ভাষাতেই রচিত। পরে তাঁর উপন্যাসে সাধুভাষার বন্ধন কিছুটা শিথিল হয়েছিল। 'বিষবৃক্ষ'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব গদ্যরীতির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। এ রীতিও সাধুগদ্যের, তবে তা সহজ, নমনীয় এবং সর্বসমর্থ। যে ভাষা শুধু বর্ণনার, তথ্য ও তত্ত্বকথার ভারবহ ছিল, সেই ভাষা চিত্রণ ও মননের উপযোগী নমনীয়তা লাভ করেচিল বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে।

'দুর্গেশনন্দিনী'-র কাহিনীর সঙ্গে স্কটের 'Ivanhoe' এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এর কাহিনীর কিছু সাদৃশ্য থাকলেও এর রসবস্তু এবং নির্মিতিকৌশল বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব। এই উপন্যাসের মুখ্য বিষয় তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের প্রেমসর্বস্ব দাম্পত্যসম্পর্ক। এর পরবর্তী উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'। সুকুমার সেনের মতে, "কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের নভেলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কাব্যধর্মী। নায়িকার নাম ভবভূতির মালতীমাধব হইতে নেওয়া। তাহার চরিত্রচিত্রণে ভবভূতির (মালতীর), কালিদাসের (শকুন্তলার) ও শেক্সপীয়রের (মিরাণ্ডার) ছায়া আছে।" (সুকুমার সেন—বাঙ্গালা *সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড*, পৃ.১৮১)

এই উপন্যাসে রোমান্সের লক্ষণ প্রবল। কিন্তু তার অতিরিক্ত আছে চরিত্রের সমস্যা, মানব প্রকৃতির গূঢ় রহস্য, নিয়তিতাড়িত মানবভাগ্যের নিদারুণ পরিণাম। এর তিন বছর পরে প্রকাশিত উপন্যাস 'মৃণালিনী'-র প্রেক্ষাপটে ইতিহাস থাকলেও বাস্তব ইতিহাসের যোগ সামান্যই। প্রকৃত অর্থে এটি বাংলায় মুসলমান অভিযানের পটভূমিকায় রচিত কাল্পনিক কাহিনি। মৃণালিনীর প্রেরণা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "বক্তিয়ার খলজীর নেতৃত্বে সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয়ের অবিশ্বাস্য গল্প বাঙ্গালীর গৌরবও বলে আস্থাবান বঙ্কিমচন্দ্রকে বারবার পীড়া দিত। ইতিহাসের কলঙ্ক তিনি কল্পনার জল-সিঞ্চনে প্রক্ষালন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। পশুপতি চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া তিনি সেদিন লাঞ্ছিত বাঙ্গালীর পক্ষে লেখনী ধারণ করেন।" ('মৃণালিনী'-'ভূমিকা'; সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ) প্রেক্ষাপটে ইতিহাস থাকলেও হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর প্রেমকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। সেই সঙ্গে মনোরমা ও পশুপতির কাহিনিগ্রন্থনেও লেখক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ইতিহাসের অনুষঙ্গ থাকলেও অনৈতিহাসিক মানুষের কথা এবং তাদের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাত প্রাধান্য পেয়েছে। *দুর্গেশনন্দিনী*তে বাংলার পাঠান-মুঘল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কপালকুণ্ডলায় মুঘলশাসনে জাহাঙ্গীরের আমল পটভূমিকাস্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে।

'বিষবৃক্ষ' থেকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস-সাহিত্যে নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরেজিতে যাকে বলে রোমান্স। আমাদের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্ব-ই এদের মুখ্য উপকরণ। বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছাল আখ্যানে। যে পরিচয় নিয়ে সে এল, তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।" (ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*, পৃষ্ঠা. ৩৫০) উপন্যাসটি তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে (বৈশাখ ১২৭৯-ফাল্গুন ১২৮০) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে। উপন্যাসটিতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-উপলব্ধি নিবিড়ভাবে স্থান পেয়েছে। কুন্দনন্দিনী নাম বালবিধবার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নগেন্দ্রনাথ তার স্ত্রী সূর্যমুখীর প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েন এবং কুন্দনন্দিনীকে বিয়ে করেন। স্বামীর মনের ভাব বুঝতে পেরে অভিমানবশত সূর্যমুখী সংসার ত্যাগ করেন। পরে নগেন্দ্রনাথ নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলে সূর্যমুখী পুনরায় সংসারে ফিরে আসে এবং উভয়ের মিলন হয়। এই সামগ্রিক পরিস্থিতিতে কুন্দনন্দিনী নিজেকে অপরাধী মনে করে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। রূপজ লালসা, অসংযমী চরিত্র গৃহশান্তি ধ্বংসের প্রধান কারণ। তাই গ্রন্থ সমাপ্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।" বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে নীতি-আদর্শের বীজও বুনেছিলেন। তিনি বিধবা বিবাহ সমর্থন করতে পারেন নি। আসনের অনুমোদন থাকলেও বিধবা বিবাহ সেই সময় সমাজে ও পরিবারে যাতে বিষবৃক্ষ রোপন না করে, সেইজন্য উপন্যাসটি বিধবা বিবাহের প্রতি প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ।

'বিষবৃক্ষ' প্রকাশের বছরই প্রকাশিত হয়েছিল ইন্দিরা (১৮৭৩)। এটি প্রথমে 'বঙ্গদর্শন'-এ ১২৭৯ বঙ্গাব্দের চৈত্রসংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমে 'ইন্দিরা' আকারে ক্ষুদ্র হলেও পঞ্চম সংস্করণে এর আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছিল। উপস্থাপনরীতিতে উপন্যাসটি আত্মকথন জাতীয়-কথক স্বয়ং নায়িকা। কাহিনী সহজ, সরল, গার্হস্থ্য এবং সুখপাঠ্য। এক বিবাহিত বালিকা শ্বশুরবাড়ি যাবার পথে দস্যু বিড়ম্বিত হয়ে অনেকদিন পরে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির অধিকার ফিরে পায়। ইন্দিরার এই অন্বেষণ-অভিযান উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। 'ইন্দিরা' প্রকাশের পরের মাসে *বঙ্গদর্শনে* প্রকাশিত হয়েছিল 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১২৮০ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ সংখ্যা)। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে। এটি বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষুদ্রতম উপন্যাসিকা। সুকুমার সেন বলেছেন, "কাহিনী যেন দণ্ডীর 'দশকুমার-চরিত'-এর আখ্যানের মতো প্রাচীন ধরনের রূপকথা। বিষয় ছদ্ম-ঐতিহাসিক, কাল একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী। স্থান তাম্রলিপ্ত অঞ্চল। পাত্রপাত্রী ধনী সম্প্রদায়ের। ঘটনা বাল্যপ্রণয়ের মিলনপটে দুরপনেয় বাধা এবং এক দৈবশক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসীর আনুকূল্যে সেই বাধার অপসারণ।" (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৬)। 'যুগলাঙ্গুরীয়'-র পর 'বঙ্গদর্শন'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'চন্দ্রশেখর' (শ্রাবণ, ১২৮০ তেকে ভাদ্র, ১২৮২) এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে। মীরকাশিম ও ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত হলেও এর বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। নীতিবোধের দ্বারা চালিত হয়ে তিনি শৈবলিনী, প্রতাপ ও চন্দ্রশেখরের চরিত্রকে বিচার করেছেন। চিত্তসংযমে অসমর্থা শৈবলিনীর মানসিক যন্ত্রণা এবং আত্মসংযমের পরাকাষ্ঠা স্থাপন করেছে প্রতাপ আত্মাহূতির মধ্য দিয়ে। শৈবলিনী পরবর্তীতে চন্দ্রশেখরকে আশ্রয় করে অতীতকে বিস্মৃত হতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। নারী প্রণয় ও নারীর অন্তর্বিরোধকে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার সময় বঙ্কিমচন্দ্র কিছুটা নীতি ও সংযমের দ্বারা পরিচালিত হলেও তাঁর শিল্পীমানসও যথার্থরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। 'রজনী' ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (১২৮১-১২৮২ বঙ্গাব্দ) এবং পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৪ খ্রিস্টাব্দে। কথনশৈলীতে বঙ্কিম কলিন্সের 'এ ওম্যান ইন হোয়াইট' দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নায়ক-নায়িকার জবানিতে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই উপন্যাসের নামচরিত্র অথবা কেন্দ্রীয়চরিত্রের নির্মাণ সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন, "প্রথম লর্ড লিটন প্রণীত 'Last days of Pompeil' নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি 'কাণা ফুলওয়ালি' আছে; 'রজনী' তৎস্মরণে সূচিত হয়।...যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধ যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্মাণ করা গিয়েছে।" (*'রজনী'-সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ*-ভূমিকা) বিষয় মোটামুটি সরল প্রেমকাহিনি হলেও মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা বিন্যাসে তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখ্যের দাবী রাখে। 'রাধারাণী' উপন্যাসটি ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— "ইন্দিরা ও রাধারাণী—আকারে এ'দুটি কাহিনী উপন্যাসের পূর্ণতা ও লক্ষণ পায়নি—অনেকটা বড়ো গল্পের মতো। একে ইংরেজিতে novelette বলে অর্থাৎ ছোটমাপের নভেল।" (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ

ইতিবৃত্ত, পৃষ্ঠা. ৪৩০) একটি দুঃস্থ বালিকা তার রুগ্ন মায়ের পথ্য ব্যবস্থার জন্য মাহেশের রথে ফুলের মালা বিক্রি করতে এসে রুক্মিণীকুমার ছদ্মনামধারী এক যুবকের সাহায্য পেয়েছিল। পরে সেই বালিকা নিজের বৃহৎ পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হয়। তারপর ঘটনাচক্রে রুক্মিনীকুমারের প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে তার সঙ্গে পরিণয় আবদ্ধ হয়। উপন্যাসটি সম্পূর্ণ মেয়েলি রূপকথার ছাঁদে ঢালা এক সরস আখ্যান। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল পৌষ-ফাল্গুন, ১২৮২ থেকে বৈশাখ-মাঘ ১২৮৪ পর্যন্ত এবং পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিষবৃক্ষের সঙ্গে এর কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। পুরুষের অসংযমী চরিত্র, স্ত্রী ত্যাগ এবং অন্য নারীর প্রতি রূপজ ভোগাকাঙ্ক্ষার জন্য শোচনীয় পরিণাম-উপন্যাসটির প্রধান বিষয়। গোবিন্দলাল উভয়েই আত্মসংযম হারিয়ে রূপজ আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে উভয়ে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বল্প সময়ের মধ্যে সেই মোহ নষ্ট হয়ে গেলে রোহিনী অন্য পুরুষের প্রণয় আকাঙ্ক্ষা করে। ফলে অপমানিত ও অনুতপ্ত গোবিন্দলাল তাকে গুলি করে হত্যা করে। অন্যদিকে দীর্ঘদিন রোগে ভুগে শেষ ক্ষণে স্বামীর দর্শন পেয়ে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে ভ্রমর। ভ্রমর ও রোহিনী—উভয়কেই হারিয়ে গোবিন্দলাল ঈশ্বর-পাদপদ্মে মনঃসংযোগ করে।

উপন্যাসের কাহিনিগ্রন্থনে ও চরিত্র চিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্র নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। নারীর আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তির সঙ্গে সংস্কারের দ্বন্দ্ব, রূপজ মোহের জন্য নৈতিক অধঃপতন প্রভৃতি বিষয়কে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করেছেন লেখক। তবে উপন্যাস রচনার নৈতিক ভাবনার কাছে শৈল্পিক ভাবনা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— "হিন্দুর নৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র নরনারীর সম্পর্ক বিচার করেছেন এবং সামাজিক নীতির সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক কামনার সংঘর্ষ হলে অর্থাৎ আর্টের সঙ্গে মর‍্যালিটির দ্বন্দ্ব হলে আদর্শবাদী এবং হিন্দুর সামাজিক নীতির সংরক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র আর্টের কথা অস্বীকার করে আদর্শ ও নীতির জয় ঘোষণা করতে কখনও সঙ্কুচিত হতেন না।" (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, পৃষ্ঠা. ৪৩১) কুন্দনন্দিনীর আত্মহত্যা এবং রোহণীর হত্যাকাণ্ড তাঁর নৈতিক দায়িত্বের সচেতন প্রকাশ।

'রাজসিংহ' বঙ্কিমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কয়েকটি উপন্যাস (*বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, ইন্দিরা, রাধারানী*) ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র সব উপন্যাসেই ইতিহাসকে প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইতিহাসকে অতিক্রম করে গেছে তাঁর সাহিত্যিক সত্তা। এই প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— "বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক তথ্য সব সময়ে গ্রহণ না করলেও ঐতিহাসিক রসদৃষ্টিতে তাঁর সমকক্ষ ঔপন্যাসিক বাংলাদেশে দ্বিতীয় কেউ নেই। বিশুদ্ধ ইতিহাস লেখা ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের কাজ নয়, সে কাজ করবেন তথ্যানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক ইতিহাসে ছায়াপটে নরনারীর জীবনায়নের মধ্য দিয়ে বিস্মৃত বিবর্ণ যুগকে প্রাণবান করে তুলবেন। সেদিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এখনও অতুলনীয়।" (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—*বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, পৃষ্ঠা. ৪২৮) রাজসিংহ

বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। উপন্যাসটি চৈত্র, ১২৮৪ থেকে ভাদ্র, ১২৮৫ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু প্রথম সংস্করণে এটি ছিল 'ক্ষুদ্র সংস্করণ'। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ সংস্করণে উপন্যাসটি বর্তমান আকার লাভ করেছিল। চতুর্থ সংস্করণ 'রাজসিংহ'-এর 'বিজ্ঞাপন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "আমি পূর্বে কখনো ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'চন্দ্রশেখর' বা 'সীতারাম'-কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।" এই 'বিজ্ঞাপন' অংশেই তিনি ঐতিহাসিক বিষয় প্রকটনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও জানিয়েছিলেন, "ব্যায়ামের অভাবে মানুষের সর্বাঙ্গ দুর্ব্বল হয়। জাতি সম্পর্কেও এ কথা খাটে। ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দু বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণস্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি।" উপন্যাসটির কাহিনী ও প্রধান চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে গৃহীত হয়েছে। চঞ্চলকুমারীকে ঔরংজেবের বিবাহের ইচ্ছা, রাজসিংহের সঙ্গে তার বিরোদ, সেই বিরোধে রাজসিংহের জয়লাভ এবং চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে বিবাহ—এই উপন্যাসের মূল ঘটনা যা ইতিহাস-অনুমোদিত। এই ঘটনার সঙ্গে সমান্তরালে বর্ণিত জেবুন্নিসা-মবারক-দরিয়াবিবির ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু কল্পনা ও ইতিহাস একে-অপরের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি, বরং পরস্পরকে সংগতি প্রদান করে উপন্যাসটিকে পূর্ণ করে তুলেছে।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় পর্যায়ের উপন্যাস রচনার আরম্ভ। উপন্যাসটি চৈত্র, ১২৮৭ থেকে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েচিল ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'—এই তিনটি উপন্যাস প্রচারধর্মী বা তত্ত্বমূলক রচনা হিসেবে অধিক পরিচিত। সুকুমার সেনের মতে, "দেশপ্রীতি ও নিষ্কামকর্মের সমন্বয়—এই মহৎ আদর্শ আনন্দমঠের প্রতিপাদ্য।" (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা.১৯১) 'আনন্দমঠ'-এর কাহিনিতে ইসলামিক ইতিহাসের অবতারণা কেবল উপলক্ষ, মূল প্রেরণা ছিল ইংরেজ শাসনের সমাগত-প্রায় বিপ্লবের পথ-রচনা। মুঘল যুগের সমাপ্তি ও ইংরেজ আমলের শুরুর দিকের সময়পর্ব উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট। উপন্যাসটির সূচনা হয়েছিল '৭৬-এর মন্বন্তরের ভিত্তির উপর এবং এই মন্বন্তরের চিত্র বর্ণনায় তিনি W.W. Hunter-এর ইংরেজি বিবৃতিকে অনুসরণ করেছিলেন। উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে কাল্পনিক গৌরবময় ভূমিকায় স্থাপন করে দেশপ্রেমকে মহাকাব্যিক রূপ দিয়েছিলেন। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি এই উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। স্বাদেশিকতা, আত্মত্যাগ ও আদর্শবাদকে ধারণ করে আছে উপন্যাসটি। 'দেবী চৌধুরানী'-র কাহিনি বাংলার সমাজ ও পারিবারিক পটভূমিকায় চিত্রিত হলেও এর অন্তরালে আছে গীতা-তত্ত্বের আভাস এবং তাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্রের সূক্ষ্ম ধর্মীয় অনুভূতি ও হিন্দুর সামাজিক আচার-আচরণের কথা। প্রফুল্ল নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ঘটনাচক্রে দেবী চৌধুরানী হয়ে ওঠে। প্রচুর ঐশ্বর্য ও প্রচণ্ড প্রতাপের অধিকারী হলেও পরে সে গুরুদেবের কাছে গীতার নিষ্কামতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়ে নারীজীবনের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করে এবং সমস্ত ঐশ্বর্য ও প্রতাপ ত্যাগ করে স্বামীর সংসারে ফিরে আসে। গীতাতত্ত্ব ও হিন্দুনারীর অবস্থান নিয়ে নানা উপদেশ তিনি দিয়েছেন।

এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমকে ছাপিয়ে গেছে তাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র। 'সীতারাম' বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। উপন্যাসটি 'প্রচার' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল শ্রাবণ-১২৯১ বঙ্গাব্দ থেকে মাঘ, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে। প্লটের কল্পনায় ও বর্ণনায় দেবী চৌধুরানী'-র সঙ্গে এই উপন্যাসের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই উপন্যাসেও গীতার মন্ত্রে দীক্ষিত বঙ্কিমের ধর্মকেন্দ্রিক তত্ত্বচিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট।

১৫.৪ সমকালীন ঔপন্যাসিক বৃন্দের উপন্যাসকৃতি

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের তুল্য খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তিনি 'স্বর্ণলতা'র সুপ্রসিদ্ধ লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) তারকনাথের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। উপন্যাসটি 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকাতেই উপন্যাসটি সম্পর্কে বলা হয়েছিল, "পুস্তকখানি স্বভাব-উক্তি ও স্বভাব-চিত্রে পরিপূর্ণ। আমরা ইহাতে এমন এক স্থানও দেখিতে পাই নাই, যাহা সচরাচর ঘটে না, কিংবা যাহাতে স্বভাবের ব্যতিক্রম আছে।' তারকনাথ তাঁর ব্যক্তিগত রোজনামচায় 'স্বর্ণলতা'-র কাহিনী সম্পর্কে বলেছিলেন, "Some character of my novel are from real life." সরকারি স্বাস্থ্য কমিশনের অধীনে বসন্তের টীকা দেওয়ার কার্য-তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে উত্তর বাংলার বিভিন্ন জেলা ঘোরার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে ঘোরার ফলে গ্রামজীবন, পারিবারিক জীবন, একান্নবর্তী জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন তিনি। তাঁর সেই দেখা, সেই অভিজ্ঞতাই সাহিত্যরূপ পেয়েছে তাঁর উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সের অসাধারণ ঐশ্বর্যের দ্বারা বাঙালি পাঠকের মন জয় করেছিলেন। তিনি সমসাময়িক সমাজের প্রক্ষিতে যে বাস্তব সমস্যার চিত্র এঁকেছিলেন, সেখানে বাস্তব জীবনকে ছাপিয়ে গেছে রোমান্সের প্রাচুর্য। কিন্তু তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কল্পিত ঐশ্বর্যময় রোমান্স ত্যাগ করে উনিশ শতকের শেষভাগের সাধারণ বাঙালি জীবনের তথ্যবহ পারিবারিক চিত্র এঁকেছেন। সুকুমার সেনের মতে, "ছোট-বড় সুখদুঃখের জালবোনা দিনরজনীর পরিচিত সংসারে অতি সাধারণ নরনারীকে অহরহ যে কঠিন নিষ্ঠুরতা ও রূঢ়তার সম্মুখীন হইতে হয় তাহারই একটি নগণ্য কাহিনী স্বর্ণলতার বিষয়। পুরোপুরি বাস্তবদৃষ্টি লইয়া উপন্যাস রচনা বাঙ্গালায় এই প্রথম।" (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা.২০১)

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাঙালি জীবনের যে ছবি আছে, সেটি কল্পনা চিত্র এবং তারকনাথের স্বর্ণলতায় যে ছবি আছে তা দৃষ্টি-চিত্র। তারকনাথ রোমান্টিসিজমের রঙিন চশমা পড়ে প্লটের নির্মাণ করেননি, তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা সুদূর বা অদূর অতীতের প্রণয়রসাতুর কল্পনাস্বর্গবাসী নয়, বাস্তবের মাটিতে তারা নির্মিত ও বিকশিত হয়েছে। শশিভূষণ ও বিধুভূষণ দুই ভাই অপার স্নেহের সম্পর্কে আবদ্ধ। জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের স্ত্রী প্রমদার চক্রান্তে দুই ভাইয়ের সংসারে ভাঙন ধরে। ছোটোভাই বিধুভূষণ কলকাতায় এসে নানা উপায়ে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের

চেষ্টা করতে থাকে। অন্যদিকে বিধুভূষণের স্ত্রী সরলা মুখ বুজে প্রমদার অত্যাচার সহ্য করতে থাকে। উনিশ শতকের একান্নবর্তী পরিবারের ভ্রাতৃবধুদের স্বর্থপরতা ও জটিল জীবন-সমস্যার নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন তারকনাথ। তবে চরিত্রগুলি অধিকাংশই 'টাইপ' চরিত্র পরিণত হয়েছে। হয় তারা পুরোপুরি সৎ, না হলে ষোলো আনা শেঠ, অথবা তারা নিরীহ ভালোমানুষ, কিংবা সদানন্দময় নিঃস্পৃহ। তাদের আচরণ, নীতিবোধ ও মনস্তত্ত্বের কোন দ্বন্দ্ব উপন্যাসে স্থান পায়নি। তাদের আচরণের মধ্য দিয়ে লেখক কোন উদাত্ত ভাব বা সুগভীর তত্ত্ব ব্যক্ত করার চেষ্টা করেননি। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "তারকনাথের হাতে একটি মাত্র ক্যামেরা ছিল, যাতে বোতাম টিপে টিপে তিনি হুবহু ঘটনার ছবি তুলেছেন। কিন্তু ছবিতে শিল্পীর তুলির ছোঁয়া লাগেনি। ঘটনাবিন্যাসে তাঁর উপন্যাসে কোনও প্রকার craftsmanship বা কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় না।...তাই তাঁর উপন্যাসগুলি দৈনন্দিন জীবনের গদ্য-পাঁচালী হয়েছে, প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসে দানা বেঁধে ওঠেনি।" (*বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, পৃষ্ঠা. ৪৪১) প্রতিদিনের বাঙালি জীবনের এমন নিঃস্পৃহ ও বাস্তবানুগামী বর্ণনা সেইযুগের কোনো লেখকের হাতেই এত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়নি। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনায় বাস্তব জীবন বর্ণিত হলেও শরৎচন্দ্রের বাস্তব পরিবেশ এবং চরিত্রে ছিল আদর্শবাদ ও প্রচ্ছন্ন-রোমান্টিকতা এবং বিভূতিভূষণ গীতিরসের দ্বারা বাস্তবকে এক নতুন চিত্ররূপ দান করেছিলেন। কিন্তু তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাস্তবকে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত না করে, কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে বাস্তবভাবেই উপস্থাপন করেছিলেন। তবে সাহিত্যের শাশ্বত মূল্য সম্পর্কে তারকনাথের ধারণা কিছুটা অগভীর ও অস্বচ্ছ ছিল। তিনি যেভাবে স্বর্ণলতার আখ্যান বয়ন করেছেন তা অপরিণত। উপন্যাসটিতে জীবনচিত্র থাকলেও জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির অভাব রয়েছে। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসটি সেই সময় বেশ জনপ্রিয়তা ও সমালোচকদের সাধুবাদ অর্জন করেছিল। তাঁর জীবিত কালের মধ্যেই অতি অল্প সময়ে 'স্বর্ণলতা'-র সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল যা সে সময়ের কোনো লেখকের ভাগ্যেই ঘটেনি।

উপন্যাসটি প্রকাশকালেই সিভিলিয়ানদের কাছে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। যেহেতু উপন্যাসটিতে বাঙালি পরিবারের নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে; তাই ইংরেজরা স্বভাবতই কৌতুহল বোধ করেছিল। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক জে. ডি. এন্ডারসনের চেষ্টায় 'স্বর্ণলতা' ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এন্ডারসন তারকনাথকে ইংরেজি লেখক গোল্ডস্মিথের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তৎকালের প্রসিদ্ধ অনুবাদিকা মিরিয়াম নাইট (Mirium Knight) ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায় 'A Glimpes into the Indian Inner Home' নামে স্বর্ণলতার অনুবাদ করেছিলেন। ঐ বছরই আর একটি অনুবাদ করেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন রায়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে D.C. Roy 'স্বর্ণলতা' নাম অক্ষুন্ন রেখেই একটা ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক এডওয়ার্ড টমসন 'The Brothers' নামে স্বর্ণলতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন।

'স্বর্ণলতা'র আশাতীত সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তারকনাথ আরও কিছু উপন্যাসধর্মী বাস্তবকাহিনী

রচনা করেছিলেন। সেগুলি হল—'ললিত সৌদামিনী' (১৮৮২), 'হরিষে বিষাদ' (১৮৮৭), 'তিনটি গল্প' (১৮৮৯), 'অদৃষ্ট' (১৮৯২), 'বিধিলিপি' (১৮৯১)। 'ললিত সৌদামিনী' স্বর্ণলতার পরে লেখা হয়েছিল এবং ক্যালকাটা রিভিউয়ে (১৮৮৩) প্রশংসিত হয়েছিল। 'হরিষে বিষাদ'-এ গ্রাম্য জীবন ও গ্রাম্য চক্রান্তের ছবি ফুটে উঠেছে। 'অদৃষ্ট' সাংসারিক মনোমালিন্য ও চক্রান্ত ঘটিত। এই দুটি উপন্যাসের মূলে রয়েছে তারকনাথের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। *স্বর্ণলতা* প্রকাশের পর লেখক উপন্যাসটির পরিণাম সম্পর্কে সন্দিহান হয়েছিলেন, নিতান্ত ঘরোয়া কাহিনীকে জনসাধারণ গ্রহণ করবে কিনা, এই আশঙ্কায় দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে তিনি *স্বর্ণলতার* প্রথম সংস্করণে নিজের নাম গোপন রেখেছিলেন, কিন্তু উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন, এমনকি তাঁর জনপ্রিয়তা সাময়িকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের জনপ্রিয়তাকেও কিছুটা ম্লান করেছিল। *স্বর্ণলতার* পরে তারকনাথের অন্যান্য রচনাগুলি স্বর্ণলতার তুল্য যশোলাভ করতে পারেনি এবং সাহিত্যিক দিক থেকেও সেগুলি অপরিণত। তবে পরিশেষে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্কিমগোষ্ঠীর অন্যান্য কথাকাররা যখন বাস্তব জীবনকে অনাবশ্যক রোমান্সের প্রাচুর্যে ঢেকে ফেলেছিলেন, তখন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের দৃষ্টি রোমান্সের স্বর্গলোক থেকে প্রতিদিনের ধূলিম্লান রোজনামচার মধ্যে টেনে এনেছিলেন। সাহিত্যের বিষয় চয়নে এই অভিনবত্বের কৃতিত্ব অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য।

রমেশচন্দ্র দত্ত

বঙ্কিমানুসারী উপন্যাস-লেখকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন ঔপন্যাসিক ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। ইংরেজিতে নানা ধরনের প্রবন্ধ লিখে তরুণ বয়সেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর গবেষণা গ্রন্থাদি আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। বাংলা উপন্যাসে তাঁর আবির্ভাব কিছুটা আকস্মিক। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণাতেই তিনি বাংলা উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন।

রমেশচন্দ্র মোট ছয়খানি বাংলা উপন্যাস লিখেছিলেন। নিজের উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদও করেছিলেন, সেই অনুবাদ ইংরেজিভাষী মানুষদের কাছে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাঁর ছয়খানি উপন্যাসের মধ্যে দুইখানি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত রোমান্টিক উপন্যাস—'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪), 'মাধবীকঙ্কন' (১৮৭৭); দুইখানি বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস—'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' (১৮৭৮), 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' (১৮৮৯) এবং দুইখানি সামাজিক ও গার্হস্থ্য উপন্যাস—'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৪)। প্রথম চারখানি উপন্যাস তথা বঙ্গবিজেতা-মাধবীকঙ্কন-জীবনপ্রভাত-জীবনসন্ধ্যাতে মুঘল ইতিহাসের একশত বছরের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে বলে এদের একত্রে 'শতবর্ষ' বলা হয়।

ইতিহাসের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল সুগভীর। স্কটের ইতিহাস চেতনার দ্বারাও তিনি প্রভাবিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন, "Sir Walter Scott was my favourite author...I spend days and nights over his novels...I do not know if Sir Walter Scott gave me a taste for history, or if my taste

for history made me an admire of Scott; but no subject, not even poetry, has such an hold upon me as history." তাঁর এই ইতিহাসপ্রীতির সাক্ষ্য বহন করে প্রথম চারটি উপন্যাস। 'বঙ্গবিজেতা'-র পটভূমি আকবরের সময়ের বাংলার ইতিহাস। ঐতিহাসিক দিক থেকে টোডর-মল্ল উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। প্রথম উপন্যাস হিসেবে কিছু অপটুত্বের পরিচয় দিয়েছেন লেখক, কিন্তু বলাবাহুল্য ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কোনো ত্রুটি রাখেননি। এই উপন্যাসে প্রেম, গার্হস্থ্যজীবন, ক্রূরতা, আত্মত্যাগ—মানবচরিত্রের আলো-আঁধারের সমস্ত লীলা বর্ণিত হলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল চরিত্রের অভাব রয়েছে। উপন্যাসের কাহিনীতে দুটি ধারা সমান্তরালভাবে চলেছে। একটি ইতিহাসাশ্রিত, অন্যটি কাল্পনিক, রোমান্সরাসাশ্রিত। কিন্তু কাহিনি দানা বাঁধতে পারেনি। ঐতিহাসিক কাহিনি যেমন তথ্যভারে অপেক্ষাকৃত নীরস হয়েছে, তেমনি রোমান্টিক গল্পাংশও বৈশিষ্ট্যহীন বর্ণনাধর্মিতার ফলে হয়েছে নির্জীব। ভাষা-বিন্যাস ও শব্দ-চয়নেও লেখক উপন্যাসটিকে রসগ্রাহী করে তুলতে পারেননি। উপন্যাসটি সাধুভাষাত্মক ও বর্ণনামূলক। সংলাপেও কথ্যভাষার অনুপস্থিতি এবং সাধুভাষার সংমিশ্রণ উপন্যাসটিকে কৃত্রিম ও প্রাণহীন করে তুলেছে।

'বঙ্গবিজেতা' রচনার তিনবছর পরে 'মাধবীকঙ্কণ'-এর রচনা। পূর্বের তুলনায় ঘটনা-পরিকল্পনা, চরিত্র-চিত্রণ, ভাষা-বিন্যাসে রমেশচন্দ্র অনেক বেশি সাবলীলতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। টেনিসনের Enoch Arden কবিতার ঘটনার আদর্শে মাধবীকঙ্কণের কাহিনি পরিকল্পিত হয়েছে এবং কাহিনির প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে শাজাহানের শেষ জীবনে তাঁর রাজ্য-লোভাতুর পুত্রদের অন্তর্বিদ্রোহ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*-তে বলেছেন, "মাধবীকঙ্কণ মূলতঃ একটি পারিবারিক উপন্যাস। ইতিহাস ইহার প্রধান অংশ।" উপন্যাসের নায়ক নরেন্দ্রনাথ, নায়িকা হেমলতা এবং প্রতিনায়ক শ্রীশচন্দ্রকে কেন্দ্র করে রোমান্সরসের অবতারণা করেছিলেন লেখক এবং এক্ষেত্রে তিনি অতিশয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'বঙ্গবিজয়'-এ রোমান্সরসের অবতারণায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু এই উপন্যাসে তাঁর নিজস্ব প্রতিভা বিকশিত হয়েছে। সুকুমার সেন বলেছেন, "রমেশচন্দ্র বাঙ্গালা রোমান্সে নূতনত্বের আবির্ভাব করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক পরিবেশের সঙ্গে গল্পকাহিনীর সংযোগ দৃঢ়তর করিয়া দিয়া তিনি বাঙ্গালা রোমান্সে তিনি বৈচিত্র্য ঘটাইলেন।" (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা.২০৫)

রমেশচন্দ্রের প্রথম সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত'। ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির সফল অভ্যুত্থান এই উপন্যাসের বর্ণিত বিষয়। পূর্বোক্ত দুটি উপন্যাসে ইতিহাস ছিল পটভূমিকা হিসেবে আর এই উপন্যাসে ইতিহাসই গল্পের প্রধান বিষয়। শিবাজী গল্পের নায়ক এবং ঔরঙ্গজেবে গল্পের প্রতিনায়ক। বিষয়-বিন্যাসে, চরিত্র-চিত্রণে কোথাও ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততার অপলাপ ঘটেনি। সেইসঙ্গে ঐতিহাসিক জীবনের অপরিচয়ের দূরত্বকে নিবিড় করে তুলেছেন রঘুনাথ-সরযূর রোমান্টিক প্রণয়-কথা। 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'-য় প্রতাপসিংহোত্তর যুগে রাজপুত জাতীয়-জীবনের ঘনায়মান

অন্ধকারকে উপস্থাপিত করা হয়েছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। এই সময়পর্বের ইতিহাস জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের। উপন্যাসে ইতিহাসের প্রাধান্য বেশি, তবে ঘটনাকে রোমান্স-রসায়িত করা হয়েছে তেজসিংহ-পুষ্পকুমারীর প্রণয়কথায়। উপন্যাস দুটিতে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজনৈতিক শাঠ্য-ষড়যন্ত্র, দুঃসাহসিক অভিযান, বীরত্ব, আত্মত্যাগ, প্রেম প্রভৃতি ব্যাপার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র এখানে একনিষ্ঠ ঐতিহাসিক। ইতিহাসের সঙ্গে আছে স্বদেশচেতনার সুর। মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের গৌরবময় ইতিহাসকে তিনি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। সুকুমার সেন বলেছেন, "রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে ইতিহাসের মর্যাদা যথাসম্ভব রক্ষিত। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় সর্বদাই ততটা ইতিহাস অনুগতি পাই না।" (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা.২০৫) ইতিহাসের মূল সুরটি উপন্যাস দুটিতে যথার্থভাবে ধ্বনিত হয়েছে। বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে এই দুটি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়।

তাঁর ঐতিহাসিক প্রতিভা দেখে অনেকেই তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' ছাড়া অন্য কোনো তথাকথিত উপন্যাসে ইতিহাসের আনুগত্য স্বীকার করেননি। নিজস্ব পরিকল্পনা ও উপন্যাসের নিজ দাবীকে পরিপূর্ণতা প্রদানের জন্য অনেক সময় তিনি ইতিহাসকে লঙ্ঘন করেছিলেন, তাতে উপন্যাসের মান বাড়লেও ইতিহাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে প্লট, কাহিনি, চরিত্র নির্মাণে ইতিহাসের প্রাধান্য বেশি। দু-চারটি কাল্পনিক চরিত্র বা কাহিনি থাকলেও তাদের গুরুত্ব অনেকখানি কম। এই বিষয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য আছে তা স্বীকার করতে হবে। শুধু ঐতিহাসিক ঘটনা বলে যাওয়া বা ঐতিহাসিক চরিত্রকে হুবহু ইতিহাসের ধাঁচেই লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণ নয়। ইতিহাসের পটে ইতিহাসের রসসৃষ্টি করা, ইতিহাসের চরিত্রের মধ্য দিয়ে চিরকালের মানবজীবনকে প্রত্যক্ষ করা এবং ইতিহাসের অজ্ঞাত রহস্যময় কোণে সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করা ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ।...বঙ্কিমচন্দ্র প্রয়োজনস্থলে ইতিহাসকে কিছু বদলে নিলেও কোথাও ইতিহাসের আত্মার অবমাননা করেননি। আসলে তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী এবং প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর প্রতিভা ও স্বাধীনতা তাঁর ছিল। রমেশচন্দ্র সূক্ষ্মাগ্রবুদ্ধি ঐতিহাসিকের মতো ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রকে সারি দিয়ে সাজিয়েছেন, কিন্তু তার দ্বারা প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস লিখতে পারেননি।" (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, পৃষ্ঠা. ৪৩৬)

রমেশচন্দ্রের দুইখানি সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস সংসার ও সমাজ উপন্যাস হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ না হলেও যে আদর্শবাদ ও প্রচার-ইচ্ছের বশবর্তী হয়ে ঔপন্যাসিক উপন্যাস দুটি রচনা করেছিলেন, তার গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য। উপন্যাস দুটিতে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র জীবনের অতীত জগৎ থেকে বর্তমানের ভাবভূমিতে নেমে এসেছেন। সামাজিক জীবনচিত্র হিসেবে গ্রন্থদুটি অনেকটাই নিটোল। 'সংসার' উপন্যাস সম্পর্কে সুকুমার সেনের মত, "এই বিষয়ে রমেশচন্দ্রের পথপ্রদর্শক ছিলেন পাদরি লালবিহারী দে।

লালবিহারীর *Bengal Peasant Life* বা *Govinda Samanta* বইটিতে বর্ধমান জেলার চাষীঘরের নিখুঁত চিত্র পাই।" (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা.২০৫) রমেশচন্দ্র বেশ কিছুকাল বর্ধমান জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, ফলে অঞ্চলটি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা তাঁর তৈরি হয়েছিল, যার প্রতিফলন দেখা যায় উপন্যাসটিতে। উপন্যাসটিতে বিধবা বিবাহের সমর্থন আছে। 'সমাজ' উপন্যাসটিতে অসবর্ণ বিবাহের (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বিবাহ) সমর্থন আছে। উপন্যাস দুটিতে নিম্নমধ্যবিত্ত ও গ্রাম্য পারিবারিক জীবন বিশেষত রাঢ়ের পল্লীচিত্রগুলি বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। তবে গার্হস্থ্য-সমস্যামূলক উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। একটা নীতি-আদর্শকে জয়যুক্ত করার জন্য তিনি পারিবারিক প্লটের নির্মাণ করেছিলেন। সুকুমার সেনের মতে, "কোন কোন বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কারবিমুখ ছিলেন এবং তাঁহার স্বদেশপ্রীতির মধ্যে উপদেষ্টার ভাব বেশি ছিল। রমেশচন্দ্র সংস্কার-বিমুখ ছিলেন না, তাঁহার মধ্যে ছিল শুশ্রূষার মনোবৃত্তি।" (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা. ২০৫) সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়ে তিনি খুব প্রগতিশীল ছিলেন। বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের যৌক্তিকতা তিনি স্বীকার করতেন। তাঁর উপন্যাসে সমাজ-সমস্যামূলক বা পারিবারিক সঙ্কটমূলক কোন গভীর তত্ত্ব না থাকলেও তাঁর বিষয় নিবাচনের ঔদার্য সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে প্রশংসার দাবী রাখে।

স্বর্ণকুমারী দেবী

বঙ্কিমোত্তর বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে বাংলায় যে নবজাগরণ ঘটেছিল, তারই ফলশ্রুতিতে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার আলোয় আলোকিত হয়েছিল বাংলার নারীসমাজ। ঠাকুর পরিবারের প্রতিটি মেয়েই গৃহে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে বেথুন স্কুলে ভর্তি হতেন, তারপর অল্পবয়সে বিয়ে হয়ে যাবার জন্য পড়াশুনা সম্পূর্ণ করতে পারত না। ব্যতিক্রম ঘটেছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর বেলায়। তিনি অধিক বয়স পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিলেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। তাঁর সাহিত্য প্রতিভাও ছিল বহুমুখী। উপন্যাস, কবিতা, নাটক, গল্প, গান-সাহিত্যের সমস্ত প্রকরণেই তিনি সাবলীল পারদর্শীতা দেখিয়েছিলেন। সাময়িকপত্র সম্পাদনাতেও তিনি কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকা সমকালে বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছিল। স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন যথার্থই নবজাগরণের নারী চেতনার প্রতিমূর্তি।

সুকুমার সেনের মতে, স্বর্ণকুমারী দেবীই ছিলেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ভাল লেখিকা'। স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬)। উপন্যাসটি ঐতিহাসিক রোমান্সধর্মী। পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার প্রণয়কে কেন্দ্র করে রোমান্সরসের অবতারণা করেছিলেন তিনি। ভূদেব চৌধুরী এই উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন, "ভাব ও ভাষায় তা আরো রস-নিবিষ্ট হয়ে উঠেছে নারীসুলভ স্পর্শকাতরতার স্পর্শে।" (ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*, দ্বিতীয় পর্যায়, পৃষ্ঠা. ৩৭৯) এছাড়াও 'মেবাররাজ' (১৮৮৭), 'বিদ্রোহ' (১৮৯০), 'ফুলের মালা' (১৮৯৫) ইত্যাদি ইতিহাসাশ্রিত রচনা। স্বর্ণকুমারী দেবী ঐতিহাসিক উপন্যাসে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে পারেননি। এক্ষেত্রে তাঁর মৌলিকতাও বিশেষ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো কল্পনার

প্রসার ও আবেগের তীব্র দীপ্তি তিনি আয়ত্ত করতে পারেননি। ইতিহাসের তথ্যানুবর্তনের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক সত্যরক্ষার ব্যাপারে স্বর্ণকুমারী দেবী রমেশচন্দ্রের দৃষ্টান্তকেই অধিক গ্রহণ করেছিলেন।

'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৬), 'মালতী' (১৮৮০) উপন্যাস দুটি ভাই-বোনের স্নেহ-সম্পর্ককে আশ্রয় করে রচিত। বাঙালির গার্হস্থ্য জীবন-ভাবনায় নতুন রোমান্স-রসের সঞ্চার করেছিলেন লেখিকা। তাঁর অন্যান্য গদ্য-আখ্যানগুলি হল—'হুগলীর ইমামবাড়ি' (১৮৮৮), 'কাহাকে' (১৮৯৮), 'বিচিত্রা' (১৯২০), 'স্বপ্নবাণী' (১৯২১), 'মিলন-রাত্রি' (১৯২৫)। সামাজিক নানা বিচার-বিতর্ক ও সামাজিক সম্পর্কের নানা টানা-পোড়েন স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসকে ভারাক্রান্ত করেছে কখনো কখনো। 'হুগলীর ইমামাবাড়ি' উপন্যাসে ধর্মতত্ত্ব আলোচনার অতি-বিস্তার গ্রন্থের সরস-বাস্তবতাকে গ্রাস করেছে। সন্ন্যাসী তাঁর অতমানবিক শক্তি নিয়ে একাধিকবার আবির্ভূত হয়ে গল্পের স্বাভাবিক স্রোতকে ব্যহত করেছে। ধর্মতত্ত্বের প্রাধান্য ও অতি-মানবিক শক্তির অধিক ব্যবহার উপন্যাসটির প্রধান ত্রুটি। 'স্নেহলতা' উপন্যাসটিও সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের ভারে মুহ্য। জগৎবাবুর পারিবারিক জীবন গ্রন্থারম্ভে আশার উদ্রেক করলেও তাত্ত্বিক চর্চার প্রাবল্যে তা ম্লান হয়ে গেছে। সমাজ-সমালোচনা ও মতবাদ প্রচারে প্রাবন্য উপন্যাসটিকে শিল্পসার্থকতায় উন্নীত হতে দেয়নি। স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্য সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "স্বর্ণকুমারীর রচনায় প্রায়শই একটা পুরুষালি ভাব চোখে পড়ে, যার ফলে তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসে নারী-লেখিকার স্নিগ্ধ স্পর্শ বড়ো একটা পাওয়া যায় না। উপরন্তু কাহিনী ও চরিত্রগুলিকে অনেক সময় মনে হয়, তারা যেন অনেক বেশী কৃত্রিম ও সাজানো-গোছানো।" (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, পৃ.৪৪৪)

'কাহাকে?' স্বর্ণকুমারী দেবীর শ্রেষ্ঠ রচনা। উপন্যাসটির বিশেষত্ব এই যে, উপন্যাসটির মধ্যে নারী-হৃদয়ের সুরটি আদ্যোপ্রান্ত ধরা পড়েছে। পিতার প্রতি কন্যার মনোভাব বর্ণনায়, নবজাগ্রত প্রেমের বিশ্লেষণে, প্রেমভঙ্গের দুঃসহ বেদনা ও নৈরাশ্যে, মিলনের গভীর প্রশান্তিতে নারী-হৃদয়ের সূক্ষ্মতা ও ভাব-প্রবণতার সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে এই উপন্যাসে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "উপন্যাসের সমস্ত ব্যাপারেই নারীসুলভ সূক্ষ্মদর্শিতা ও ভাবপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণত পুরুষ ঔপন্যাসিক আধুনিক শিক্ষিত নারীর মধ্যে যে প্রগলভতা ও পুরুষ বুদ্ধি প্রাধান্যের আরোপ করিয়া থাকেন, এখানে তাহার চিহ্নমাত্র নাই-শিক্ষা তাহাকে বাক-সংযম দিয়াছে, তাহার রুচি মার্জিত করিয়া তাহার চরিত্র-সৌকুমার্যকে বাড়াইয়াছে। এই স্ত্রী মনোভাবের নিখুঁত প্রতিবিম্ব হিসেবে উপন্যাসটির একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে।"

পরিশেষে বলা যায়, উনিশ শতকের নারী-জাগরণের কেন্দ্রস্থলে যে স্বর্ণকুমারীদেবী বিরাজ করছেন, তাতে সন্দেহ নেই। স্বর্ণকুমারী দেবীর ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসগুলিতে মহৎ ও চিরস্থায়ী সাহিত্য-প্রতিভার লক্ষণ না থাকলেও বাংলার প্রথম পর্বের মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে চির গৌরবজ্জ্বল স্থান তাঁর প্রাপ্য।

১৫.৫ সারাংশ

এর আগে আমরা বাংলা উপন্যাসের সূচনা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। বর্তমান এককে সার্থক উপন্যাসের স্রষ্টা ও উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্যারীচাঁদ মিত্র, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হানা ক্যাথরিন মুলেন্সের প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। দেখা গেছে তাঁদের রচনাগুলিতে উপন্যাসের কিছু কিছু লক্ষণ থাকলেও সম্পূর্ণ সার্থক হতে পারেনি। এঁদের পরে প্রথম সার্থক উপন্যাসকার বলতে প্রথমেই বলতে হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম। ১৮৬৫ সালে 'দুর্গেশনন্দিনী' দিয়ে তাঁর রচনার সূত্রপাত। এটি সূক্ষ্মবিচারে রোমান্স। তারপর তিনি *কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী* আর বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রথম বাস্তব উপন্যাস রচনা করেন 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭২ সালে)। বিভিন্ন ধরনের উপন্যাস রচনা করে বাংলা উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেন। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রেরণায় রমেশচন্দ্র দত্ত অনেকগুলি সামাজিক ও ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস রচনা করেন।

এরপর উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়র নাম করতে হয়। তাঁর 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসটিতেই তিনি খ্যাতি পান। অবশ্য উপন্যাসের নাট্যরূপ 'সরলা'ই তাঁকে খ্যাতি এনে দেয়। এরপর নাম করলে হয় মহিলা উপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী। ইনি অনেকগুলি উপন্যাস লিখে খ্যাত হন। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কাহাকে?' উপন্যাসটি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এটিকে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের পূর্বসূরী বলা যায়।

যাইহোক, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা উপন্যাসের সূচনা ও বিকাশ খ্যাতির শীর্ষচূড়ায় উঠেছিল।

১৫.৬ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :

১। উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভার মূল্যায়ন করুন।

২। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বাস্তবতার উপস্থিতি কীভাবে লক্ষ্য করা যায় তা লিপিবদ্ধ করুন।

৩। রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাস কিভাবে ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে আলোচনা করুন।

৫। বাংলা উপন্যাসের প্রথম পর্বে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের যে ছবি ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করুন।

৬। বাংলা উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী দেবীর অবদান আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। টীকা লেখো—'দুর্গেশনন্দিনী'

২। বঙ্কিমচন্দ্রে রোমান্স উপন্যাস বলতে কী বোঝ?

৩। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' উপন্যাসদুটির মৌলিক পার্থক্য কী?

৪। 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের বিষয়বস্তু আলোচনা করো।

৫। টীকা লেখো—'দীপনির্বাণ'।

১৫.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। *কালের প্রতিমা*—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং

২। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

৩। *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা (দ্বিতীয় খণ্ড)*—গোপাল হালদার, অরুণা প্রকাশ

৪। *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*—গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং

৫। *কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্য*—দেবকুমার বসু, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স

৬। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

৭। *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা*—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি

৮। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (দ্বিতীয় খণ্ড)*—শ্রী ভূদেব চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং

৯। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড)*—সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স

১০। *উপন্যাসের বর্ণমালা*—সুমিতা চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি

১১। *আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্য*—সত্যজিৎ চৌধুরী, দি ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী

১২। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং

একক ১৬ ❑ বাংলা ছোটোগল্পের উদ্ভব ও রবীন্দ্রনাথ

গঠন

১৬.১ উদ্দেশ্য

১৬.২ প্রস্তাবনা

১৬.৩ বাংলা গল্পের উদ্ভব : প্রাচীন ও মধ্যযুগের কথা

১৬.৪ বাংলা ছোটোগল্পের উদ্ভব ও বিকাশ

১৬.৫ বাংলা ছোটোগল্প ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬.৬ সারাংশ

১৬.৭ অনুশীলনী

১৬.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- বাংলা গল্পের উদ্ভব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- গল্প ও ছোটোগল্প কাকে বলে এবং পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য কী তা বুঝতে পারবেন।
- ছোটোগল্পের রূপ-রীতি ও শিল্প প্রকরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে গল্পের উৎস ও বৈচিত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
- বাংলা গল্পের বিকাশের ধারা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পারবেন।
- বাংলা ছোটোগল্পে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ও অবদান বিষয়ে জানতে পারবেন।

১৬.২ প্রস্তাবনা

সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপের মধ্যে ছোটোগল্প হল সবচেয়ে আধুনিক। শিল্পবিপ্লবের পরে ছোটগল্পের জন্ম হয়। ছোটোগল্প জীবনের ভাঙচুর হওয়া কিছু খণ্ড-মুহূর্ত। ছোটগল্প হল লেখকের মানস প্রতীতিজাত এক সংক্ষিপ্ত সংহত, অখণ্ড গদ্যকাহিনি, যেখানে ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশ ইত্যাদি অবলম্বন করে বক্তব্য একমুখীন লক্ষ্যে তীব্রগতিতে পরিণতির দিকে উপনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বর্ষাযাপন’ গদ্যরূপ করে

বলা যেতে পারে ছোটোগল্প হবে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের গল্প, যা বর্ণনায় বাহুল্যহীন অর্থাৎ সংযত, যেখানে তত্ত্ব উপদেশের স্থান থাকবে না এবং উপসংহার হবে অতৃপ্তিকর। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ বিষয়ে বলেছেন—"ছোটগল্প জীবনেরই প্রতীক প্রকাশ। ছোটোগল্প আধুনিক কালের গল্প, তা যে কোন একটি বিষয়কে আশ্রয় করে।" ভূদেব চৌধুরী বলেছেন, "ছোটোগল্প যেন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার পাতায় পাতায় গদ্যে লেখা গীতিকবিতা।" উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের মতে, "ছোটোগল্প হল এমন এক কাহিনী, যা কোন ঘটনা, পরিবেশ বা মানসিকতাকে নির্ভর করে একটি ভাবগত ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করে এবং সেই প্রতিষ্ঠিত ভাবগত ঐক্যের গভীরে প্রতীতি ক্রমশঃ নাটকীয় শীর্ষদেশ স্পর্শ করে পাঠকের মনভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে।"

ছোটোগল্পের জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর ক্রমপ্রসারমান জীবনধারায় একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ছোটোগল্পের ইতিহাসগত সূচনা হল উত্তর আমেরিকায়, ওয়াশিংটন আরভিং-এর 'রীপভ্যান উইঙ্কল', এডগার অ্যালান পো-র 'ম্যানুসক্রিপ্ট ফাউণ্ড ইন এ বটল'-এ। এটিও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যে ছোটগল্পের জন্ম হল পুরাতন পৃথিবীতে (ইউরোপ) নয়, নতুন পৃথিবীতে (আমেরিকায়)। জীবনের পুরনো মূল্যবোধগুলি যখন পারিপার্শ্বিকের চাপে বিনষ্ট হতে যায়, প্রকাশব্যাকুল ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণশীল সমাজচেতনার সংঘর্ষে উপস্থিত হয়, যখন ব্যক্তি প্রচলিত রীতি ও সংস্কারকে দেবতাজ্ঞানে আর অর্চনা করতে পারে না, তখনই ব্যক্তির হৃদয় থেকে ধ্বনিত হয় আর্ত জিজ্ঞাসা— তখনই ছোট গল্পের জন্ম হয়।

গীতিকবিতা বা উপন্যাসের সঙ্গে তুলনায় ছোটোগল্পের শিল্পকৌশলে চমৎকার ধরা পড়ে। উপন্যাসের ব্যাপ্তি বা কবিতার সুদূরতা ছোটোগল্পের কাম্য নয়, তার সাধ্য গভীরতা, জীবনের একটি খণ্ড মুহূর্তের নিপুণ নির্বাচন এবং প্রত্যক্ষতা। ছোটোগল্পে মানবজীবনের দেশকাল প্রসারিত ব্যাপ্ত চেতনা নেই, এবং নেই গীতিকবিতার সূক্ষ্মতা ও রোমান্টিক সুদূরতা। গীতিকবিতার ভাবের বহুচারিতা স্বচ্ছন্দ গতি সাহিত্যানুমোদন পেয়েছে। কিন্তু ছোটোগল্পের ভাবের একমুখিনতা, বক্তব্যের স্পষ্টতা ও ঋজুতাই আরাধ্য।

ছোটোগল্পে কী থাকবে, আর কী থাকবে না, তা বলা কঠিন। বরং বলা যেতে পারে, ছোটোগল্পে জীবনের সবকিছুরই ঠাঁই আছে। তাই বিষয় অনুযায়ী ছোটোগল্পের শ্রেণিবিভাগ খুব একটা সার্থকতা নেই। দর্শন, মনস্তত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি, রোমান্টিক জীবনবোধ, অ্যাডভেঞ্চার ব্যক্তির সমস্যা নিয়ে বাংলা ছোটোগল্প রচিত হয়েছে। চলমান জীবনের যে-কোনো খণ্ড মুহূর্তকে অবলম্বন করে ছোটোগল্প রচিত হতে পারে। ছোটোগল্পের বৈচিত্র্য সীমাহীন, রূপায়ণও সীমাহীন। বাংলা ছোটোগল্পের সেই সীমাহীন রূপকারে ভগীরথ হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৬.৩ বাংলা গল্পের উদ্ভব : প্রাচীন ও মধ্যযুগের কথা

ছোটোগল্প বিংশ শতকের জনপ্রিয় সাহিত্যকীর্তি হলেও 'গল্প' মানুষের আদিমকালের সাহিত্যকৃতির সম্ভবত প্রধানতম নিদর্শন। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মানুষ কল্পনা করে এসেছে তার পারিপার্শ্বিকের

সব কিছুরই আড়ালে নানা অলক্ষ্য শক্তি সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। সেই সমস্ত অনির্দেশ্য শক্তিগুলির সম্পর্কে তাঁরা তৈরি করতেন অজস্র কাহিনি-যা 'মিথ' বা আদিম-পুরাণ কথা বলে পরিচিত। এখনও পৃথিবীর অসংখ্য আদিম জনগোষ্ঠী মধ্যে তার অনেকগুলিই প্রচলিত। এগুলিই হল মানুষের রচিত প্রথম 'ছোট' গল্প। প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি নানা জিজ্ঞাসার নিরসন আদিম মানুষ নিজেদের বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার সীমাবন্দী উপকরণের সাহায্যে কল্পিত নানান ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে করতেন। এর থেকেই সূত্রপাত হয়েছে উপকথার। এই সব উপকথায় দেখানো হয়েছে কীভাবে অল্পশক্তিসম্পন্ন অথচ বুদ্ধিমান খরগোস শেয়াল তাদের বুদ্ধির জোরে বিশালকায় বাঘ, সিংহ, হাতিকে হারিয়ে দিয়েছে। এইসব উপকথায় বা ফেবেল্‌-এ তাই পশুর আধিপত্য। মানুষ তখনো পুরোপুরি 'হিউম্যান' হয়নি। তার মধ্যে রয়েছে পশুতা বা 'অ্যানিম্যালিটি'। তাই উপকথার দেখি মানুষ ও পশুর মধ্যে বেশ কটা আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। ঈশপের গল্প বা পঞ্চতন্ত্রে এরই উন্নত গল্পরূপ পাই।

বৌদ্ধ জাতকদের গল্প, পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের গল্প এবং ঈশপের গল্প পড়লে দেখা যায় পশুসমাজ ও মানবসমাজের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে। প্রাচীন ভারতে পঞ্চতন্ত্র, আরবদেশে পাই আরব্য-উপন্যাসের গল্প। এদের আখ্যা দেওয়া হয়েছে উপকথা বা ফেবল। উপকথার সঙ্গে জন্ম হয়েছে রূপকথার। রূপকথা দেশকালের অতীত। কে তার রচয়িতা, কবে তা রচিত হয়েছে, তা আমরা জানি না। বস্তুত রূপকথার লক্ষণই তাই। রাজপুত্র মানবমনের অ্যাডভেঞ্চার-স্পৃহার প্রতীক; দুর্গম অভিযানের পুরস্কারের প্রতীক রাজকন্যা; আর যত ভালো মন্দের প্রতীক ঐ দৈত্য। মানবমনের গোপন আশা আকাঙ্ক্ষাই রূপকথার ছদ্মবেশে দেখা যায়।

এরপরই এল রেনেসাঁস, মানুষ ফিরে এল বাস্তবলোকে। এবারের অভিযান কল্পলোকে নয়, মানবলোক-সমুদ্রপথে। অমরতার অবাস্তব আকাঙ্ক্ষার দিন অবসিত হল, শৌর্যের দম্ভ অপসৃত হল, বিজ্ঞানসাধনায় বহিঃপ্রকৃতি জয়ের অবুদ্ধির চর্চায় ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনায় মানুষ প্রবৃত্ত হল। অন্তঃসারশূন্য রোমান্সের মূল্যবোধকে ব্যঙ্গের আঘাত হানলেন সার্ভান্তেস তাঁর অমর রচনা 'ডন কুইকসোট'। চসার ও বোকাচ্চিও নেমে এলেন মাটির পৃথিবীতে। 'ক্যাণ্টারবেরি টেলস' ও 'ডেকামেরন' গ্রন্থদুটিতে ভালো-মন্দের মেশানো মানুষকে পাওয়া গেল। রঙ্গ, ব্যঙ্গ, প্রেম-লালসা, সততা-শঠতা, সাধুতা, ঈর্ষা, মহত্ত্ব ঔদার্য, হিংসা প্রতিহিংসা, ছলনা নীতিহীনতা, প্রলোভন, প্রতারণা, অসতীত্ব লাম্পট্য—সবকিছুরই সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। চসার ও বোক্কাচ্চিওর কৌতুহল ঘর সংসারের প্রতি, মর্তজীবনের প্রতি। মধ্যযুগীয় কল্পলোকের কাহিনি নয়, ফ্লোরেন্স ও ক্যাণ্টারবেরি-যাত্রী চেনা মানুষ এই দুই গ্রন্থের নায়ক। আর সব মিলিয়ে প্রচুর পরিমাণে জীবনরস এই দুই গ্রন্থে প্রবাহিত হল। অবসান হল মধ্যযুগের।

বাংলা মধ্যযুগের সাহিত্য মূলত দেব নির্ভর। সেখানেও সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা নির্ভর করত দেবতাদের ইচ্ছা অনুযায়ী। গল্প গড়ে উঠত দেবতাকে নিয়ে। কিন্তু পরিবর্তন জীবনের অনিবার্য ধর্ম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক যেমন বদলে যায়। তেমনি পাল্টে যায় জীবনযাত্রার ধরন, মানসিকতা,

মূল্যবোধ তথা নৈতিকতার মানদণ্ড জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্য সংরূপের চেহারাও চিরকাল এক থাকে না। তবে সাহিত্যের সবকটি ধারার মধ্যে, সবচেয়ে পরিবর্তনশীল নিঃসন্দেহে ছোটোগল্প। ঘটনা থেকে চরিত্র, চরিত্র থেকে বিশেষ কোনো ভাব, 'মুড' বা অনুভূতি আবার যেখান থেকে নিছক আবহ-ছোটোগল্পের ভরকেন্দ্র বদলের আর শেষ নেই। জন্মসূত্রে ছোটোগল্প উনিশ শতকীয় জীবন যন্ত্রণার ফসল। একটি বিরাট জিজ্ঞাসা-চিহ্ন রূপে সাহিত্যজগতে তার আবির্ভাব কিন্তু বিশ শতকে এর জায়গায় দেখা দিয়েছে নৈরাশ্যচেতনা, ছিন্নমূল অনিকেত মনোভাব। যে ভাবগত ঐক্যকে একদা ছোটোগল্পের প্রাণভোমরা মনে করা হত বহু আধুনিক লেখকের রচনাতেই আজ তা সুদূরপরাহত। মিশ্রভাব বা অনুভূতি ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে আজ আর অপাংক্তেয় নয় এমনকি একথাটাও অনেকেই বুঝে গেছেন যে আয়তন সংক্ষেপে মানেই ভাবসংহতি নয়।

১৬.৪ বাংলা ছোটোগল্পের উদ্ভব ও বিকাশ

'হিতবাদী' পত্রিকায় ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্প দিয়ে বাংলা সাহিত্যে সার্থক ছোটোগল্পের যাত্রা শুরু করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ছোটোগল্পের এই সংরূপকে এমন একটা উচ্চতায় নিয়ে যান যে সেখান থেকে বাংলা ছোটগল্প বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে জায়গা করে নেয়। একটা যুগযন্ত্রণায়, যুগচেতনার বহু শ্রমসিদ্ধ ফসল হল তাঁর গল্পগুলি। রবীন্দ্রনাথের গল্পের সংখ্যা একশোর অধিক। সেইসব গল্পে মূলত আঁকা হয়েছে গ্রামবাংলার মানুষের সাধারণ-জীবনধারণ ছোটছোট মুহূর্তের উদ্ভাসন। গল্পগুলির মধ্যেই বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষভাবে দেখার মতোই প্রথম দেখতে পাওয়া যায়। মানুষকে শ্রেণি, সমাজ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ-সবকিছুর আবরণ সরিয়ে দেখবার মতো অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ছিল বলে কোনোদিন তাঁর ছোটোগল্প রচনায় কোনো সংকীর্ণতার ছায়া পড়েনি।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যে বিরল ব্যতিক্রম, যিনি বাংলা ভাষায় ছোটোগল্প লেখার পথিকৃত এবং গোটা ইতিহাসে আজও শ্রেষ্ঠ গল্পকার। বাংলা ছোটোগল্প প্রসঙ্গে তাঁর নিজের উপলব্ধি—"বাংলা গদ্য আমার নিজেকেই গড়তে হয়েছে। ভাষা ছিল না, পর্বে পর্বে স্তরে স্তরে তৈরি করতে হয়েছে আমাকে।"

বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত অনেক গল্প বিংশ শতাব্দীতে বহুকাল যাবৎ বাঙালি সাহিত্য পাঠকদের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত ছিল। বেশিরভাগ গল্পে তিনি জীবনের লঘু দিকটিকে কৌতুকহাস্যে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর রচিত অধিকাংশ গল্পের প্রাণ-সঞ্চার করেছে একটা প্রসন্ন হাসির দৃপ্তি। প্রভাতকুমারের লেখা বিশিষ্ট গল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আদরিণী', 'বলবান জামাতা', 'বাস্তুসাপ', 'কাশীবাসিনী', 'ফুলের মূল্য', 'মাতৃহীন' প্রভৃতি। এছাড়া তাঁর সর্বোত্তম গল্প 'দেবী'। এই গল্পটির আখ্যানসূত্র রবীন্দ্রনাথের থেকে পাওয়া। প্রভাতকুমারের গল্পগুলোয় তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা চিত্রিত হওয়ায় তাঁর সময়ের সমাজচিত্র হিসেবে সেগুলো মূল্যবান। তাঁর গল্পে মুখ্য স্থান অধিকার করেছে প্রায় শতাব্দীপূর্বের বাঙালি মধ্যবিত্ত সচ্ছল ভদ্রপরিবার।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন—"ত্রৈলোক্যনাথ গল্প বলতে জানতেন। সে গল্প বঙ্কিমের রীতিতে নয়....ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের স্থান অন্তরের অন্দরমহলে নয়, তা বৈঠকখানাসুলভ শ্রুতিরঞ্জনতাতেই পূর্ণ-পরিণাম লাভ করেছে।" তাঁর অধিকাংশ গল্পের উপাদান ভূতপ্রেত, দৈত্যদানো। উদ্দেশ্য মূলত হাস্যরস সৃষ্টি। হয়তো এই কারণে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার যথার্থ সমাদর ঘটেনি। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলি যদি নির্জলা ভূতুড়ে কাহিনিই হতো তা হলে তার বিশিষ্ট্য রচনারীতিটি পর্যন্ত লুপ্ত হতো। কিন্তু এখানে ভূতপ্রেতের আধিপত্য থাকলেও, একে অবিশ্বাস্য ভূতুড়ে গল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলো হল 'ডমরুধর চরিত', 'লুল্লু', 'মুক্তমালা', 'ভূত ও মানুষ' প্রভৃতি।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সমান্তরালেই বড় গল্পগুলো প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণ বাঙালি ঘরের রাগ-অভিমান, প্রেম-অপ্রেম মিশ্রিত জীবনকে হৃদয়াবেগে জারিত করে শিল্পরূপ দিয়েছেন। হৃদয়ের অপরিসীম সহানুভূতি মিশিয়ে তিনি পল্লীবাংলার মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের শোষণ ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনের যে রূপ চিত্রিত করেছেন তা নিতান্ত বাঙালি জীবনের হয়েও প্রায় সারা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছে। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'বিন্দুর ছেলে' ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এরপর প্রকাশিত হয় যথাক্রমে 'মেজদিদি', 'কাশীনাথ', 'ছবি', 'হরিলক্ষ্মী', 'অনুরাধা', গল্পগ্রন্থগুলি। তাঁর বহুবিখ্যাত গল্পগুলি হল 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'লালু' প্রভৃতি। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখা ও বোঝার সুযোগ হয়েছিল শরৎচন্দ্রের। তাঁর গল্পে উঠে এসেছে যেমন বর্ণহিন্দুদের সমাজ-প্রাধান্য ও আধিপত্যের চিত্র। একইসঙ্গে উঠে এসেছে দারিদ্র ও অশিক্ষার পীড়নে হতশ্রী নিপীড়িত নিম্নবর্গের সার্বিকজীবন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়—"মানবজীবনের সুখদুঃখ ও অশ্রু-বেদনাকে সহানুভূতির রসে ডুবিয়ে এমন স্নিগ্ধ মধুর ও বেদনাবিধুর কাহিনি আর কেউ লিখতে পারেননি" (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, পৃ.৫২১)।

বাংলা ছোটোগল্প রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-আশ্রিত বাস্তধর্মী গল্প রচনার পথ পরিত্যাগ করে প্রমথ চৌধুরী বাংলা ছোটোগল্পের রচনারীতি ও বিষয়বস্তুতে নতুনতর পরিবর্তন সঞ্চারিত করেন। তাঁর প্রথম গল্প 'প্রবাস স্মৃতি' ১৩০৫ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রমথ চৌধুরীর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল 'চারইয়ারী কথা', 'নীললোহিত', 'ফার্স্টক্লাস ভূত' প্রভৃতি।

পরশুরামরে গল্পে একই সঙ্গে ধারণ করেছে সমাজ জীবনের নানান অসঙ্গতি এবং বৈঠকি মেজাজের রসোল্লাস। তাঁর 'গড্ডালিকা', 'কজ্জলী' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থগুলিতে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও হাস্যরসসৃষ্টির প্রেরণাস্থল হিসেবে পাঠককে উজ্জীবিত করেছ।

রবীন্দ্রোত্তর কালের অন্যতম গল্পকার হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। কল্লোল যুগের যৌন-মনস্তত্ত্বের প্রভাব, জীবনের নানা ক্ষয়রোগ প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের বিষয়বস্তু। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হল 'বেনামী বন্দর', 'মহানগর', 'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' প্রভৃতি।

সাহিত্য সৃষ্টির পটভূমিকায় সমকালীন সমাজব্যবস্থা নয় বা কোন মতবাদ কিংবা রাজনৈতিক দেশকয়ালের সমাজ-সত্য পরিস্ফুটন নয়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের তৃপ্ত অথবা অচরিতার্থ প্রাণের স্পন্দনকেই শোনাতে চেয়েছেন। বহুবিচিত্র বিষয় নিয়ে যে গল্প লিখেছেন বিভূতিভূষণ। যেমন আধ্যাত্মভাবনা, মানবচরিত্র, প্রকৃতিমুগ্ধতা, প্রেম-প্রকৃতি-ঈশ্বর, অতিপ্রাকৃত, মৃত্যু ইত্যাদি। এই বহুমুখী বৈচিত্র্যের মধ্যেও তাঁর গল্পগুলিতে মর্মগত সংগতি খুঁজে পাওয়া যায়। সেই সংগতিকে একথায় বলা যায় বাংলাদেশের বাঙালি ভাবুকতা। বিভূতিভূষণের গল্পগ্রন্থগুলি হল—'মেঘমল্লার', 'মৌরীফুল', 'কিন্নরদল', 'তালনবমী' প্রভৃতি।

বাংলা গল্প সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তিনটি দশক ধরে দক্ষতার সঙ্গে ভরে রেখেছিলেন। কল্লোল পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'রসকলি'। তাঁর ছোটোগল্পের সংখ্যা প্রায় দুইশত। তারাশঙ্করের উল্লেখযোগ্য গল্প গ্রন্থগুলি হল—'জলসাঘর', 'রসকলি', 'বেদেনী', 'স্থলপদ্ম', 'শ্রীপঞ্চমী', 'নারী ও নাগিনী' প্রভৃতি। সমাজের সর্বস্তরের জীবনযাত্রার বাস্তবঘনিষ্ঠ উদ্ঘাটন, বিশেষত গ্রামীণ অন্ত্যজ জীবন তারাশঙ্করের গল্পে উঠে এসেছে।

মানবশরীর বা মনের গুহ্য অন্ধকারের জ্বালা থেকে জঠরজ্বালার ক্লেশ এবং তার কার্যকারণ অনুসন্ধানই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের একমাত্র লক্ষ্য। এই সমস্ত ছাপ তাঁর 'বৌ', 'হলুদপোড়া', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পগ্রন্থে ফুটে উঠেছে। মধ্যবিত্ত মানুষের জটিল মানসিকতার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মানিকের গল্পের ভাষা হয়ে উঠেছিল ঋজু ও ধারালো।

এছাড়া স্বাধীনতার প্রবাহমান রেখেছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন—জগদীশ গুপ্ত, সুবোধ ঘোষ, বনফুল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর।

১৬.৫ বাংলা ছোটোগল্প ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই পর্বের আলোচনার শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলা ছোটোগল্পের সার্থক প্রকাশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভগীরথের ভূমিকা পালন করেন। বাঙালি পাঠককে সাহিত্যের এক নতুন ধারার সঙ্গে পরিচয় করান তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধুমাত্র যে বাংলা গল্পের সংরূপকে সৃষ্টি করলেন এমনটা নয়, তিনি একইসঙ্গে এই সংরূপটিকে প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পগুলি মূলত প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়; 'বঙ্গভাষা', 'প্রবাসী', 'সবুজপত্র', 'ছোটগল্প', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'শনিবারের চিঠি', 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', 'ঋতুপত্র' প্রভৃতি পত্রিকায়। এই সমস্ত পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলি পরবর্তীকালে চারখণ্ডে 'গল্পগুচ্ছ'-তে গ্রন্তভুক্ত হয়। এছাড়া 'সে', 'লিপিকা', 'গল্পসল্প', 'তিনসঙ্গী' নামে সংকলনেও অনেকগুলি গল্প মুদ্রিত হয়েছিল।

'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা' রবীন্দ্রনাথের প্রথম দুটি গল্প রূপে ইতিহাসে জায়গা পেয়েছে।

এ দুটি গল্প 'ভারতী' ও 'নবজীবন' (১৮৮৪) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিকভাবে এই দুটি গল্পের গুরুত্ব থাকলেও সাহিত্যমূল্য হিসেবে গল্পদুটির গুরুত্ব তেমন নেই। এই কারণে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দকে রবীন্দ্রগল্পের সূচনা মুহূর্ত ধরাই সঙ্গত। এই সময় 'হিতবাদী' পত্রিকাতে বেশ কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল 'দেনাপাওনা', 'পোষ্টমাস্টার', 'গিন্নি', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান' ও 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি'।

সময় ও বিষয় অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পগুলির অল্পবিস্তর বিশ্লেষণ করে বাংলা ছোটোগল্পে তাঁর অবদানটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক। রবীন্দ্রনাথ গল্প লেখা শুরু করেন গ্রামীণ পল্লিপ্রকৃতি ও সেইসব স্থানের মানুষদের নিয়ে। 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থটি রবীন্দ্রসাহিত্যের অনেক উৎসের সন্ধান দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গল্প আলোচনা প্রসঙ্গে তাই ছিন্নপত্র অপরিহার্য। ছিন্নপত্রে একাধিক ছোটোগল্পের বীজ খুঁজে পাওয়া যায়।

'হিতবাদী' পত্রিকায় ১৮৯১-থেকে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ পর পর ছয়টি গল্প লেখেন। 'সাধনা'য় প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা ছত্রিশটি। সাধনা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে রবীন্দ্রগল্পে শুরু হয় 'ভারতী'র যুগ ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে। এর পরে রবীন্দ্রনাথের শেষ গল্প উপহার 'তিনসঙ্গী'।

প্রথম দিকের গল্পে পল্লীপ্রকৃতির দুটি রূপ চোখে পড়ে-মানুষ ও প্রকৃতি, জনপদ ও প্রাকৃতিক দৃশ্য। একদিকে গ্রাম, ছোটখাট শহর; অন্যদিকে নদ নদী, বিল, খাল, শষ্যহীন ও শষ্যময় প্রান্তর, আর রহস্যময় পদ্মা। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সাধনা-ভারতী পর্বের গল্পগুলিকে বিষয় অনুযায়ী কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যদিও তাঁর মতে এই ভাগ অচল অনড় নয়।

১। প্রেমের সঙ্গে জলের যোগ, প্রেমের সঙ্গে অপরাদের যোগ—একরাত্রি, সমাপ্তি, নিশীথে।

২। গ্রামের পাপের উপর প্রতিষ্ঠিত গল্প—ত্যাগ, শাস্তি, দিদি, উলুখড়ের বিপদ, মেঘ ও রৌদ্র।

৩। কলকাতার জীবনের কদর্যতা, তুচ্ছতা নিয়ে গল্প—কঙ্কাল, মধ্যবর্তিনী, মানভঞ্জন।

৪। পল্লিজীবনের ধর্মের সঙ্গে কলকাতা জীবনের ধর্মের তুলনা—নষ্টনীড়, মেঘ ও রৌদ্র।

৫। বাল্যপ্রণয় নিয়ে অভিসম্পাত ও রেমান্টিক বেদনার গল্প—একরাত্রি, ডিটেকটিভ।

৬। স্বামীর প্রেম থেকে বঞ্চিত হবার দুঃখ—মধ্যবর্তিনী, মানভঞ্জন, দৃষ্টিদান।

৭। সুপ্তচৈতন্য নায়িকার জাগরণ—সমাপ্তি, মাল্যদান।

৮। পারিবারিক গল্প—ত্যাগ, শাস্তি, কাবুলিওয়ালা, মধ্যবর্তিনী, খাতা, অনধিকার প্রবেশ, দিদি, দৃষ্টিদান।

৯। চড়াপর্দার রোমান্স—মহামায়া, ক্ষুধিত পাষাণ, দুরাশা, নিশীতে, মণিহারা।

১০। নিষ্ঠুর গল্প—শাস্তি, নষ্টনীড়।

রবীন্দ্রনাথ এই সব গল্পে প্রেমের বিচিত্ররূপ, মানবজীবনে নিসর্গের প্রভাব, পৃথিবী ঘনিষ্ঠ কৈশোরজীবন, নারীব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য, সামাজিক পারিবারিক জীবন ও অতিলৌকিক অভিজ্ঞতাকে গল্পরূপ দিয়েছেন" (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা*, পৃ.৩২)।

রবীন্দ্রনাথ ছোটোগল্প লেখা শুরু করে রচনানৈপুণ্যে ও বক্তব্য-উপস্থাপনে মৌলিকতা দেখিয়েছিলেন। গল্পকার রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের জটিল রূপের চিত্রাঙ্কণে প্রমাণ করেছিলেন তাঁর তর্কাতীত শিল্পসামর্থ্য। তিনি তাঁর ছোটোগল্পে এমন একটা আয়তন সংযোজন করেছিলেন যার ফলে সাধারণ প্রেমের গল্প অপরাধমিশ্রিত প্রেমের গল্পও নতুন রূপ পেয়েছিল। প্রেমের সঙ্গে জলের ও অপরাধের যোগ দেখিয়ে যে গল্পগুলি লিখেছিলেন সেসব গল্পের বিন্যাস ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এখনো মুগ্ধ করে। গ্রামজীবনের অপরদিকটিও তিনি দেখিয়েছেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় গ্রামের পাপের উপর প্রতিষ্ঠিত গল্পগুলিতে—ত্যাগ, শাস্তি, দিদি, উলুকড়ের বিপদ, মেঘ ও রৌদ্র গল্পে। ঠাকুর পরিবারের জমিদার পরিদর্শন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ পল্লীবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এক দশক ধরে ভ্রমণ করেছিলেন। খুব কাছ থেকে সেই সমাজকে দেখেছেন। জমিদারি কাজের সূত্রে মামলার উদ্ভব ও আদালতে তার পরিচালনা, সবকিছুর সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দুষ্ট প্রজা ও নায়েব, নিরীহ প্রজা ও সৎ আমলা সবই তিনি দেখেছেন। গ্রামজীবনের পাপ, অন্যায়, অবিচার, ঈর্ষা, নীচতা নানা ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি কেবল গ্রামজীবনের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়নি, সেই সঙ্গে কলকাতার নগরজীবনের গভীরে পৌঁছেছেন। কলকাতার জীবনের পাপের উপর প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি গল্পে ('কঙ্কাল', 'মধ্যবর্তিনী', 'মানভঞ্জন') তাঁর বাস্তবানুগত জীবনদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। নগরজীবনের কদর্যতা ও তুচ্ছতা নিয়ে রচিত এইসব গল্পে গল্পলেখক রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা আর একভাবে প্রতিষ্ঠিত। গল্পলেখক রবীন্দ্রনাথ কত বড় শিল্পী তা এসব গল্পে প্রমাণিত।

রবীন্দ্রনাথের বেশকিছু গল্পকে ভৌতিক বা অতিপ্রাকৃত গল্প বলে অভিহিত করা হয়। এই অভিধা কতদূর সঙ্গত তা বিচার্য। অরুণকুমারের মতে, 'মহামায়া', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'দুরাশা', 'নিশীথে', 'মণিহারা' প্রভৃতি গল্পকে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত গল্প খুব একটা বলা যায় না। এগুলিকে চড়া পর্দার রোমান্স গল্প বলা বোধহয় সঙ্গত হবে। মহামায়া গল্পের সঙ্গে নিশীথের কোনো মিল নেই, তেমনই 'দুরাশা'র সঙ্গে 'ক্ষুধিত পাষাণ' বা 'মণিহারা' গল্পের কোনো মিল নেই। বিশুদ্ধ অলৌকিক, ভৌতিক বা গল্পরচনার রবীন্দ্রনাথের শিল্পাগ্রহ ছিল বলে খুব একটা মনে হয় না, কারণ তিনি, গল্পকে এই ধরণের স্পষ্ট উদ্দেশ্যের দাস বানাতে রাজি ছিলেন না। বলা যেতে পারে, 'দুরাশা', 'মণিহারা' বা 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্প রোমান্টিক আইডিয়া নির্ভর (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা*, পৃ.৬২)।

রবীন্দ্রনাথ বাৎসল্যরসের গল্প রচনা করেছেন গোটা কুড়িটা। এই সমস্ত গল্পগুলির নায়ক-নায়িকা বালক বালিকা। নায়কেরা সাধারণত চিরচঞ্চল স্নেহবুভুক্ষু কিশোর অথবা বিরাগী স্নেহ-উদাসীন পলাতক

বালক। নায়িকারা যতটা না প্রিয় তার থেকে বেশি কন্যা। মৃন্ময়ী (সমাপ্তি) গিরিবালা (মেঘ ও রৌদ্র), সুভা (সুভা), প্রভা (সম্পাদক), উমা (খাতা), মিনি (কাবুলিওয়ালা)—এই সব নায়িকা চরিত্রে কন্যার ভাবটি প্রবল।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে সবুজপত্র পর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্পে বলা ভালো গোটা রবীন্দ্রসাহিত্যে একটা বাঁক বদল লক্ষ করা যায়। এই পর্বের রবীন্দ্রগল্প মানে যৌবনের আহ্বান, নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, সামাজিক শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তির প্রতিষ্ঠালাভের সংগ্রাম। এই পর্বের গল্পে সামাজিক সমস্যা মুখ্য, তীব্র, প্রকট, তাই গল্পগুলি ব্যঙ্গবিদ্রূপে ভরা ঝাঁঝালো। এই বিদ্রোহ আর নবপ্রতিষ্ঠার প্রতিনিধিস্থানীয় গল্পে 'স্ত্রীর পত্র'। এর বাহন ছিল চলিত বাংলা। চলিত গদ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প 'স্ত্রীর পত্র', তা অকারণ নয়, তা অনিবার্য। এরপর এলো নারীত্বের তত্ত্ব। যে তত্ত্বের ব্যক্তিরূপ মৃণাল (স্ত্রীর পত্র), অনিলা (পয়লা নম্বর), সোহিনী (ল্যাবরেটরি)। সমাজ, শাস্ত্র ও পুরুষের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এইসব নারী চরিত্রে দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বের এক চেহারা দেখা যায় 'হালদারগোষ্ঠী', 'হৈমন্তী', 'বোষ্টমী' গল্পে। হালদারগোষ্ঠীতে অনড় বংশমর্যাদা ও শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে ব্যক্তির একক সংগ্রাম, হৈমন্তীতে একান্নবর্তী পরিবারের বদ্ধ দুর্গে খোলা হাওয়ার প্রবেশাধিকার। বোষ্টমী-তে বংশ পরম্পরা রীতির বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহকে শিল্পরূপ দেওয়া হয়েছে।

তিরিশের দশকে রচিত রবীন্দ্রনাথে গল্পে সমসাময়িকতার ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশকে তিনি একেবারে এড়িয়ে যেতে পারেননি। রাজনীতির সঙ্গে সংস্কারের দ্বন্দ্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দুটি গল্প লিখেছিলেন—'নামঞ্জুর গল্প' ও 'সংকার'। রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গশর বর্ষিত হয়েছে রাজনীতির গূঢ় মন্ত্রণা, ব্যক্তিত্ব-দমনকারী দলীয় শৃঙ্খলা ও উন্মত্ততার প্রতি। রাজনৈতিক উচ্ছ্বাসে অনেক সময় দেখা যায়, মনুষ্যত্বকে ছাপিয়ে ওঠে সংস্কার, ব্যক্তিকে পদদলিত করে দলীয় শৃঙ্খলা। গল্পদুটি তাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তীব্র তিক্ত ব্যঙ্গে ভরা।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে লেখা তিনটি গল্প চমক সৃষ্টি করেছিল। 'তিন সঙ্গী' গল্পগুলির প্রধান উপাদান প্রেম, কিন্তু কোনো গল্পেরই পরিণতি মিলনে নয়। প্রেমে ও জীবনে বিচ্ছেদই সত্য, মিলনে নয়; একথা রবীন্দ্রনাতের কলমে বার বার উঠে এসেছে। প্রেমের জয় নয়, বিজ্ঞানবুদ্ধি ও রিয়ালিজমের জয় ঘোষিত হয়েছে 'তিনসঙ্গী' তে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীকে গল্পের প্রদান উপাদান ও চরিত্র রূপে লেখক এখানে গ্রহণ করেছেন। 'শেষ কথা'-র অধ্যাপক অনিলকুমার বিজ্ঞানী, কেম্ব্রিজের পি. এইচ. ডি। নবীনমাধব খনিজবিদ্যা-পারদর্শী, জিয়লজিস্ট; 'ল্যাবরেটরি'র নন্দকিশোর ইঞ্জিনিয়ার, সোহিনী নিজে বিজ্ঞানী না হয়েও বিজ্ঞানী-উপসাধিকা, নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরি তার প্রাণ, 'পূজোর দেবতা'। 'রবিবার'-এর অভীকের অন্যতম শখ-কলকারখানা জোড়া-তানা দেওয়া, সে এমন আর্টিস্ট যার আসক্তি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে; নিরাসক্তি তার জীবনেও ছবি আঁকায়।

১৬.৬ সারাংশ

ছোটোগল্প বিষয়টি বাংলা সাহিত্যে, এমনকি পাশ্চাত্য সাহিত্যেও নতুন এক সংরূপ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ছোটোগল্পকারগণ যা লিখতে শুরু করেন ছোটোগল্প হিসাবে, তা আমাদের দেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের গল্পের মত নয়। পৃথিবীর অন্যান্য ছোটগল্পকারদের মধ্যে দ্য মঁপাসা, এডগার অ্যালান পো, আন্তন চেকভ—এঁদের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের নামও সমস্বরে উচ্চারিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পঞ্চাশ বছর ধরে (১৮৯১-১৯৪০) প্রায় একশোটির কাছাকাছি গল্প লিখেছেন। বাংলা ছোটোগল্পের প্রবর্তন, লালন ও পালনের গুরু দায়িত্ব তিনি বহন করে নিয়ে গিয়েছেন। বাঙালি জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচিত্র স্বাদের গল্প তিনি লিখেছেন। আমাদের মানবিক অনুভূতি, লৌকিক ও অলৌকিক অভিজ্ঞতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনার ছাপ পড়েছে রবীন্দ্রগল্পে। পল্লীবাংলা ও নগরজীবনের সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও বেদনা, নৈরাশ্য ও অভীপ্সা—সবই রবীন্দ্রনাতের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। রবীন্দ্র-সৃষ্ট এই বিশাল গল্পলোকের নায়ক নায়িকারা স্বভাবে বিচিত্র, তাদের জীবনের পরিণতিও বিচিত্র। বাংলা ছোটগল্পের সৃষ্টিতে তিনি সর্বপ্রভাবমুক্ত একজন মুক্তমনা স্বাধীন শিল্পী। এক্ষেত্রে কোনো ভারতীয় লেখকের প্রভাব তাঁর উপর নেই। সমকালীন বা ঈষৎ পূর্ববর্তী পাশ্চাত্য ছোটোগল্পকাররা তাঁকে প্রাণিত করেছিলেন বটে, কিন্তু প্রভাবিত করেননি। বস্তুত ভারতীয় সাহিত্যে ছোটোগল্প নামক শিল্পরূপটি তিনিই গড়ে তুলেছিলেন।

১৬.৭ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :

১। বাংলা ছোটোগল্পের উদ্ভবের ইতিহাসটি সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত করুন।

২। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে ছোটোগল্পের উৎসগুলি সূত্রাকারে লিখুন।

৩। সাহিত্যের সংরূপ হিসেবে ছোটোগল্পের লক্ষণগুলি আলোচনা করুন।

৪। বাংলা ছোটোগল্প পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে কতটা অনুপ্রাণিত তা নিজের ভাষায় লিখুন।

৫। বাংলা ছোটোগল্প বিকাশের ধারাটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ছোটোগল্পকে কতটা শিল্পোত্তীর্ণ করেছিলেন তা আলোচনা করুন।

৭। রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্প রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র ছোটোগল্প কীরকম ভূমিকা পালন করেছিল বলে তোমার মনে হয় তা আলোচনা করুন।

৮। বাংলা ছোটোগল্পের প্রথম লেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব পর্যালোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। ছোটোগল্প ছোটো কেন?

২। মধ্যযুগের সাহিত্যে বাংলা ছোটোগল্পের উপাদানগুলি লিখুন।

৩। রবীন্দ্রনাথে হিতবাদীপর্বের গল্পগুলির অভিমুখ কী তা উল্লেখ করুন।

৪। ছোটোগল্পকার প্রভাতকুমারের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৫। রবীন্দ্রগল্পে সবুজপত্র পর্ব বলতে কী বোঝেন?

১৬.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। *কালের পুত্তলিকা*—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং

২। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

৩। *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা (দ্বিতীয় খণ্ড)*—গোপাল হালদার, অরুণা প্রকাশ

৪। *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য*—গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং

৫। *রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ*—তপোব্রত ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং

৬। *কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্য*—দেবকুমার বসু, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স

৭। *বিপরীতের বাস্তব রবীন্দ্রনাথের গল্প*—দেবেশ রায়, পত্রলেখ

৮। *সাহিত্যে ছোটোগল্প*—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

৯। *বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*—বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি

১০। *রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্য*—বুদ্ধদেব বসু, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১১। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (দ্বিতীয় খণ্ড)*—শ্রী ভূদেব চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং

১৩। *ছোটগল্পের কথা*—ভূদেব চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

১৪। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড)*—সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স

NOTES